অশ্রুময়

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

আশ্বিন—১৩৩১

মূল্য ২৲ টাকা
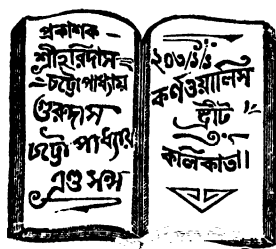
প্রিণ্টার—শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঁঙার
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্ক্‌স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ-পত্র

স্বর্গীয়া

চারুবালা দেবীর

পবিত্র নামে

'অশ্রুময়'

উৎসর্গ করিলাম।

'মনোমোহন পাঠাগার',
সেনহাটী।
২৩এ ভাদ্র, ১৩৩১

উপহার
To
Hooghly College
Library
1936
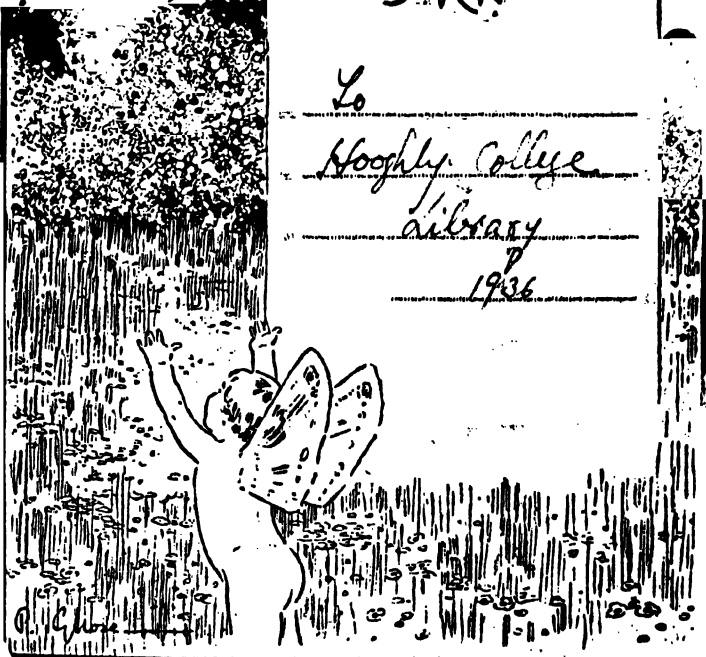
অশ্রুময়

অশ্রুময় রায় বিকালের আফিস্ ট্রেণে বাড়ী ফিরিতেছিল।

প্রায় তিনমাসের উপর সে কলিকাতায় চাকরীর চেষ্টায় আসিয়াছে। ক্রমাগত নানা আফিসে ঘুরিয়া ঘুরিয়া যখন সে একেবারেই হতাশ হইয়া পড়িতেছিল, ঠিক্ তখনই হঠাৎ এক দিন, দেবতার নিকট প্রার্থিত বরলাভের মতই, একটা সওদাগরী আফিসে চল্লিশ টাকা বেতনের কেরাণীগিরিতে বহাল হইল।

বাড়ীতে জননী ও একমাত্র ভগিনী ছিলেন। সুতরাং এই আনন্দ-সংবাদ তাঁহাদিগকে প্রদান করিবার জন্য তাহার প্রাণ স্বতঃই চঞ্চল হইবার কথা। পত্র লিখিলেও চলিত, কিন্তু কাছে যাইয়া জননীর আশীর্ব্বাদ লাভের লোভটুকু সে ছাড়িতে পারিল না। আর ভগিনী কল্যাণীর স্নেহাভিনন্দন সে কল্পনাবলেই অনুভব করিয়া পুলকিত হইয়া উঠিতেছিল।

বিপুলবেগে ট্রেণ ছুটিয়া চলিয়াছে; তবু অশ্রুময় অস্থির হইয়া উঠিতেছিল;—কখন সে বাড়ী পৌঁছিয়া কল্যাণীকে ডাকিবে, কখন জননীকে প্রণাম করিবে। ট্রেণের গতি যদি তাহার হৃদয়ের গতির অনুযায়ী হইত, তাহা হইলে সে বোধ হয় এতটা অস্থিরতা অনুভব করিত না!

তাহার তরুণ মুখকান্তি উৎসাহে, আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। বার বার সে জানালার ফাঁক দিয়া বাহিরের দিকে চাহিতেছিল। সান্ধ্য সূর্য্যের কোমল রক্তিমাভা তাহার মুখের উপর পড়িয়া, মুখখানিকে এক অনির্ব্বচনীয় গরিমায় উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল।

কৈশোর তখনও এই সুন্দর মুখখানির অধিকারীকে একেবারে ত্যাগ করিয়া যায় নাই;—তাহার চঞ্চলতার মধ্যে, তাহার চোখের কৌতূহলদীপ্তির মধ্যে কৈশোর তাহার রেশ্‌টুকু রাখিয়া গিয়াছে! তখনও যৌবন তাহার শরীরে নিজের সমস্তটুকু প্রভাব প্রকাশ করে নাই; কিন্তু যেটুকু করিয়াছে, তাহাতেই তাহার প্রত্যেক ভঙ্গিটিকে শোভন ও সংযত করিয়া তুলিয়াছে!

অশ্রুময়ের ঠিক্ পাশেই একটি যুবক উপবিষ্ট ছিল; সে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত অশ্রুময়ের চঞ্চলতা লক্ষ্য করিতেছিল। এইবার অশ্রুর অরুণ-রাগদীপ্ত সুন্দর মুখখানির দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"নাম?"

"অশ্রুময় রায়"—বিস্মিত দৃষ্টি প্রশ্নকর্ত্তার মুখের উপর মুহূর্ত্তের জন্য তুলিয়া ধরিয়া উত্তর দিয়া ব্যস্ত অশ্রু আবার বাহিরের দিকে চাহিল।

মুখ ফিরাইতেই যুবক মৃদু হাসিয়া কহিল, "এত ব্যস্ত যখন, তখন ঠিক্ সেই যায়গাটিতেই যাচ্ছেন, যেখানে সবি মধুর হয়ে ওঠে এবং"—

"ওর মাঝে আর 'এবং' কিছু নেই; সহজ কথায় বল্‌তে গেলে, বাড়ী যাচ্ছি, এবং সে স্থানটা বোধ হয় কারু কাছেই কম মধুর নয়,"—বলিয়া অশ্রুময় হাসিয়া উঠিল।

তাহার সরল হাসিটুকু দেখিয়া যুবক মুগ্ধ হইল।

পথ চলিবার সময় দু'কথাতেই আত্মীয়তা সংস্থাপিত হয়। যুবক

যাহার সরল হাসি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল, তাহার সহিত পরিচয়টি নিবিড় করিয়া তুলিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাড়ী আপনার কে কে আছেন ?"

যাকে দিয়ে শ্বশুর বাড়ী হয়, তিনি তো অন্ততঃ নেই"—ঠোঁটখানি দাঁতে একটু চাপিয়া, একটু হাসিয়া অশ্রুময় উত্তর দিল।

"ওঃ! তবে তো ভারি ভুল হয়ে গেছে আমার।" অশ্রুময়ের শান্ত দুই চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, সে কোমল স্বরে কহিল, "বাড়ী মা আর বোন্‌টি আছেন !"

পরমুহূর্ত্তেই একটু হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "আমার একটা কথা মনে হচ্ছে,"—

"কি বলুন তো"—

"আপনি কেবলি ব্যক্তি বিশেষের খোঁজ নিচ্ছেন,—আপনার অদৃষ্টাকাশে—তিনি বুঝি নূতন দেখা দিয়েছেন"—যুবক অশ্রুময়কে কথা শেষ করিতে না দিয়াই হাসিয়া কহিল, "ঠিক হ্যালির কমেটের মত"—

অশ্রুময় একবার এদিকে ওদিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "না, ধ্রুব তারার মত !"—

উভয়েই খানিকটা হাসিয়া লইল। তখন ট্রেণ-খানি একটা বিকট দৈত্যের মতই তীব্র চীৎকার করিয়া ছুটিতেছিল। অশ্রুময় একবার জানালা দিয়া মুখ বাহির করিল। ক্রমে গতি মন্দ হইয়া আসিতেছিল ; গাড়ীখানি তখন একটী ছোট পাকা বাড়ী দক্ষিণে রাখিয়া ছুটিতেছিল। সম্মুখেই একটা ছোট পুকুর ; সেই পুকুরের পাশে পাশে ফুলের গাছ ; একটু দূরে দূরে আম কাঁঠালের গাছ। আরও দূরে পল্লীর শ্যামল বনপ্রান্ত দেখা যাইতেছিল। সেই বনপ্রান্তের কাছে তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আইসে নাই। কিন্তু বৃক্ষশীর্ষের কাছটি দিয়া

একটী সুস্পষ্ট ধূমরেখা স্থির হইয়া রহিয়াছে এবং আসন্ন সন্ধ্যার সূচনা করিতেছে !

ঘাট্‌লার সিঁড়ির উপরকার টবগুলিতে ছোট ছোট ফুল গাছ আলো করিয়া বিচিত্র ফুল ফুটিয়াছে।

একটি পরিপুষ্ট দেহ শিশুকে বুকের সঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়া একটী পনের ষোল বছরের মেয়ে ঘাট্‌লার উপর হইতে গাড়ী দেখিতেছিল। কোলের শিশুটী ফুল ছিঁড়িবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিতেছিল। ট্রেণের শব্দে সে তাহার বড় বড় চোখ দুইটা তুলিয়া গাড়ীর দিকে চাহিল, পর মুহূর্ত্তেই মেয়েটীর বুকের কাছে মুখ লুকাইল।

অশ্রুময়ের চঞ্চল দৃষ্টি মেয়েটীর মুখের উপর স্থাপিত হইল। শৈবাল-জড়িত প্রফুল্ল পঙ্কজের মতই তাহার চূর্ণ কুন্তলাবৃত মুখখানি সান্ধ্যসূর্য্যের কোমল আলোকপাতে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল।

মেয়েটী দেখিল, ট্রেণ হইতে কে তাহার দিকে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। সে চক্ষু ফিরাইয়া লইল, এবং কোলের ছেলেটার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে ঘাট্‌লার অন্য দিকে চলিয়া গেল।

কিন্তু যে অমন উন্মুখ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, তাহার অত্যন্ত শান্ত দৃষ্টিটুকুর মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যাহা কখন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়া তাহার মুখখানাকে আর একবার গতিশীল গাড়ীটার দিকে ফিরাইয়া দিল।

তখন ট্রেণ দূরে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তবু সেই মুখখানা দেখা যাইতেছিল।

বিস্মিত পুলকে অশ্রুময়ের সর্ব্বশরীর শিহরিয়া উঠিতেছিল, সে জানালার ফাঁক দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া যতক্ষণ দেখা গেল, সেই ঘাট্‌লার দিকে চাহিয়া রহিল।

কিন্তু গাড়ীর গতিটা যে হঠাৎ এতই দ্রুত হইয়া উঠিতে পারে তাহা তাহার কোনও কালেই ধারণা ছিল না।

কল্পনারাজ্য হইতে বাস্তবের মধ্যে ফিরিয়া আসিতে মানুষের যেমন মোটেই সময়ের দরকার হয় না, তেমনি এই অত্যন্ত দ্রুতগামী গাড়ীটারও এক সময়ে থামিয়া যাইতে এতটুকুও সময় লাগিল না।

অশ্রুময় গাড়ীর মধ্যে মুখ আনিতেই দেখিল, তাহার পাশের ভদ্র-লোকটি ব্যাগ হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু ঠিক কখন যে তাঁহার মুখের উপর দিয়া একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আসিয়া গিয়াছে, অশ্রুময় সে খবরটি না জানিলেও সে এটুকু অনুভব করিল, যে, হঠাৎ একটা তীব্র আঘাত পাইলেই মানুষের মুখ অমন করিয়া কালিমালিপ্ত হইয়া যাইতে পারে! কিন্তু সে আঘাতটা যে কি তাহা জানিয়া লইবার অবসরও যেমন তখন ছিল না, তেমনি অধিকারও তো তাহার ছিল না।

অশ্রুময় ম্লান মুখে কহিল, "অসুখ বোধ কর্‌চেন কি? আপনার মুখ যে একেবারে কেমন হয়ে গেছে!"—

"না, কই অসুখ তো কিছু করেনি।"—বলিয়াই যুবক একটু ব্যস্ততার সহিত গাড়ীর দুয়ার খুলিয়া ফেলিল এবং আর একবার অশ্রু-ময়ের মুখের দিকে তাহার ম্লান দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "তবে আসা যাক্! এইটেই যখন আপনার বাড়ী যাওয়ার পথ, তখন মাঝে মাঝে দেখা হতেও পারে!"

একটি ক্ষুদ্র নমস্কারের প্রত্যর্পণে দুই পাণি যুক্ত করিয়া স্তম্ভিত অশ্রুময় প্রতিনমস্কার করিল। একটু হাসিয়া যুবক প্ল্যাট্‌ফরমের উপর নামিয়া পড়িতে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

যতক্ষণ দেখা গেল, অশ্রুময় সেই অপরিচিত যুবকের দিকে চাহিয়া

রহিল। ক্ষুদণ্ডের পরিচয়ে এই যুবক তাহার হৃদয়ে একটা আন্দোলন তুলিয়া দিয়া গিয়াছিল।

বাহিরে, দূর চক্রবাল-রেখার কাছটিতে সূর্য্য ডুবিতেছিল। মেঘের শীর্ষে শীর্ষে অপূর্ব্ব রঙ্গের খেলা চলিয়াছে। অশ্রুময় জানালার কাঠের উপর বুক রাখিয়া সেই রঙ্গিন পশ্চিম আকাশের দিকেই চাহিয়া রহিল।

কোথায় সেই কল্পনালোকের মোহিনী তুলিকাটি, যাহার কোমল স্পর্শে, বাহিরের আকাশ ও তাহার অন্তরাকাশ এমন করিয়া একই পুলক-ছন্দে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে!

২

অশ্রুময় বাড়ী আসিয়া যখন মাকে প্রণাম করিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে!

ছেলের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে মানদা সুন্দরী কহিলেন, "ওরে কল্যাণি! এদিকে আয়, তোর দাদা এসেচে!"

কল্যাণী পাকঘরের দিক্ হইতে ছুটিয়া আসিল, অশ্রুময়কে প্রণাম করিয়া কহিল, "তুমি কিন্তু বেশ্ লোক দাদা, কাল তোমার চিঠি আসেনি, আজ সকালেও এল না, মা তো ভেবেই অস্থির!—বিদেশে যারা থাকে, তারা যদি নিয়মমত চিঠি না লেখে, তা'তে বাড়ীর লোক যে কতখানি ব্যস্ত হয় তা' তোমরা কিচ্ছুটি বোঝ না, দাদা!"

অশ্রুময় কহিল, "তা' তুই তো আর ব্যস্ত হস্‌নি"—

মানদাসুন্দরী একটু হাসিয়া কহিলেন, "ওমা, ব্যস্ত আবার হয়নি! হর্‌করা আস্‌তে এতটুকু দেরী হলেই ও ঘর আর পথ কর্‌তে থাকে! এ পাগ্‌লীর জন্য কি স্বস্তি পাবার যো'টি আছে! বাছা যখন ছেলের মা হবেন; তখন যে কি কর্‌বেন তা' আমি ভেবেই পাইনে!"

কল্যাণী তাহার ক্ষুদ্র রক্তাধর একটু প্রসারিত করিয়া দিয়া একটু মৃদু হাসিল; তার পরমুহূর্ত্তেই ধীরে ধীরে কহিল, "বুঝ্‌লে ত দাদা মার কথা! ছেলের চিঠি না পেয়ে মা কতখানি অস্থির হ'য়ে ওঠেন!"—

মানদাসুন্দরী একটু হাসিয়া কহিলেন, "ক্ষমা বুঝি তুই কাউকেই করিস্‌নে কল্যাণি! তোর সঙ্গে পেরে ওঠাই দায়!"—

"বাঃ, দোষ হ'ল বুঝি আমার! নিজের কথায়ই ধরা পড়ে গেলে, তা' আমি আর কি করি বল? দাদার চিঠি আস্‌তে একটু

দেরী হলেই যে, মা, তোমার ইষ্টদেবতার নাম কর্‌তেও ভুল হয়ে যায়, সে খবরটি এখন কে দেয়, বল! আচ্ছা দাদা, তুমিই না হয় বিচার কর”—

“ওরে, তুই এখন থাম্! আর এত বক্‌তেও বাপু তুই পারিস্! তোর দাদার হাত মুখ ধোবার জল দিয়েচিস্?—”

“সে আমি কোন্ সন্ধ্যেবেলা ঠিক্ করে রেখে দিয়েচি!”

“—তা’ তুই কি করে ঠিক্ কর্‌লি, কল্যাণি! আমি তো লিখিনি যে, আজ আস্‌ব।”—

মানদাসুন্দরী হাসিয়া উঠিলেন, কহিলেন,—“এইবার মা লক্ষ্মী আমার ধরা পড়ে গেছেন! ওরে, ও যে রোজ সন্ধ্যেবেলাই অম্‌নি করে গাড়ু গামছা খড়ম গুছিয়ে রাখে, বলে, ‘কি জানি কখন দাদা আস্‌বে।—সব সাজানো গুছানো না পেলে মনে কর্‌বে এরা কেউ’— হঠাৎ কল্যাণীর মুখের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই মানদাসুন্দরী থামিয়া গেলেন, তার পর একটু হাসিয়া কহিলেন, “না তুমি তো বাপু কাউকেই ক্ষমা কর না, এখন বাছা, অমন করে নিষেধ কর্‌লে চল্‌বে কেন? আমি আজ অশ্রুকে সব কথা বলে দেবই, এতে যা’ থাকে আমার অদৃষ্টে”—

কল্যাণী অত্যন্ত নিরুপায় হইয়া পড়িল। তার পর হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া কহিল, “কেমন মা গো তুমি, দাদা হাতমুখ ধোয়নি, খায়নি, ওকে একটু সুস্থ হতে দাও, তার পর যত পার নালিশ ক’র! কল্যাণী ত আর পালিয়ে যাচ্ছে না,” বলিয়াই সে অশ্রুময়ের হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, “দাদা, তুমিও যেমন, মার কথা শোন! তুমি চল, হাত মুখ ধোবে!”—

জননী হাসিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাঁহার দুই চক্ষুর পাতাই যে জলে

ভিজিয়া উঠিল, তাহা আর কাহারও চোখে না পড়িলেও, কল্যাণীর দৃষ্টি এড়াইল না।

সে মার কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল, "তোমার তো আহ্নিক করা হয়ে গেছে মা! আচ্ছা তুমি কাপড়টা বদ্‌লে নিয়ে আমাদের ভাত দাও না!" তার পর একটু গলা খাটো করিয়া কহিল, "আমি দাদার সঙ্গেই খেতে বসি না কেন!"

বারান্দায় অশ্রুময় হাতমুখ ধুইতেছিল, কল্যাণী যত মৃদুস্বরেই বলুক্ না কেন, কথাটা তাহার কাণে গেল, সে ডাকিয়া কহিল, "সেই বেশ হ'বে মা! মেসে ঠাকুরের হাতের রান্না খেয়ে খেয়ে তো অরুচি ধরে গেছে, আজ তোমার হাতে খেয়ে বেঁচে যাব। কল্যাণীকে কিন্তু বলে দাও, মা, ও যে সমস্ত মাছগুলি আমার ভাতের মাঝে লুকিয়ে রাখবে, আর নিজে কিচ্ছুটিই খাবে না, তা' কিন্তু চল্‌বে না মা!"

কল্যাণী রাগিয়া গেল, কহিল, "তা' অত কথার তো কোনো দরকার নেই মা! এর যা' ঠিক ব্যবস্থা হ'তে পারে তাই আমি করে দিচ্ছি! আমরা কেউই খাবারটা ছোঁব না। তুমিই দু'জনকে খাইয়ে দাও! মা আর কিছু আমাকে কম করে দিয়ে তোমাকে বেশী করে দেবে না, দাদা!"

মানদাসুন্দরী দুই হাতে কল্যাণীর মাথাটা বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া কহিলেন, "ওরে ক্ষেপি, তোর মা-ই কি ঠিক্ নিক্তির ওজনে ভাগ করে দিতে পার্‌বে? তোর মুখে খাবার তুলে দিতে গেলেই যে তুই নানা রকমের বাহানা তুলিস্! তুই খেতে পারিস্‌নে, তোর গা' কেমন করে, তোর এ সবগুলি আমি কেমন করে ঠেকাব বল?"—

—"শোন মার সৃষ্টিছাড়া কথা! খাবার জিনিষটা মুখে তুলে দিতে গেলে কেউ নাকি আবার অমনি করে! ও তোমার অশ্রু বিদেশ থেকে

এসেচে তাকে বেশী করে দেবার একটা ফন্দি আগে থাকৃতে বের করে কল্যাণীর মুখ বন্ধ কর্‌তে চাচ্ছ! আমি কি আর ওসব বুঝিনে!"

কিন্তু খাওয়ার সময় একটু কিছু বেশী মুখে দিতে গেলেই কল্যাণী রাগিয়া অনর্থ বাধাইতে লাগিল। "সত্যিই কি আমি রাক্ষুসী, যে অমন করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আমার মুখের মধ্যে পূরে দিতে চাচ্ছ!"—কল্যাণীর কথা শুনিয়া অশ্রুময় কহিল, "তোর সঙ্গে পারাই তো কঠিন রে! তুই কিছু খাবিনে, আরও বকাবকি করে অনর্থ বাধাবি!"

আহারান্তে অশ্রুময় ও কল্যাণী মাতার দুই পাশে শুইয়া পড়িল। কত সুখ ও দুঃখের কাহিনীর আলোচনার মধ্যে তাহাদের ভাবী সাংসারিক বন্দোবস্তের পরামর্শ হইয়া গেল।

অন্যান্য কথার মধ্যে স্থির হইল, অশ্রুময় প্রত্যহই বাড়ী হইতে কলিকাতা যাইয়া আফিস্ করিবে!—

তখন কল্যাণী কহিল, "মা, এইবার কিন্তু দাদার বিয়ে দিতে হবে!"

অশ্রুময় অত্যন্ত মৃদুস্বরে কহিল, "আর কারু?"

—"এঁ হে!"—দুষ্টু কল্যাণীর মুখ এবার বন্ধ হইয়া আসিবার উপক্রম হইল! তখন জননী ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, "তা' দু'জনেরই বিয়ে হবে।"—

"কিন্তু আগে অশ্রুর!"—

"কল্যাণী মুখ ফুলিয়ে থাকবে না ত?"—অশ্রুময় কথাটা বলিয়াই টিপিটিপি হাসিতেছিল।

"ই—রে! দাদাটার মোটেই লজ্জা নেই!"—

মানদাসুন্দরী হাসিয়া উঠিলেন। সে বড় তৃপ্তির হাসি! অশ্রুময় বহু দিন পরে মায়ের মুখে প্রসন্ন হাসি দেখিয়া তৃপ্ত হইল।

কল্যাণী মার বুকের কাছে মুখ লুকাইয়া রহিল। মানদাসুন্দরী

তাহার সংসর্পিত চুলের রাশির মধ্যে ধীরে ধীরে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

তখন সমস্ত পল্লীটা নিবিড় সুপ্তিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। ক্বচিৎ দুই একটা কুক্কুর ডাকিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই নীরব হইয়া যাইতেছিল। দুই একটা পেচকের কর্কশ ধ্বনি মধ্যে মধ্যে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল! বাহিরে গাছের পাতায় পাতায় শিশির টপ্‌টপ করিয়া পড়িতেছিল। পল্লীর অখণ্ড শান্তির ও নীরবতার মধ্যে সে শব্দটুকুও অশ্রুময়ের কাণে আসিতেছিল!

কল্যাণী হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "বুঝলে দাদা! মা তোমার চেয়ে আমাকেই বেশী ভাল বাসেন।"

পরম গম্ভীরভাবে অশ্রুময় কহিল, "না, লক্ষ্মীটি, এমন একটা কথা বিনা প্রমাণে বিশ্বাস তো করা যায়ই না, তা' ছাড়া"—

"প্রমাণ যথেষ্ট আছে—একেবারে অকাট্য! এই দেখ, মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন!"—কল্যাণীর কথা শুনিয়া জননী মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—"পাগ্‌লী আর কি, আমি ভাব্‌লাম ও না জানি কিই বল্‌বে!"—

অশ্রুময় কহিল, "বুঝ্‌লি তো কল্যাণি! ওটা প্রমাণ বলে গ্রাহ্যই হতে পারে না।"—

কল্যাণী নিতান্তই নিরুপায় হইয়া পড়িয়া জননীর—কাণের কাছে মুখ নিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল—

"মা! তুমি বল না কল্যাণীকে বেশী ভালবাসি;—আমি কাল ভোরে তোমাকে এক সাঁজি ফুল তুলে দেব!"—

"অশ্রু! বোঝ, কল্যাণী কিন্তু আমাকে এক সাঁজি ফুল তুলে দিতে চাচ্ছে!"—

"কোন্ ঘুষ্‌খোরের মেয়ে বাপু তুমি, আমি তো ঘুষ্ দিতে পারব না !"—

কল্যাণী উচ্চ রোলে হাসিয়া উঠিল,

"ভারি জব্দ, তবে আমারই জিৎ, কেমন তো মা ?"

মানদাসুন্দরী কল্যাণীকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার নির্ম্মল ললাটে ওষ্ঠস্পর্শ করিলেন, কহিলেন, "দূর ক্ষেপি !"

কল্যাণীর অন্তরমধ্যে একটা তৃপ্তি ও আনন্দের প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল। সে মার বুকের কাছে মুখ লুকাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

একটু পরেই গুরুনিশ্বাসপতনশব্দ শুনিয়া অশ্রুময় বুঝিল, মা ও কল্যাণী নিদ্রাগত।

তখন অশ্রুময়ের মানস চক্ষের সম্মুখে একখানি তরুণী মূর্ত্তি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল।

কক্ষের সেই নিবিড় অন্ধকার যবনিকা ভেদ করিয়া, কোন্ সুদূর কল্পনালোক হইতে সেই লীলাতরঙ্গায়িত মূর্ত্তিখানি বুঝি বড় সন্তর্পণে, বড় সঙ্কোচে নামিয়া আসিতেছিল !

এ মুখ, এ মূর্ত্তি যেন অশ্রুময়ের চিরপরিচিত ! জন্মে জন্মে যেন এমনি করিয়া কতবার এই তরুণী তাহার কাছটিতে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে !

আজিকার দিন পর্য্যন্ত সে যে বাড়িয়া উঠিয়াছে, সে যেন ইহাকেই পাইয়া সম্পূর্ণ হইবার জন্য,—সার্থক হইবার জন্য !

অমাবস্যার কোন্ নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে শশাঙ্ক লুকাইয়া ছিল, আজ তাহার যৌবনের প্রতিপদের দিনে মুহূর্ত্তের জন্য সে আসিয়া দেখা দিয়া গেল।

তাহারই হৃদয়াকাশে পূর্ণায়ত হইবার জন্যই কি প্রতিপদ-শশাঙ্কের এই ক্ষণিক অভিযান !

৩

ষ্টেশন ত্যাগ করার পর প্রায় আধ ঘণ্টার পথ অতিক্রম করিয়া সতীশ সেই ক্ষুদ্র পাকা বাড়ীটীর ফটকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল এবং একবার এদিকে ওদিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

ঘাট্‌লার উপর যে তরুণীটীকে দেখা গিয়াছিল, সেও একটু পূর্ব্বেই ভিতরে আসিয়া ডাকিল, "তোমার ছেলে নাও, দিদি! এ দুষ্টু ছেলের সঙ্গে পারে এমন মানুষ ভূভারতে জন্মেনি! চেনে কেবল ওর বাবাকে আর মাকে। আসুক্ ওর বাবা, ওর বিষ্ণের কথা সব খুলে বল্‌ব!"

ঘরের দিক্ হইতে কেহ বাহির হইয়া আসিতে আসিতে কহিল, "তুই আমার ছেলের নিন্দা করিস্;—তবু ও তোকে যেমনটা ভাল-বাসে তেমন তো আর কাউকেই ভালবাসে না রে,—"

—"নিন্দে কর্‌ব না? একেবারে দস্যি ছেলে; স্থির হয়ে দাঁড়াতে দেয়, না কোনো কাজ কর্‌তে দেয়! ওকে ফুল তুলে দাও, পাখী দেখাও, জলের কাছে নিয়ে যাও! কে বাপু পারে, তাই বল!"—

—"সে নাকি ওর দোষ হ'ল? তুই-ই তো ওকে অমনটা করে তুলেচিস্! কোথায় এত কোল পেত ও? ওকে নিয়েই তো বাসার সব কাজ মিটিয়েছি; কেমন দিব্যি একটা কিছু নিয়ে বসে রয়েছে! একটু নড়েনি, কিচ্ছু না! আর এখানে আসা অবধি তুই ওর যত বায়না মিটিয়ে মিটিয়ে ওকে দুরন্ত, দুষ্টু করে তুলেচিস্! কত বলিনি, যে ওকে অমন করে রাতদিন কোলে কোলে নিয়ে ফিরিস্‌নে, ওর যত আব্‌দার মেটাবার জন্যে প্রাণপণ করিস্‌নে; তা' কি তুই শুনিস্? এখন বলিস্ দস্যি ছেলে, ওর সঙ্গে পারা যায় না!"—

"ওমা, দিদির যে কথা! এতটুকু ছেলেকে কোলে কোলে রাখ্‌ব না ত কি কর্‌ব? আর ও এমনই বা কি করে"—

"তা' হলে ওকে দস্যি ছেলে বল্‌ছিলি কেন রে?—করে তুলেচিস্‌ দস্যি, এখন আবার দোষ ঢাক্‌তে চাচ্ছিস্‌! ওর জ্বালায় তিষ্ঠতে পারিস্‌নে তা' কি আমি জানিনে রে? তা' এবার যখন আমি বাসায় ফিরে যাব, তখন ওই ছেলে নিয়ে আমার সঙ্গে তোর যেতে হবে!—নইলে ওকে কে রাখ্‌বে রে বাপু?"—

ছেলে বুকের কাছে দুই হাতে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া সরযূ কহিল,—"আচ্ছা, আচ্ছা, তা, আমি বুঝ্‌ব! তুই আর ওকে 'দস্যি, দস্যি,' করিস্‌নে বল্‌চি!"—

সরযূ একহাতে ছেলের মুখ তুলিয়া ধরিয়া তাহার ললাটে ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়াই, অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

তখন তাহার চোখের কোণে বোধ হয় অশ্রুর একটা সুস্পষ্ট আভাস জাগিয়া উঠিতেছিল।

ঘরের দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া কেহ কহিল, "ঠাকুরঝি তোরা হলি কি? খুব তো ছেলে নিয়ে দু'বোনে ঝগড়া কচ্চিস্‌,'একবার পিছন ফিরে চেয়ে দেখ্‌তো! ওরে ঝগড়া করতে সুরু কর্‌লে তো তোদের দু'বোনের জ্ঞান থাকে না"—

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সতীশ দুয়ারের কাছ হইতে বলিয়া উঠিল, "আহা—হা! বৌদি, এমন মাটীই করে দিলে!"—

সতীশের গলার শব্দে দুই বোনই ফিরিয়া চাহিল।

উৎপল স্মিতমুখে মাথার কাপড়টা একটু ঠিক্ করিয়া দিয়া কহিল, "এ ভারি অন্যায়, চুরি করে ভদ্রমহিলাদের কথা শোনা!"

বৌদিদিটীর মুখখানা শাণিত ছুরিকার উপর চকিত রৌদ্রপাতের মতই

একবার ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিল ; তার পর সে ধীরে ধীরে কহিল,—"অতএব চোর !"—

উৎপল দাঁতে একবার তাহার রক্তপুষ্পদলতুল্য অধরপুট চাপিয়া ধরিল, তার পর একবার অপাঙ্গ দৃষ্টিতে সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল,—"চোর যদি, শাস্তি দেওয়া দরকার !"—তার পরই চক্ষু টিপিয়া প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "ধর্‌বি না কি বৌদি? ধর্‌না !"—

"তুইই ধর্, ঠাকুরঝি, আমি শিকল নিয়ে আস্‌চি ; শক্ত করে ধরিস্, দেখিস্, যেন পলায় না !"—হাস্যরঞ্জিত মুখে প্রতিমা ঘরের দিকে এক পা অগ্রসর হইয়া গেল এমন সময়ে সরযুর কোল হইতে সতীশের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া দুই হাত বাড়াইয়া দিয়া ছেলে ডাকিল, "বা—বা"—

সরযূ হাসিয়া কহিল, "হয়েচে, আর কাউকে ধর্‌তে হবে না, এ চোর ছেলেই ধর্‌বে ! শিকল আর আন্‌তে হবে না, বৌদি !"—

প্রতিমা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "ঐ অতটুকু ছেলে, ধরে রাখ্‌তে পার্‌বে কেন ? ঠাকুরঝি, তুইও ধর্‌না, ভাই !"

"যা', তোর কাজে যা', রাক্ষুসি !"

—"কেন, চোরের কাছে ঘুষ্ খেয়ে চোর ছেড়ে দিবি নাকি রে ?"

"তা' ঘুষ্ খাই তো, তুই বখ্‌রা নিস্ !"

প্রতিমা চক্ষু ঘুরাইয়া কহিল, "আমি তো ঘুষ খাইনে বাপু, যে বখ্‌রা নেব। আমি যে কত সাচ্চা মানুষ তা' তো তুই জানিস্ নে"—কথাটা বলিয়াই প্রতিমার মুখখানা হঠাৎ ম্লান হইয়া গেল, এবং সেই ম্লানিমা দ্রুতসঞ্চারী মেঘখণ্ডের মতই, সকলেরই হাস্যরঞ্জিত মুখের উপর মুহূর্ত্তের জন্য একটা ছায়াপাত করিয়া গেল !

কিন্তু প্রতিমা আর সেখানে দাঁড়াইল না। যাইবার পূর্ব্বে মুখের

উপর হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল, "তা তোর যত ইচ্ছে ঘুষ খা' ! কিন্তু বুদ্ধিমান্ দারোগার মত ঘুষও খাবি, চোরও ছাড়্‌বিনে ;—বুঝ্‌লি ? তুই যে খুব বাহাদুর ওতে সেইটেই প্রমাণ হয়ে যাবে !"—

প্রতিমা চলিয়া গেল।

কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে জোর করিয়া অতগুলি বকিয়াও তাহার মনের অস্বস্তির ভাবটা দূর করিতে পারিল না !

ইতিমধ্যে ছেলে পিতার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সরযূকেও ছুটি দিয়াছিল এবং দুই হাতে সতীশের গলা জড়াইয়া ধরিয়া মুখের অত্যন্ত কাছে কোমল ক্ষুদ্র মুখখানি নিয়া আবার ডাকিল,—"বা—বা !"—

ছেলের ও স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া উৎপল মৃদুস্বরে কহিল, "—খুব শক্ত করে ধরিস্ রে খোকন্ !—চোর না পালায় ;—তোর মামীমা তা হ'লে অনর্থ ঘটাবে কিন্তু"—

"আর কেউ অনর্থ ঘটাবে না ত ?"—

পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া সতীশ ছেলের দুই গণ্ডে চুম্বন করিল। দুষ্ট ছেলে মার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া লহর তুলিয়া হাসিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, "বা—বা,—মা—"

এই এক বৎসরের শ্রীমান্ শিশুটি শব্দজগৎ হইতে শুধু ঐ দুইটী ক্ষুদ্র কথাই চয়ন করিয়া লইয়াছিল এবং সব্যসাচীর মতই, সময়ে অসময়ে, উহাই প্রয়োগ করিয়া বসিত !

স্বামী স্ত্রী উভয়ের মুখই হাস্যরঞ্জিত হইয়া উঠিল।

উৎপল মৃদুস্বরে কহিল, "ঘরে চল, এ অবোধ দস্যিকে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক্ হচ্ছে না ! ও বুঝ্‌বে না ত কিছু, শুধু লজ্জাটাকেই বাড়িয়ে তুল্‌বে !"

এমন সময়ে প্রতিমা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "নাঃ শিকল খুঁজে পেলাম না ত! চলুন ম'শায়, হাইকোর্টের শমন বেরিয়েচে!"—

—"মা ডাক্‌চেন বুঝি?"—সম্ভ্রমপূর্ণ স্বরে এই কথা বলিয়াই ছেলে প্রতিমার কোলে দিয়া সতীশ দ্রুতপদে উৎপলের নির্দ্দিষ্ট ঘরটীর দিকে চলিয়া গেল, এবং গায়ের অতিরিক্ত কাপড় জামাগুলি উৎপলের হাতে খুলিয়া দিতে দিতে কহিল,—"মাকে প্রণাম করে আসি, এই ঘরেই থেকো, কথা আছে।"—

উৎপল জামা কাপড় আল্‌নার উপর রাখিতে রাখিতে কহিল, "দেখো, যেন পালিয়ে যেও না"—

দুইটী অঙ্গুলি দিয়া উৎপলের রক্তাধরপুট একটু টিপিয়া ধরিয়া, একটু নাড়িয়া দিয়া সতীশ পত্নীর মুখের দিকে গভীর দৃষ্টিতে একবার চাহিল, তার পর মৃদু হাসিয়া দ্রুতপদে ক্ষমাসুন্দরীর আহ্নিকের ঘরের দিকে চলিয়া গেল!

৪

ঘরের কাছে আসিয়া বাহিরে জুতা রাখিয়া সতীশ মুখ বাড়াইয়া ঘরের ভিতরটা একবার দেখিয়া লইল। ক্ষমাসুন্দরী আহ্নিকের যায়গাটিতেই বসিয়া মালা ফিরাইতেছিলেন। সতীশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। বসিতে ইঙ্গিত করিয়া ক্ষমাসুন্দরী আরও কিছুকাল মালা ফিরাইলেন,—তার পর মালাগাছটী একবার কপালে ঠেকাইয়া কহিলেন, "বস বাবা, হাত মুখ ধুয়ে এসেছ ত? ধোও নি বুঝি? যাও, হাত মুখ ধুয়ে এখনি এস!"

সতীশ উঠিয়া গেল।

ক্ষমাসুন্দরী ডাকিলেন, "বৌ,—অ বৌ!"—

প্রতিমা ঘরের দুয়ারের কাছে আসিয়া কহিল, "আমায় ডাক্‌লে, মা?"—

"হাঁ মা, সতুর জন্যে কিছু খাবার গুছিয়ে নিয়ে এস ত মা! এই ঘরেই ঠাঁই করে দাও, এখানে আমার সাম্‌নে বসেই খাবে!"—

প্রতিমা কহিল, "খাবার আমি অনেকক্ষণ গুছিয়ে ঠিক করে রেখেচি তো' মা! জল নিয়ে এসে এখনি ঠাঁই করে দেব কি?"—

"আ আমার লক্ষ্মী, এরি মাঝে খাবার গুছিয়ে ঠিক্ করেচ! আচ্ছা, জল এক গেলাস নিয়ে এস, আসন তো এখানেই আছে! আর দেখ মা, সতু পাথরের পাত্রে খেতে ভাল বাসে, জলটা শ্বেত পাথরের গেলাসে করেই এনো!"

প্রতিমা একটু হাসিয়া কহিল, "খাবারও তো শ্বেত পাথরের রেকাবীতে গুছিয়ে রেখেচি, মা!"

"সব দিকেই তোমার দৃষ্টি রয়েচে, তা' তো আমি খুবই জানি, মা! তবু যে বলি—কি জান, ওটা বুড়ো মানুষ—অভ্যাস ছাড়াতে পারিনে বলেই, মা লক্ষ্মী!"

"সে কি মা, কতটুকুই বা আমি জানি?—তুমি না শিখালে কোথায় শিখ্‌ব মা!"—প্রতিমা বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে ক্ষমাসুন্দরীর পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল!—

"সুখী হও মা! আমি না হয় কত পাপই করেচি, কিন্তু স্বর্গীয় কর্ত্তাদের পুণ্যের জোর তো আর একটুও কম নয়! সেই জোরেই আজ ঠাকুরের পায়ের কাছে জানাচ্ছি যে, তিনি তোমার গায়ে দুঃখকষ্টের আঁচড়টিও যেন না লাগ্‌তে দেন।"

শ্বাশুড়ীর কথা শুনিয়া প্রতিমা, মনে মনে কহিল, "এমন মিষ্টি করেও কথা তুমি বল্‌তে পার, মা! তবু তোমার অদৃষ্টে এত দুঃখ বিধাতা পুরুষটি কেন লিখেছিলেন, তাই ভাবি।"

প্রতিমা চলিয়া যাইতেছে না দেখিয়া, ক্ষমাসুন্দরী কহিলেন, "কি মা?"

কি বলিতে যাইয়া বধূ চুপ করিয়া গেল।

তাহার চোখের পাতা দুইটি যেন নিতান্ত অকারণেই ভিজিয়া উঠিতেছে বুঝিয়া সে দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল!

ক্ষমাসুন্দরী বধূর মুখের ম্লান ভাবটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নিজের মনে মনেই বলিলেন, "আদর ক'রে মিষ্টি কথা বল্লেও তোমার চোখে জল আসে মা! এ জল, কই, আমি অভাগিনী তো রোধ কর্‌তেই পার্‌লাম না! এ জীবনে যে পার্‌ব সে ভরসাও তো আর দেখি না।"

জল ও খাবারের রেকাবী হাতে প্রতিমাকে ঘরের বাহিরে দেখিতেই

ক্ষমাসুন্দরী তাড়াতাড়ি আঁচলে দুই চক্ষু মুছিয়া লইলেন। কিন্তু যাহার দৃষ্টি এড়াইবার জন্য এতটা তাড়াতাড়ি করিলেন, সে সবটাই দেখিয়া ফেলিল। খাবারের রেকাবী ও জলের গেলাসটা যথাস্থানে রাখিয়া মৃদুস্বরে প্রতিমা কহিল, "মা,"—

এই আহ্বানটির জন্য বোধ হয় প্রস্তুত ছিলেন না, তাই একটু চমকিয়া উঠিয়া ক্ষমাসুন্দরী কহিলেন, "কি, মা?—

"একটা কথা বল্‌ব মা!—ঘরের বৌয়ের শাশুড়ীকে যে কতখানি লজ্জা কর্‌তে হয়, তা আমায় তুমি তো শেখাওনি মা! শুধু মেয়ের মত করেই নিজের হাতে গড়ে তুলেচ! আমিও তোমার পায়ের কাছে মেয়ের মতই এসে দাঁড়াই;—তোমার পেটে যে হইনি, সে কথাও তো আর আমি ভাব্‌তে পারিনে!—কিন্তু মা, সেই আমিই যদি সময়ে অসময়ে তোমার চোখের জলের কারণ হয়ে পড়ি, তা' হ'লে সে দুঃখ রাখ্‌বার তো আমার আর যায়গা থাকে না!"

ক্ষমাসুন্দরী মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার দুই চোখের স্নেহপরিপ্লুত দৃষ্টি প্রতিমার মুখের উপর তুলিয়া ধরিলেন, তার পরই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া হাতের মালাগাছটির উপর অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া হাসিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "তুই বলিস্ কিরে পাগলের মেয়ে, কখন আবার আমার চোখে জল দেখ্‌লি!"—

কিন্তু গলার স্বরটা যে একেবারেই বুজিয়া আসিতেছিল এবং দুই চক্ষুর সম্মুখ যে একেবারেই ঝাপ্‌সা, অস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, তাহা কোনও মতে নিজের কাছেও অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না।

তাই অনন্যোপায় হইয়া দ্রুতহস্তে কেবল মালাই ফিরাইয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু তখন ইষ্ট দেবতার নামটি মনে পড়াও দূরে থাকুক্, সতীশ যে এখনই আসিয়া পড়িবে, এমন কি সে কথাটাও ভুলিয়া গেলেন।

প্রতিমা কহিল,—"তার চেয়ে আমি একটু দূরে দূরেই থাক্‌ব, মা! একেবারে সব সময়ে তোমার কাছটিতে নাই বা আস্‌লাম। কাছে এসে তোমার চোখের জলই যদি আমায় দেখ্‌তে হয়, মা, তা' হ'লে—"

ক্ষমাসুন্দরী তাঁহার অশ্রু-পরিপ্লুত মুখ তুলিয়া বধূর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—

"তুমি দূরে থাক্‌লেই কি আমার চোখের জল বন্ধ হয়ে যাবে মা? আর এ পোড়াচোখের জল আমি কি ইচ্ছে করেই আনি? যিনি এ জল দিয়েচেন, তিনি যদি না ফিরিয়ে নেন, রোধ করে না দেন, কেমন করে যাবে, মা?"

দূরে পায়ের শব্দ শুনা গেল।

ক্ষমাসুন্দরী আঁচল তুলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে কহিলেন,—"সতীশ আস্‌চে বুঝি!"—

"আমি পাণ নিয়ে আস্‌চি, মা"—বলিয়াই প্রতিমা দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বারান্দার উপর আসিয়াই অন্ধকারের দিকে সরিয়া গিয়া একটু দাঁড়াইল। অশ্রুসিক্ত দুই চোখের দৃষ্টি সান্ধ্য-আকাশের দিকে স্থাপন করিয়া মনে মনে কহিল,—"হে ঠাকুর, আজ তুমি আমাকে এতখানি অসহিষ্ণু করে তুল্‌লে কেন? যার চোখের জল মোছাবার কেউ নেই, তাকে যে এ জল নিজ থেকে শুকিয়ে নিতেই হবে! চোখ্ দুটোকে শুষ্ক রাখ্‌তে পারি, আজ ঠাকুর, অন্ততঃ সেই শক্তিটুকুই আমাকে দাও!"—তার পর মুহূর্ত্তেই সেখান হইতে চলিয়া গেল!

সতীশ আসিতেই ক্ষমাসুন্দরী কহিলেন,—"একটু কিছু মুখে দিয়ে নাও বাবা, তার পর ক'টা কথা বল্‌ব। সেই জন্যই তোমাকে এত তাড়াতাড়ি আস্‌তে লিখ্‌তে বলেছিলাম।"

সতীশ কিছু খাবার মুখে তুলিয়া দিতে দিতে কহিল,—“আপনার শরীর এমন খারাপ হয়ে পড়েচে মা, আমি এতটা তো মনে করিনি!”—

“কি হবে, বাবা, শরীর দিয়ে? তোমাদের কটিকে রেখে এখন চলে যেতেই পারলেই যে রক্ষা পাই! মেয়েমানুষের দীর্ঘজীবন পাওয়াটা কিছু নয়।”

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া একেবারেই বলিয়া উঠিলেন, “ও তো রেঙ্গুন যাবেই! বিছানাপত্র সব বাঁধা হ’য়ে গেছে, কাল সকালেই যাবে। বাড়ীতে কারু কথাই তো গ্রাহ্য কর্‌বে না, আর কেই বা সাহস করে ওকে কি বল্‌বে? তুমি যদি বলে কয়ে কিছু কর্‌তে পার, দেখ!”—

এক নিশ্বাসে সবটুকু নিঃশেষ করিয়া বলিয়া ফেলিয়া যেন খুব মস্ত একটা বোঝা নামাইয়া ফেলিয়াছেন এমনি ভাবে বসিয়া রহিলেন, কিন্তু হাতের মধ্যের মালাগাছটী যে অত্যন্ত দ্রুত ফিরাইতেছেন, তাহা নিজের কাছেও অজানিত রহিয়া গেল।

ক্ষমাসুন্দরী যে কাহার সম্বন্ধে কথাগুলি বলিলেন, তাহা বুঝিতে সতীশের তো বেশী সময় লাগিলই না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে এটুকু বুঝিয়াও শিহরিয়া উঠিল, যে, কত বড় দুঃখে এই অত্যন্ত স্নেহশালিনী জননী একমাত্র পুত্রের নামটি পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলেন না।

একটু হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া সতীশ কহিল, —“শৈলেশ বুঝি এই সব পাগলামো কর্‌চে?”—কিন্তু সে মনে মনে বেশ জানিত, যে, ঐ এক রোখা শৈলেশ তাহার বাল্যকাল হইতে এ পর্য্যন্ত যাহা ধরিয়াছে, তাহা করিয়াই ছাড়িয়াছে, কাহারও নিষেধ গ্রাহ্য করিবার মত পাত্র সে মোটেই নহে।

সুতরাং কাল সকালে সূর্য্যদেবের পূবের দিকে ওঠাও যেমন খুবই ঠিক্, তেমনি শৈলেশের রেঙ্গুনযাত্রাও অত্যন্ত সুনিশ্চিত।

তবু সতীশ কহিল,—"নাঃ, কোথায় যাবে! আমি যখন এসেই পড়েচি, তখন ওর যাওয়া ততটা সহজ হবে না, মা! আপনি ভাব্বেন না, আমি ওকে বুঝিয়ে ঠিক্ কর্ব!"

ক্ষমাসুন্দরী কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "পার ভালই, কিন্তু পার্বে মনে হয় না। ছেলে বেলায় এক দিন, তুমি যেখানে বসে আছ, ঠিক্ ঐখানটাতেই বসে, ছুরি নিয়ে কাটাকুটী কর্ছিল। বল্লাম, 'ছুরি দে, হাত কেটে ফেল্বি।' "ছুরি দেব না" একবারটি বলেছিল, কোনও মতেই কি ওর কাছ থেকে ছুরি কেড়ে নিতে পার্লাম! হাতটা কেটে ফেল্ল, রক্তে ভেসে যাচ্ছিল, তবু লাঠিটা কাট্তেই থাকল! আবার আঙ্গুল কাট্ল; এম্নি তিনবার করে হাত কেটে রক্তারক্তি হ'ল, তবু যতক্ষণ লাঠি তৈরী না হয়ে গেল, ততক্ষণ লাঠিও ছাড়্ল না, ছুরিও রাখ্ল না! এতখানি বয়স ওর ঠিক্ এম্নি করেই কাট্চে! কে জানে, বাবা, এর শেষ ফল কি দাঁড়াবে?"

দুয়ারের কাছ পর্য্যন্ত পাণের ডিবা লইয়া প্রতিমা আসিয়াছিল। দূর হইতেই শ্বশ্রূর চোখে জল দেখিয়া ফিরিয়া গেল, এবং দূরে বারান্দার এক কোণের অন্ধকারের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার একবার ইচ্ছা হইয়াছিল যে কবাটের কাছটিতে দাঁড়াইয়া কথাগুলি শুনিয়া লয়, কিন্তু সে নিঃসন্দেহেই বুঝিয়াছিল যে, সেখানে স্বামীর সম্বন্ধে আলোচনাই চলিতেছে। সুতরাং সে দূরে, যেখানে থাকিয়া কথাগুলি শুনিবার কোনও সম্ভাবনাই নাই, সেইখানটীতে যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আজ যে বাড়ীর প্রত্যেকেরই বুকের মধ্যে তাহারই স্বামীর দেওয়া একটা তীব্র আঘাতের বেদনা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে, সকলেই

যে তাহার মুখের দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে সহস্রবার চাহিতেছে, এ কথাটা সে কোনও মতেই ভুলিতে পারিতেছিল না।

সে যে তাহার স্বামীর উপেক্ষিতা, এ সত্যটা তাহার নিজের কাছে একটা নূতন খবর না হইলেও, আজ যে সেই উপেক্ষা জিনিষটাকে চারিদিক হইতে জানাইয়া দিবার জন্য একটা বিপুল আয়োজন তাহার স্বামীর হাত দিয়াই বিশেষ করিয়া হইয়া গেল, এ কথাটা তাহাকে ক্রমাগতই অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করিতেছিল।

এটা যে একটা মস্ত সত্য কথা, এবং একে মিথ্যা করিয়া দেওয়ার কোনও সম্ভাবনাই যে একেবারেই নাই, সব চেয়ে এই চিন্তাটাই বিশেষ করিয়া বুকের মধ্যে সহস্র ফণা তুলিয়া তাহাকে নির্ম্মমভাবে দংশন করিতেছিল।

বাহিরে আকাশ ভরিয়া নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়া স্থির লক্ষ্যে এই পৃথিবীর মেয়েটীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

উহারও বুকের ভিতরে যে কত দুঃখের কথা, বেদনার কাহিনী নিবিড় হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে! বেদনার রক্তরাগে তাহারাও যে ঠিক্ অমনি জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে!

পায়ের শব্দ শুনিয়া প্রতিমা বুঝিল, সতীশ বাহির হইয়া আসিতেছে। সে দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া গিয়া কহিল, "এই যে পাণ নিয়ে এসেচি! অবিশ্যি ঠাকুরঝির ঘরেও বিস্তর রয়েচে, তবু এর দুটো'ও নিয়ে যান।"—

প্রতিমার প্রসারিত হাতের উপরকার খোলা ডিবাটার ভিতর হইতে দুটা পাণ তুলিয়া লইয়া মুখের মধ্যে পূরিয়া দিতে দিতে সতীশ প্রায় রুদ্ধস্বরে কহিল, "ধন্যবাদ আপনাকে!"—

কিন্তু তার পরই যে কি কহিবে বুঝিতে না পারিয়া যখন একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল, ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তটিতেই জুতার শব্দ শুনা গেল।

সতীশ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, শৈলেশ আসিতেছে!

সে শৈলেশের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া যাইতেই শৈলেশ কহিল, "বাঃ, তুমি যে ঠিক্ সময়টিতেই হাজির আছ!—চিঠি লিখে আনা হয়েচে বুঝি তোমাকে?—ওঃ!"

সতীশ অত্যন্ত গম্ভীর মুখে কহিল, "তোমাকে আমার কয়েকটা কথা বল্‌বার আছে!"—

—"তা' বেশ্, আমিও কিছু বল্‌ব!"

প্রতিমা তখন জলখাবারের থালা গেলাসগুলি তুলিয়া লইয়া আসিয়া দুয়ারের কাছে বাহিরে যাইবার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল।

শৈলেশের কথা শুনিয়া সে তাহার ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল। একবার মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চক্ষু দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। তার পরই চোখের জলে সে আর পথ দেখিতে পাইল না। হাত বাড়াইয়া দুয়ারের কাঠটা চাপিয়া ধরিয়া সে একটু স্থির হইয়া দাঁড়াইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল।

শৈলেশ ও সতীশ ততক্ষণ বাহিরের বসিবার ঘরের দিকে চলিয়া গিয়াছে।

জীবনে যে সব চেয়ে প্রিয়, বেদনাটা যদি ঠিক তাহার নিকট হইতেই লাভ করা যায়, তাহা হইলে সেই বেদনার তীব্রতা যে কতখানি তাহা বুঝাইয়া দিবার প্রয়াস যে বেদনা পায় তাহার মোটেই থাকে না! শুধু নীরব অভিমানে বেদনা বহন করিয়া যাইবার জন্যই সে একবারে উন্মুখ হইয়া উঠে! আর যে বেদনা দেয়, সে দংশনকারী বিষধরের মতই, একটা তীব্রজ্বালায় শুধু অস্থির ও উগ্র হইয়াই উঠে এবং বারম্বার আঘাত করিয়া সেই জ্বালাটাকে শান্ত করিতে চাহে, কিন্তু তাহাতে জ্বালার নিবৃত্তি তো হয়ই না, শুধু বাড়িয়াই চলে!

বাহিরের বসিবার ঘর হইতে শৈলেশ যখন শয়নগৃহের দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। শৈলেশ চৌকাঠ পার না হইয়াই মুখ বাড়াইয়া ঘরের ভিতরটা একবার দেখিয়া লইল।

স্তিমিত প্রদীপালোকে ঘরের কতকটা অংশ দেখা যাইতেছিল। খাটানো মশারিটার ছায়া যে দিকে পড়িয়াছে, সেই অন্ধকার জায়গাটিতে, অন্য দিনের মতই আজও একটা পাটী বিছানো ছিল, কিন্তু সেই ভূশয্যার উপর প্রতিদিন যাহাকে পড়িয়া থাকিতে দেখা যাইত, শৈলেশ বারম্বার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়াও আজ আর তাহাকে সেখানটিতে দেখিতে পাইল না।

তখন সে বাহিরের বারান্দার রেলিংএর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

ঠিক্ একখানি মণিমুক্তা-হীরক-বিন্দুখচিত গাঢ় নীল চন্দ্রাতপের মতই, মাথার উপরকার নির্মেঘ নীলাকাশ অনন্ত নক্ষত্ররাজি খচিত হইয়া শোভা পাইতেছে।

ধনীর ক্ষুদ্র দুরন্ত দুলালীর মতই অশান্ত ধরণী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে!

চূর্ণ কুন্তলের মতই তাহার কাননকুন্তল একটু দুলাইয়া, একটু কাঁপাইয়া, শীতল বায়ুপ্রবাহ এই উচ্ছৃঙ্খল দুলালীর সর্ব্বাঙ্গের উপর দিয়া মৃদু সঞ্চারিত হইতেছিল।

কোনও দিকেই শৈলেশের দৃষ্টি ছিল না। আজ যে অবস্থাটাকে সে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইতে চলিয়াছে, শুধু তাহারই আলোচনা এতক্ষণ ধরিয়া তাহার মনের মধ্যে চলিতেছে। সতীশের কথাগুলি তখনও তাহার কাণের কাছে বাজিতেছিল।

নিজের খেয়ালবশে চলিতে যাইয়া এই যে তীব্র দুঃখ মানুষের অন্তরে দেওয়া, ইহার শেষফল যে কোনও কালেই ভাল হইতে দেখা যায় নাই, এ তথ্যটা সতীশ আজ তাহাকে বারবারই জানাইয়া দিয়াছে!

তর্কের মুখে শৈলেশ সতীশকে হাসিয়া উড়াইয়া দিতে যতই চেষ্টা করিয়াছে, ততই ঐ কথাটার সত্যমূর্ত্তিটি তাহার অন্তরের কাছে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

কারণ তর্কের ফাঁকিতে মানুষ নিজের অন্তরটাকে কোনও দিনই তো ভুলাইতে পারে নাই। যেটা আসল কথা, যেটা ঠিক্ সত্য কথা, সেটাকে ধরিতে মানুষের এই বিচিত্র মনটার কোনও দিনই এতটুকুও বিলম্ব হয় না। সে তাহাকে মুখে উড়াইয়া দিতে চাহিলেও, অন্তরে অন্তরে ঠিকই চিনিয়া লয়, বরণ করিয়া লয়।

কিন্তু এত বুঝিয়াও মানুষ কি জিদ ছাড়িতে চায়, না পারে! জিদটা ছাড়ার মধ্যেই যে মানুষের সবল প্রকৃতির পরিচয়টা লুকাইয়া রহিয়াছে, তাহা কোনও মতেই সে স্বীকার করিতে চাহে না।

সাধারণ মানুষ ঠিক্ ঐখানটাতেই চিরদিনই দুর্ব্বল রহিয়া গিয়াছে।

সতীশের সঙ্গে তর্কে শৈলেশ যতই নিজের অন্যায়টা বুঝিতে পারিতে-ছিল, ততই সে উগ্র হইয়া উঠিয়া নিজের দুর্ব্বলতাটাকে দুই হাতে ঢাকিয়া

চাপিয়া রাখিতেছিল। যখন সে ঘর হইতে বাহির হইয়া চলিয়া আসিল, তখন সে নিঃসন্দেহই বুঝিতে পারিল যে, সতীশের সঙ্গে এ তর্কযুদ্ধে পরাজয়ের কলঙ্ক তো সে সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া আসিলই, বেশীর ভাগে তাহার বুকের ভিতরটাও একেবারেই ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু তবু সাধারণ মানুষ কোনও দিনই ঠিক্ এইখান হইতে ফিরিতে চাহিলেও, তাহা পারে নাই। যে পারিয়াছে, সে অনেকখানি ভুলভ্রান্তির হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। যে পারে নাই, সে ডুবিয়াছে এবং তাহার যুক্তি শেষটা শুধু এই দুইটা কথার মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া যায় যে, যদি নামিয়াছি, পাতাল কতদূর একবার দেখিব।

শৈলেশও ঠিক্ এই যুক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করিল।

কিন্তু তাহাতেই কি তাহার চিত্তের শান্তি ফিরিয়া আসিল? সে আঘাত করিবার জন্যই উগ্র হইয়া উঠিয়াছে,—কিন্তু আঘাতের জ্বালাটা যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া, আঘাতকারীকেও ভাগ করিয়া লইতে হয়, এটা সে সব চেয়ে বেশী করিয়া আজই অনুভব করিল।

বাহিরের শীতল নৈশ বায়ু তাহার উত্তপ্ত ললাটের উপর স্পর্শ দিয়া যখন তাহার দারুণ দাহটাকে মোটেই অপহরণ করিয়া লইতে পারিল না, তখন সে সকল দ্বিধা ও সঙ্কোচের বাধা কাটাইয়া হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল!

ঘরের আলোটা নিস্তেজ করিয়া দিয়া প্রতিমা ছোট জানালাটার কাছেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

শৈলেশের পায়ের শব্দ শুনিয়া সে ফিরিয়া চাহিল না।

কিন্তু শৈলেশ যখন তাহার গুছানো সাজানো ট্র্যাঙ্ক্‌টা টানিয়া নামাইয়া অনর্থক সমস্ত জিনিষপত্রগুলি ওলট্ পালট্ করিতে বসিয়া গেল, তখন প্রতিমার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, ঐ নিষ্ঠুর লোকটারও

বুকের ভিতরটায় কোথায় এখনও একটু 'কাঁচা' রহিয়াছে, এবং সেই জন্যই আজ সে অন্য দিনের মতই সোজাসুজি যাইয়া শয্যাগ্রহণ করিতে পারিল না। শুধু কাজের অছিলায় জাগিয়া থাকিয়া কিছু সময় কাটাইয়া দিতে চাহিতেছে!

কিন্তু এই ব্যাপারটার মধ্যে কোথায়ও প্রতিমার স্থান আছে কি না, বিবাহের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত এই দুর্ব্বোধ্য লোকটীর সমস্ত ব্যবহার-গুলি আগাগোড়া মিলাইয়া লইয়াও প্রতিমা তাহা ধরিতে পারিল না।

সুতারং সে জানালার অস্পষ্ট আলোকের মধ্যে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, মধ্যে একবার শুধু চকিত দৃষ্টিতে সমস্ত ব্যাপারটা দেখিয়া লইল।

হঠাৎ একটু অস্ফুটকণ্ঠে শৈলেশ বলিয়া উঠিল, "আমার ছবিখানা কি হয়ে গেল?"

ঘরের মধ্যের উপস্থিত দ্বিতীয় প্রাণীটিকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতেই হইবে, এটা সুস্পষ্টই যখন বুঝা গেল, তখনও প্রতিমা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল।

ছবি খুঁজিয়া না পাইয়া হয় তো নিজের মনেই শৈলেশ ওকথাটা বলিয়া থাকিবে, তাই প্রথমটাই নিজেকে ধরা দিবার ইচ্ছা প্রতিমার ছিল না।

কিন্তু ছবি কোথায় গেল, সে খবরটা প্রতিমার কিছু জানা ছিল বলিয়াই, সে অনেকখানি আড়ষ্ট হইয়া পড়িল। গুছানো ট্র্যাঙ্ক্‌টার নীচ হইতে অপহৃত ছবির খোঁজ যে ঠিক্ এই মুহূর্ত্তেই পড়িয়া যাইবে, প্রতিমা তাহা স্বপ্নেও মনে করিতে পারে নাই। এখনি যে এ বিষয়ে একটা উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতে পারে, সে জন্য সে প্রস্তুতও ছিল না! তাই শৈলেশের মুখে ছবির সম্বন্ধে প্রশ্ন শুনিয়া সে অনেকখানি দমিয়া গেল।

ট্রাঙ্কের জামা কাপড়গুলি আর একবার পাঁতি পাঁতি করিয়া খুঁজিয়া

দেখিয়া শৈলেশ কহিল, "বাঃ, আমার ছবি ?" এবং ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সে যে জানালার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল, প্রতিমা ঘাড় ফিরাইতেই তাহা দেখিয়া ফেলিল।

আজ পূর্ব্ব হইতেই প্রতিমা শৈলেশের সঙ্গে কিছু বোঝা-পড়া করিয়া লইবে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যে লোক ঘরে আসিয়া কোনও দিনই কিছু ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করে না, তাহার কাছে কেমন করিয়া লজ্জাহীনার মত প্রথমটাই তাহার দাবীর আর্জি নিয়া উপস্থিত হইবে, তাহা বুঝিতেই পারিতেছিল না।

কিন্তু ছবির কথার উত্তর যখন তাহার কাছে আজ বিশেষ করিয়াই চাওয়া হইতেছে, তখন সে আর একটুও দ্বিধা বা সঙ্কোচ না রাখিয়া একেবারে ঘরের মধ্যে ট্রাঙ্কের পাশেই আসিয়া দাঁড়াইল।

শৈলেশ চক্ষু তুলিয়া চাহিতেই কহিল, "কিছু বল্‌লে আমাকে ?"

শৈলেশ বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রতিমার মুখের দিকে মুহূর্ত্তের জন্য চাহিয়া রহিল ; তার পরই কি ভাবিয়া বিশৃঙ্খল জামা কাপড়গুলির দিকে চক্ষু নামাইয়া লইয়া ধীরে কহিল, "হাঁ, আমার ছবিখানার কথা জিজ্ঞেস কর্‌ছিলাম !"

"কোন্ ছবি খানা ?"—ছবি খানার বর্ণনা প্রতিমার কাছে দেওয়া যে শৈলেশের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব তাহা প্রতিমা বেশ জানিত।

তবু আজ সে যেহেতু নিজের দাবী ও অধিকারের হিসাবটা শৈলেশকে জানাইয়া দিবার অসম্ভব কল্পনা কতবারই মনের মধ্যে আনিয়াছিল, তাই এই মুহূর্ত্তে কোনও দিক দিয়াই শৈলেশকে ক্ষমা করিবার প্রবৃত্তি তাহার ছিল না !

প্রতিমার কথা শুনিয়া শৈলেশের অজ্ঞাতে কখন যে তাহার বুকের বোঝাটা অনেকখানি নামিয়া গিয়াছে, তাহা সে যেমন বুঝিতে পারিল

না, তেমনি এই কথাটাই বার বার মনে করিয়া, সে বিস্মিত হইয়া উঠিতে লাগিল, যে, যাহাকে আঘাত করিবার জন্য সে এতই আয়োজন করিয়া তুলিয়াছে, এমন করিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে, তাহার সঙ্গে এমন সহজ সরল ভঙ্গিতে কথা আরম্ভ হইয়া গেল কেমন করিয়া ?

মেঘাবৃত অন্ধকার রাত্রিতে কালো আকাশের গায়ে বিদ্যুতের নিকষরেখার মতই হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, যে, এই মেয়েটি কোনও দিনই তো তাহার কাছে এতটুকু দুর্ব্বলতা প্রকাশ করে নাই, চোখের জল তাহার মিনতি জানায় নাই, নিজের অধিকার কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া পাইবার জন্য কোনও সময়েই চেষ্টা করে নাই, অথচ বাড়ীর প্রত্যেকের নিকট হইতেই সে বিপুল স্নেহ অর্জ্জন করিয়াছে ; সমস্ত সংসারটার কাজকর্ম্ম তাহাকে বাদ দিয়া একটি দিনও যে চলিতে পারে না, তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করিয়াছে ! তাহাদের মধ্যে যে দুর্ভেদ্য সহস্র-যোজনের ব্যবধান, সে স্বেচ্ছায় গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহা শুধু এই ক্ষুদ্র শয়নগৃহটির চারিটি দেওয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে, এই অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়েটি সে খবরটা বাহিরে কাহারও কাছেই তো লইয়া যায় নাই।

তবু এই মেয়েটির কাছেই যে সে কি পাইতে পারিত না পারিত তাহার সংবাদটাও তো শৈলেশ এই সুদীর্ঘ চারিটি বৎসরের মধ্যে এক দিনও লইতে চাহে নাই !

যাহাকে আঘাত করা যায়, সে কতখানি বেদনা পাইল, আঘাত-কারীর সে খবরটা জানিবার জন্যও একটা প্রবল স্পৃহা থাকে। এবং এই স্পৃহাটার মধ্যে একটা তীব্র জ্বালা আছে, যাহা আঘাতকারী তৃপ্তির হিসাবেই গ্রহণ করিতে চাহে !

কিন্তু যে আঘাত পায়, সে যখন তাহার বেদনাবিকৃত মুখের করুণ

ছায়াটিই রাখিয়া চলিয়া যায়, তখন ঐ তৃপ্তিটা তীব্র জ্বালার আকারেই দেখা দেয়।—উহার মধ্যে আর আনন্দ বা তৃপ্তি কিছুই থাকে না!

কিন্তু আঘাত পাইয়াও যে মুখ বিকৃত করে না; এবং বেদনাবোধের শক্তি তাহার যে প্রচুরই আছে, সে খবরটা একেবারেই জানিতে দিতে চাহে না, এমন অদ্ভুত প্রকৃতির জীবের উপর আঘাতকারীর করুণা তো হয়ই না, বরং তাহার বেদনাবোধের পরিচয় পাইবার জন্য নিষ্ফল আক্রোশে ক্রমাগতই সে তাহাকে আঘাত করিতে থাকে! এবং প্রবল পক্ষের এই আঘাত দেওয়ার শেষ ঠিক তখনই হইয়া যায়, যখন দুর্ব্বল তাহার অধিকার বুঝিয়া পাইবার জন্য দুর্ব্বার শক্তিতে মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, অথবা একেবারেই নিষ্পিষ্ট হইয়া ধূলায় মিশাইয়া নিজের অস্তিত্বের চিহ্ন-টুকুও লোপ করিয়া দেয়।

শৈলেশ চিরদিনই প্রতিমাকে উপেক্ষাদ্বারা আঘাত করিয়া আসিতেছে; প্রতিমা অবিকৃতমুখে নীরবে তাহা সহ্যই করিয়াছে! কোনও দিনই নিজের অধিকার চাহে নাই, দাবী জানায় নাই। তাহার ন্যায্য প্রাপ্য কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া বুঝিয়া পাইবার জন্য বিদ্রোহ করে নাই!

শুধু তাহার শান্ত দুইটি চক্ষুর দৃষ্টি উৎসারিত করিয়া একবার হয় তো স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়াছে এবং মুহূর্ত্ত পরেই দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়াছে!

কিন্তু সে দৃষ্টি বিশ্লেষণ করিয়া মূর্খ শৈলেশ এতটুকু কাকুতি খুঁজিয়া পায় নাই, মিনতির চিহ্ন দেখে নাই, কাতরতার লেশ অনুভব করে নাই।

শৈলেশ মনে করিয়াছে, এ প্রাণহীন পাষাণ প্রতিমা, ইহাকে লইয়া দিন কাটিতে পারে না; সংসার রচনা চলিলেও, অন্তরের দারুণ ক্ষুধার তৃপ্তি ইহার কাছে মিলিতে পারে না।

সুতরাং প্রতিমা শৈলেশের কাছে দুর্ব্বোধ্যই রহিয়া গেল। এবং তাহার আঘাতও চরমসীমার জন্য ক্রমাগত অগ্রসর হইয়াই চলিল।

এমনটাই ঘটিয়া থাকে। দুনিয়ার ইতিহাসে, জাতির সংঘর্ষে ইহার পরিচয় মিলে। ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বন্দ্বেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

শৈলেশ যখন কোনও কথা না বলিয়া, নতমুখে জামাকাপড়গুলি অনর্থক নাড়িতেই থাকিল, তখন প্রতিমা ধীরে ধীরে কহিল, "একখানা ছবি আমি বের করে নিয়েছি। বোধ হয় ভুলে বাক্সে রেখেছিলে, সেখানা নিশ্চয়ই খুঁজচ না।" শেষের কথাগুলি প্রতিমা অত্যন্ত মৃদুস্বরেই কহিল; কারণ, কথা বলিতে যাইয়া যদি গলার স্বরটা হঠাৎ ধরিয়া আইসে, তাহা হইলে আজ যেমন লজ্জারও পরিসীমা থাকিবে না, তেমনই সে এই কাঙ্গালপনার জন্য নিজেকেও কোনও মতেই ক্ষমা করিতে পারিবে না।

কিন্তু কথাগুলি অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলিলেও উহার মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ হুল ছিল, যাহা শৈলেশকে বিঁধিল। সে ভিতরে ভিতরে উগ্র হইয়া উঠিল ও শান্তকণ্ঠে কহিল, "সেইখানাই খুঁজচি! কেন বাক্স থেকে বের করে নিলে?"

প্রতিমার মনে হইল, আজ স্বামীর কণ্ঠস্বরের মধ্যে যতটুকু কোমলতা সে পাইল, এমনটা তো আর কোনও দিনই পায় নাই। সে যে ঐ ছবিখানাই কেন আজ বাহির করিয়া নিয়াছে, তাহার ঠিক্ কারণটা শৈলেশের পায়ের উপর বারবার মাথা খুঁড়িয়া জানাইয়া দিতে ইচ্ছা হইতেছিল। কিন্তু তাহা বলিতে যাওয়া যে কতখানি অশোভন হইবে, তাহাও যেমন সে জানিত, তেমনই সে ভিতরে ভিতরে ইহাও বুঝিয়াছিল যে, ঐ কোমলতাটুকু, শিকারের প্রতি শিকারীর ক্ষণিক অনুকম্পার মতই অর্থহীন ও ক্ষণস্থায়ী!

কিন্তু তবু হঠাৎ প্রতিমার মুখ দিয়া যখন বাহির হইয়া গেল, "ওখানা বাক্‌সে যাবার তো কোনও দরকার দেখি না"—তখন সত্যই সে একেবারে এতটুকু হইয়া গেল।

শৈলেশ উগ্র হইয়া উঠিয়া বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কহিল, "তোমার নিজের দরকার অদরকার নিয়েই তো তুনিয়ার সব ব্যাপারের মীমাংসা হবে না।"

প্রতিমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। তবু কোনও মতে কহিল, "তা জানি, কিন্তু"—

কথা শেষ করিবার পূর্ব্বেই শৈলেশ কহিল, "এর মাঝে আর কিন্তু নেই, আমার ছবি দাও"—কিন্তু কথাটা এমনি রূঢ় শুনাইল যে, শৈলেশও বলিয়া ফেলিয়াই একেবারে স্তব্ধ হইয়া রহিল।

একটা কান্নার উচ্ছ্বাস প্রতিমার বুকের মধ্যে গুমরিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু আজ সে কোনও মতেই কাঁদিয়া কাঙ্গালপনা দেখাইতে রাজী নহে, তাই কম্পিত অধরপুট সবলে দাঁতে চাপিয়া একটুখানি চুপ করিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে কহিল, "ছবি আমি দিচ্ছি, যেটুকুতে আমার দরকার থাক্‌তে পারে, সেটুকু তুমি দাবীও কর্‌তে পার না এবং তা' পাবেও না!"—

প্রতিমার কথা শুনিয়া শৈলেশ বিস্মিতদৃষ্টিতে মুখের দিকে চাহিতেই তাহার নিবিড় কালো চক্ষু তুইটার উপর দৃষ্টি পড়িল। তুইটি চক্ষুর দৃষ্টিই হঠাৎ দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই আশ্রয়হীনের চকিত অসহায় দৃষ্টির সমস্ত বেদনাটুকুই প্রতিমার অশ্রুসিক্ত তুই চক্ষের মধ্যে ফুটিয়া উঠিল!

শৈলেশ কহিল, "তার অর্থ?"—

—"এর আর অর্থ কি? অপদার্থ মেয়েমানুষগুলির মান-অপমান

তোমাদের হাতে দেওয়া রয়েচে বলেই যে, তোমরা মান দিতে পার আর নাই পার, সময়ে অসময়ে অপমান কর্‌বে সেটা তো ঠিক্‌ নয়। তোমরা মান না হয় নাই দিলে, কিন্তু অপমানের হাতথেকেও কি রক্ষা কর্‌বে না?"

তিন দিন হইতে কত কথাই তো প্রতিমার বুকের মধ্যে জমাট্‌ বাঁধিয়া উঠিয়াছিল, আজ একটু আঘাত পাইতেই সেগুলি বাধামুক্ত জলরাশির মতই বাহির হইয়া আসিতে চাহিল!

কিন্তু পোড়া চখের জলও যেমন বাধা মানিতে চাহিল না, তেমনি গলার স্বরটাকে সে নিজেই এমনি বিশ্রী শুনিতে লাগিল, যে, তাহার এক মুহূর্ত্তও বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, এটা কান্নারই পূর্ব্বসূচনা মাত্র।

হায় রে মেয়ে-মানুষের জাত. এমনি অসহায় করিয়াই ভগবান এ জাতকে সৃষ্টি করিয়াছেন যে, ইহারা নিজের দাবী জানাইতেও যেমনি অক্ষম, তেমনি পাওনাটা বুঝিয়া লইতেও অপারগ!

এরা নিজের কথা কাহাকেও তো বুঝাইতে চাহেই না, যেটুকু চাহে, সেটুকু বুঝাইতে যাঁইয়া কথার চাইতে চোখের জলই দেখায় বেশী।

প্রতিমা মনে মনে কহিল, সুখ দুঃখের হিসাব তো আজ আর কর্ত্তে বসিনি, শুধু অপমানের হাত থেকে নিজকে বাঁচাব, তার জন্যও এত কাকুতি মিনতি জানাতে হবে! এ অধম মেয়েমানুষ জাতটার আর দাঁড়াবার জায়গা নেই বলেই তো তোমরা এতখানি আঘাত কর্‌তে সাহস কর! শুধু এই কথাটাই জেনে রেখেচ যে, এরা নীরবে সবই সহ্য কর্‌বে! কিন্তু এদেরও যে রক্তমাংসের শরীর, এদেরও যে সুখ দুঃখ বোধ আছে, বেদনা বোধ আছে, মান অপমান জ্ঞান থাক্‌তে পারে, শুধু সেই খবরটাই রাখ্‌লে না?—

কিন্তু ঘরে ঢুকিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও প্রতিমা একবার মনে করে নাই যে, ঠিক এতখানি দুর্ব্বলতা সে আজ প্রকাশ করিয়া ফেলিবে। তাই কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া নিজের হাতে নিজের গলা টিপিয়া ধরিতে ইচ্ছা হইতেছিল!

কিন্তু তার চেয়েও একটা বড় বিদ্রোহ মানুষের রক্তমাংসের শরীরটা মধ্যে মধ্যে জানাইয়া বসে। এই বিদ্রোহটাকে অস্বীকার করাও যেমন চলে না, তেমনি ইচ্ছা মতই একেবারেই একে দমন করিয়া দেওয়াও যায় না!

একটা ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া এই ভাবে একটা তর্কের সূচনা করিয়া দিয়াই একেবারে নীরবে দুইটি প্রাণীর পক্ষে সময় কাটানো একান্তই অসম্ভব।

বিশেষ শৈলেশ এই কথাটা মনে করিয়া ক্রমাগতই বিস্মিত হইয়া উঠিতেছিল যে, এই অত্যন্ত শান্তপ্রকৃতির মেয়েটি হঠাৎ আজ এত কথা শিখিল কোথা হইতে! আর এত দিনই বা সে এর পরিচয় পায়নি কেন? যে এমন করিয়া কথা বলিতে জানে, সে যে তাহার অন্তর-মধু দিয়া তাহাকে প্লাবিত করিয়া দিতে পারিত না, তাহাই বা সে কেমন করিয়া বুঝিল! অথচ ঠিক এই মেয়েটির সঙ্গেই সে আজ প্রায় পাঁচটা সুদীর্ঘ বৎসর এই ক্ষুদ্র ঘরটার চারিখানি দেওয়ালের মধ্যেই কাটাইয়া দিয়াছে।

কিন্তু মানুষের এই মনটা কি বিচিত্র করিয়াই ভগবান্ সৃষ্টি করিয়াছেন! শৈলেশ যদি ঠিক এই মুহূর্ত্তটিতেই এক বার বলিয়া ফেলিতে পারিত, "ওগো, তোমাকে আমিই মান দেব এবং সকল অপমানের হাত থেকে রক্ষা কর্‌ব,"—সব গোলই মিটিয়া যাইত।

কিন্তু শৈলেশ তাহা বলিতে ত পারিলই না, ঠিক সাধারণ মানুষের মতই—এবং অত্যন্ত রুষ্টকণ্ঠেই বলিয়া উঠিল, "ছবিখানি নিয়েছি, তার

মধ্যে যে অপমানটা কোথায় লুকিয়ে রয়েচে, তা বুঝবার মত সূক্ষ্মবুদ্ধি অন্ততঃ আমার তো নেই !”

এত বড় মিথ্যা কথাটা মুখ দিয়া বাহির করিয়া ফেলিয়াই শৈলেশের ইচ্ছা হইতেছিল, জিহ্বাটা দাঁতে কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিয়া দেয় এবং বারংবার চীৎকার করিয়া প্রতিমাকে জানাইয়া দেয় যে, ওকথাটা সে একেবারেই মিথ্যা বলিয়াছে।

কিন্তু শৈলেশের মন পূর্ব্ব হইতেই একটা বিশ্রী তিক্ততায় ভরিয়াছিল, তাই সে যখন নিজেকে শাস্তি দিতে পারিল না, তখন হঠাৎ উগ্র হইয়া উঠিয়া প্রতিমাকেই আঘাত করিল এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই অত্যন্ত রূঢ়কণ্ঠে “বেশ অপমান হয়ে থাকে দিয়ো না ছবি”,— বলিয়াই শৈলেশ জামা কাপড়গুলি অত্যন্ত বিশৃঙ্খলভাবে ট্রাঙ্কের মধ্যে ভরিয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রতিমা বিপদ গণিয়া কম্পিতপদে দেরাজের দিকে অগ্রসর হইয়া গেল, দ্রুতহস্তে একখানা ছবি টানিয়া বাহির করিয়া, শৈলেশের সম্মুখের টেবিলটার উপর রাখিতে গেল। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল এবং ঠিক এই মুহূর্ত্তটিতে চক্ষের সম্মুখ হইতে আলোটা যেন হঠাৎ নিভিয়া গেল।

যখন দুই হাত বাড়াইয়া সে টেবিলটা ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল, ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তেই শৈলেশের দৃষ্টি ছবিখানার উপর পড়িল।

বিবাহের পর দিনই সতীশ এই ছবিখানি তুলিয়াছিল। ছুরি দিয়া কাটিয়া কাটিয়া প্রতিমা তাহার বধূজীবনের প্রথম দিনকার ছবিটি চিহ্নহীন করিয়া তুলিয়া ফেলিয়াছে। শুধু শৈলেশের সঙ্গিহীন অক্ষত ছবিটাই এই দারুণ অপমানের বোঝাটা বহন করিয়া কার্ডবোর্ডের একটা পাশে যেন ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

রুষ্ট শৈলেশ ছবি তুলিয়া লইয়াই দুই হাতে টানিয়া ছিঁড়িল এবং হাত বাড়াইয়া জানালার ফাঁক দিয়া নীচে পথের ধূলার মধ্যে ফেলিয়া দিল।

পর মুহূর্ত্তে কোনও দিকেই না চাহিয়া সে যখন ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তখন প্রতিমা কোনও মতে তাহার মূর্চ্ছাতুর দেহটাকে পতন হইতে রক্ষা করিবার জন্য দুই হাতে টেবিলটা চাপিয়া ধরিল এবং নীচু হইয়া ধীরে ধীরে টেবিলটার উপরেই মাথাটা রাখিল।

তাহার অশ্রুপূর্ণ দুইটা চোখ ভয়ানক জ্বালা করিতেছিল এবং কণ্ঠ-নালীটা কেহ যেন কঠিন হস্তে চাপিয়া ধরিয়া নিশ্বাস রোধ করিয়া দিতেছিল।

তখন সে ধীরে ধীরে দুই চক্ষু মুদ্রিত করিল।

৬

ঠিক্ সেই সময়েই পার্শ্বের ঘরে ইজি চেয়ারের উপর হাত পা মেলিয়া দিয়া সতীশ শুইয়াছিল এবং পা ঝুলাইয়া দিয়া চেয়ারের হাতলের উপর বসিয়া উৎপল স্বামীর সহিত মৃদুস্বরে কথা বলিতেছিল। উৎপলের কোমল নত দৃষ্টির সহিত সতীশের উন্মুখ দৃষ্টি মিলিয়াছে, এবং উৎপলের ডান হাত খানা টানিয়া টানিয়া সতীশ মাঝে মাঝে এমনি অবস্থা করিয়া তুলিতেছিল যে, আর একটু টানিলেই ঠিক সতীশের গায়ে' উপর পড়িয়া যাওয়া ছাড়া উৎপলের উপায়ান্তর ছিল না।

কক্ষের উজ্জ্বল আলোক একখানি পরম সুন্দর মুখের হাসিটুকুর মতই শাণিত হইয়া রহিয়াছে।

শুভ্র শয্যাখানির উপর ক্ষুদ্র শিশুটি সমস্ত দিনের দস্যুতার পর অকাতরে ঘুমাইতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে তাহার ক্ষুদ্র রক্তাধরপুট হাসিকান্নার চুণিপান্নায় খচিত হইয়া উঠিতেছিল।

সতীশ তাহার স্নেহতরল দৃষ্টি মধ্যে মধ্যে শিশুটির মুখের উপর বুলাইয়া লইয়া আবার উৎপলের মুখের দিকে চাহিতেছিল। উৎপল কিন্তু অনন্তদৃষ্টি হইয়া স্বামীর মুখের দিকেই চাহিয়া রহিয়াছে।

সতীশ কহিল, "ওগো, দেখ্‌চ ?—হাসি কান্নার কি বিচিত্র খেলাই ঐটুকু শিশুর বুকের মধ্যে চলেছে !"

উৎপল ছেলের দিকে না ফিরিয়াই কহিল, "ও আমি রোজই দেখি আর ভাবি যে, তোমার চোখ্ দিয়ে দেখলেই আমার দেখবার আর কিছু বাকি থাক্‌বে না।"

"তাই বুঝি ওর দিকে মোটেই চা'চ্চ না"—বলিয়াই সতীশ উৎপলের হাতখানা একটু জোর করিয়াই টিপিয়া দিল।

"ওকে দেখ্‌বার লোক তো তুমিই এসেচ, তোমাকে দেখ্‌বার লোক ত এত দিন ছিল না, তাই আমি সেই শূন্য স্থানটা পূরণ করে নিচ্ছি!"—

"আর তোমাকে দেখ্‌বার লোকটি সে একেবারেই উহ্য রয়ে গেল, তার কি?"—

"দরকার তো নেই কিছু! যে দিন ও এসেচে ঠিক্ সে দিনই তো আমাকে দেখ্‌বার দরকার শেষ হয়ে গেছে!" উৎপলের মুখে একটা হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিতেছিল, সতীশ তাহার দুটা হাতই ধরিয়া ফেলিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "তাই নাকি?"—

একটু শক্ত হইয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া উৎপল কহিল, "অমন করে টেনো না, পড়ে যাব যে!—আচ্ছা, তুমিই বলনা, দরকার শেষ হয়ে যায় নি কি?"—

শেষের কথাগুলি বলিবার পূর্ব্বেই প্রথম কথার উত্তরে ইতিমধ্যে সতীশ বলিল, "জলে তো আর পড়্‌বে না,"—তার পর ধীরে ধীরে কহিল, "শেষ তো হয় নি, বরং বেড়ে গেছে! ও আস্‌বার আগে মনে হ'ত কোথায় যেন কি একটু বাকী রয়ে গেছে, সেটুকু না পেলে এ উচ্ছ্বাস এমনি ফেনিল, উদ্দাম রয়ে যাবে, ঠিক্ ভাদ্রের ভরা নদীটার মতই শান্ত সুন্দর হবে না, পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে না।"

উৎপল দুই কাণ ভরিয়া স্বামীর কথা শুনিতেছিল। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্ব তখন তাহার কাছে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

লক্ষ্যভেদের পূর্ব্বে অর্জ্জুনের স্থির দৃষ্টির সম্মুখে যেমন শুধু পাখীর দুইটি চোখই বর্ত্তমান ছিল এবং আর সবই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল,

৭

পর দিন বিকালের দিকে এক পশ্‌লা বৃষ্টির পর, চোখের জলে মাখামাখি পরমসুন্দর মুখখানির উপরকার অতর্কিত হাসিটীর মতই, সলিলসিক্ত নবীন পল্লবরাজির উপর সান্ধ্য সূর্য্যের রঙ্গিন আভা ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

জানালার কাছে দাঁড়াইয়াই বাহিরের খোলা বিচিত্র আকাশের খানিকটা চোখে পড়িতেছিল। খণ্ড, লঘু মেঘ, সাদা পাইল্ তোলা ছোট নৌকাগুলির মতই অনন্ত নীলিমার বুকে আনাগোনা করিতেছে। দু'একখানা কালো মেঘের শীর্ষে বিচিত্র রশ্মির ছটা, নিরাশার বুকে সুখের কল্পনার মতই রঙ্গিন্ হইয়া উঠিয়া জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে।

অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া, যখন দুই চোখ্ জ্বালা করিয়া উঠিল, তখন জানালার দিক্ হইতে পিছন ফিরিতেই প্রতিমা দেখিল, ঘরের মধ্যে টেবিলটার ঠিক্ কাছটীতেই উৎপল দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

উৎপলের ম্লান মুখের দিকে চাহিতেই প্রতিমার দুই চোখ্ জলে ভরিয়া আসিতেছিল, কিন্তু সে জোর করিয়াই মুখের উপর হাসি আনিয়া, "তুমি কখন এলে ঠাকুরঝি, আমি তো কিছুটী জান্‌তে পাইনি," বলিয়াই কাছে আসিয়া উৎপলের হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, "বেলা পড়ে গেছে, চল্, তোর চুল বেঁধে দি'; এ চুলের বোঝা এম্‌নি দেখ্‌লে তোর কর্ত্তাটী আমাকে মনে মনে যে গাল দেবেন, সেটি আমি নিশ্চিতই জেনে রেখেচি!"

এক নিশ্বাসে এতগুলি কথা বলিয়া ফেলার পরও যখন উৎপল এতটুকুও উৎসাহ না দেখাইয়া শুধু মলিন মুখে কহিল, "কি হবে চুল

বেঁধে, তুই চল্ যার কাছে! আজ সমস্ত দিনে একবারটী যাস্‌নি! সুরু আর আমি কতই তো বল্‌লাম,—কিন্তু সেই যে বিছানা নিয়েছেন আর এত বড় বেলাটা কেটে গেল, কিছুতেই কি উঠাতে পার্‌লাম!”—তখন প্রতিমার দুই চোখের সম্মুখের আলো যেন একেবারেই নিভিয়া গেল; এবং একটা কান্নার ঢেউ বুকের ভিতরে ছাপাইয়া উঠিয়া তাহার গলাটা একেবারেই বুজাইয়া দিতে চাহিল, কিন্তু তবু সে জোর করিয়াই অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে কহিল, “প্রত্যেক খুটিনাটিকে খুব শক্ত একটা কিছু করে তোলাই যে তোদের কাজ তা আমি তো বেশ্ ক’রেই জানি!” এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য খানিকটা অগ্রসর হইয়া গেল। তার পরই হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “হাঁ, তুই ওখানে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছ্‌তে থাক্! আচ্ছা, তোদের হ’ল কি, বল্‌তে পারিস্? আর এমন পান্‌সে চোখও তোদের এই গোষ্ঠীর!”

তার পর মুহূর্ত্তে একেবারেই চুপ করিয়া যাইয়া মনে মনে কহিল, “শুধু আমিই বুঝি তোদের মাঝখানে এমন একজন এসে পড়্‌লাম, যার বুকটাও পাষাণ দিয়ে বাঁধানো, আর চোখ দুটোও একেবারেই মার্বেল পাথরের তৈরী!”

কিন্তু এমন একটা কথা ভাবিলেও, সে মনে মনে ঠিক্‌ই জানিয়া রাখিয়াছিল যে, আজ এই এত বড় বাড়ীটার সমস্ত নিরানন্দ দূর করিবার ভার শুধু তাহার উপরেই অর্পণ করিয়া নিষ্ঠুর দেবতাটী নিশ্চিন্ত রহেন নাই, সঙ্গে সঙ্গে সকলের বেদনা হরণ করিয়া লইবার ভারও তাহারই উপর দিয়া রাখিয়াছেন!

ওরে, অদৃষ্টের এমনি তীব্র উপহাস যে, যে বেদনা দিয়া গেল, সে যে কত বড় নিষ্ঠুর, সে বিচার কেহই করিবে না। শুধু সেই যে কতখানি

ভাগ্যহীনা প্রত্যেকের করুণ ইঙ্গিতে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়া নিশিদিন তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবে! অথচ তাহার এই যে, এত বড় দুর্ভোগ, এটা তাহার নিজের কোন অপরাধের জন্যই তো নহে!

কিন্তু এটা তবু একটা মস্ত সত্য কথা যে, সে সত্যই অত্যন্ত দুর্ভাগিনী, এ কথাটা সে নিজের কাছেও যেমন আজ আর অস্বীকার করিতে পারে না,—তেমনি বাইরের দশজনের কাছেও এ খবরটার সত্যতা এতটুকু প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না!

এই বাড়ীটার মধ্যে এই অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়েটীকে উৎপলা যেমন করিয়া চিনিয়াছিল, তেমন করিয়া আর কেহই চিনিতে পারে নাই। তাই সে হঠাৎ কাছে আসিয়া প্রতিমার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখ্ বৌদি, তুই যদি ঠিক্ এম্‌নি করেই সব চাপা দিয়ে নিজেকে নিয়ে ছুটোছুটি করিস্, তা' হলে তুই ক'দিন বাঁচ্‌বি!"—

মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়া উৎপলের মুখের দিকে চাহিয়া প্রতিমা বুঝিল যে, এর কাছে ফাঁকিটা যেমন একবারেই চলিবে না, তেমনি এর গলা ধরিয়া কাঁদিতে বসিয়া গেলেও শুধু কান্নার হাটই মিলানো হইবে!

সুতরাং সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে কহিল, "দেখ ঠাকুরঝি, ও চোখের জলের ভারটা আমি তোদের উপর দিয়েই নিশ্চিন্ত হয়ে বসেচি! সবাই গলা ধরাধরি করে কাঁদতে বসে গেলে, দুনিয়া একটুও অচল হ'য়ে রইবে না! শুধু কতকগুলি প্রাণীর মুখে তৃষ্ণার সময় এক ফোঁটা জলও পড়্‌বে না, আবার খিদের সময় দুটো যা' হোক্ যোগাড়ও হয়ে উঠ্‌বে না! বরং চোখের জল না ফেলেও বাঁচা চল্‌তে পারে, কিন্তু ওটাকে উপেক্ষা করে রক্তমাংসের শরীর যে মোটেই বয় না, এটা তো আর দু'বার করে বল্‌বার দরকার হবে না।"

উৎপল মনে মনে কহিল, "হাঁ, মেয়ে বটে! তোর মর্ম্ম যে বুঝ্‌ল না, সে যে কত বড় ভুল করে গেল, তা' তাকে একদিন যিনি বেশ্ ভাল করেই জানিয়ে দেবেন, তিনি আজ বুঝি তোর বুকের মাঝের প্রত্যেকটা নিঃশ্বাস গণে গেঁথে ঠিক করে রাখ্‌চেন, আর তোর দুই অশ্রুহীন চোখের জ্বালাটাকে জমিয়ে দারুণ করে তুল্‌চেন!"

প্রতিমা কহিল, "আচ্ছা বেশ কথা, তোদের এই চোখের জলের ফল তো এত দিন পাস্‌নি, এবার না হয় একটু,"—বলিয়াই উৎপলের মুখের দিকে চাহিয়া একেবারেই চুপ করিয়া গেল।

মানুষের চোখের দৃষ্টির ভিতর দিয়া যে এমন করিয়া অন্তর বেদনার পরিচয়টী ফুটিয়া উঠিতে পারে, তাহা সে বোধ হয় এই প্রথমই লক্ষ্য করিয়া শিহরিয়া উঠিল। তার পর প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "না ঠাকুরঝি তোর কাছে আর বেশী কথা বল্‌ব না। আজ আমাকে তুই ক্ষমা কর্! তোকেই আমার সব চেয়ে বেশী ভয় ছিল; তোর কাছেই যে আমি ধরা পড়ে যাব, তা' আমি ঠিকই জান্‌তাম্। এ পোড়া চোখের জল দেখ্‌তে চাস্‌নে ঠাকুরঝি,—তা' হলে তুইও বাঁচবি নে, মাও বাঁচবেন না! নিজের কথা কিছু ধরিনে। বিধাতাপুরুষের খাতা থেকে সে পাতাটা অনেক পূর্ব্বেই হারিয়ে গেছে,"—বলিয়াই প্রতিমা দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

যে জানালার কাছটিতে কিছুকাল পূর্ব্বে প্রতিমা দাঁড়াইয়াছিল, উৎপল সরিয়া আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল।

তখন অস্তমিত সান্ধ্যসূর্য্যের রঙ্গিন রশ্মিজাল মলিন হইয়া গিয়াছিল, দূর পল্লী প্রান্তের বাঁশ ঝাড়ের কাছ দিয়া নিবিড় ধূমরেখা আসন্ন সন্ধ্যার সূচনা করিতেছিল। আঁকা বাঁকা পথটী ধরিয়া পল্লীবধূর জল আনা শেষ হইয়া গিয়াছে! দূরের গ্রাম্য দেবালয়ে আরতির কাঁসর ঘণ্টা

বাজিয়া উঠিতেই, উৎপল তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ঠাকুর ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

সেখানে সন্ধ্যা আরতির আয়োজন শেষ করিয়া দিয়া আঁচলখানি ঘুরাইয়া গলায় জড়াইয়া প্রণাম করিতে করিতে অস্ফুটস্বরে কহিল, "ও পাষাণ ঠাকুর, তুমি সত্যিকার পাষাণের মতই নির্ব্বিকার হয়ে রইলে ; কতই যে তোমাকে ডাক্‌লাম, কই, তোমার পায়ের কাছে তার একটা ডাকও কি পৌঁছাল না !"—

"তা' কি হয় রে পাগ্‌লী, একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাসও যাঁর অগোচরে পড়্‌তে পায় না, তাঁর কাছে প্রাণের ডাক্ পৌঁছবে না এমনটা তো হ'তেই পারে না, রাণি !"

উৎপল চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিল। ঠিক তাহার পিছনে কখন সতীশ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—যেন তাহারই প্রাণের ঠাকুর কখন মূর্ত্তি ধরিয়া বাহিরে আসিয়াছেন !

উৎপল সতীশের দুইপায়ের উপর মাথা রাখিয়া মনে মনে কহিল, "বুঝি ভিতরে ভিতরে এতক্ষণ এইটুকুর অপেক্ষায়ই ছিলাম। তোমার মুখ দিয়ে শোনা কথাটা আমার কাছে যে কত বড় একটা অভ্রান্ত সত্যের মূর্ত্তিতে দেখা দেবে সেটা শুধু অন্তরে অন্তরে আমিই তো ভাল করে জেনেচি !"—

তার পর মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল "ঠাকুরঘরেও একটু নিরিবিলি পাব না, এখানেও তুমি এসে দাঁড়িয়েচ !"—

সতীশ দুই হাতে উৎপলকে টানিয়া তুলিয়া কহিল, "দুনিয়ায় আঘাত পেতে সুরু করেই ঠাকুরের কাছে এসে জানাও যে 'ও ঠাকুর তুমি আমার কথা শুন্‌লে না !—ওরে, এ পথটা চল্‌তে গেলে কত বাধা-বিঘ্নই যে দু'পায়ে ঠেলে যেতে হবে"—কথা শেষ করিতে না দিয়া উৎপল তাড়াতাড়ি ডান হাতে সতীশের মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—

"থাক্, তোমার আর অমন করে ভয় দিতে হ'বে না, প্রভু!"—

সতীশ উৎপলের হাতের উপরেই ক্ষুদ্র একটা চুম্বন দিতেই সে হাসিয়া হাত সরাইয়া লইল।

"আচ্ছা, না হয় নাই বা বল্লাম! কিন্তু আজ এই ঠাকুরের সাম্‌নেই তোমাকে একটা কথা বল্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে, রাণি! সেইটেই শুধু বলব। দুনিয়াটাকে যতটা কোমল মধুর বলে মনে হয়, ঠিক্ তেমনটাই নয়। এর মাটি, পাথরে কঠিন আঘাত দেবেই। আলোর পাশে ছায়ার মতই এর সুখের পেছনেই দুঃখের নিবিড় নিষ্ঠুরতা রয়েচে। তাকেও স্বীকার করে নিলেই তবে দুনিয়াটাকে ঠিক্ চেনা যাবে!"

"আচ্ছা, আচ্ছা আমি ও সব খবর জান্‌তে চাইনে! কি দরকার আমার ও সব দিয়ে!"—বলিয়াই উৎপল সতীশের হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, "চল, ঘরে চল;—তোমার চোখের অম্‌নি দৃষ্টি দেখ্‌লে আমার বুকের মধ্যে সত্যি কেমন করে ওঠে।"—

সতীশ তাহার দুই চোখের নিবিড় ম্লানদৃষ্টি এই সংসারজ্ঞানানভিজ্ঞা নারীর মুখের উপর কিছুক্ষণ স্থির করিয়া রাখিল, তার পরই একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল,—

—"তোমার গায়ে দুঃখের আঁচড়টীও না লাগে, জীবনে এর চেয়ে বড় কামনা তো আমার আর কিছুই নেই!"—

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া নিতান্ত অকারণেই দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিতেছিল।

সে সতীশের হাত ছাড়িয়া দিয়া আর একবার অঞ্চলপ্রান্তে কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

উঠিয়া দাঁড়াইয়াই দেখিল সতীশ মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

"আঃ, তোমার মুখের হাসি দেখে বাঁচ্‌লাম" বলিয়াই উৎপল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঘরের কাছ পর্য্যন্ত সতীশকে পৌঁছাইয়া দিয়া উৎপল কহিল, "খোকন্‌কে একটু দেখো ; যদি কেঁদে ওঠে,"—

—"তোমার কাছে দিয়ে আস্‌ব এই ত! আচ্ছা, সে আমি খুব পার্‌ব!"—

—"ওগো, না গো, তাকে একটু রেখো! কাঁদলে"—

—"হাঁ, কাঁদ্‌লে কি কর্‌ব তা' বলে যাও! আমার কাছে তার খাবারের ভাণ্ডারটা তো নেই, লক্ষ্মীটা,"—

"যাও, আমি পারিনে তোমার সঙ্গে,"—বলিয়াই কুটিলদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে একবার চাহিয়াই উৎপল দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

সতীশ ডাকিয়া কহিল, "এ লোকটা নিতান্তই এক্‌লাটী রইল, সেটা একেবারেই ভুলে যেও না কিন্তু!"—

৮

সতীশের কথা শুনিতে শুনিতে স্মিতমুখী উৎপল ক্ষমাসুন্দরীর পূজার ঘরের কাছে আসিয়া দেখিল, তিনি তখনও মোটা চাদরটা মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন।

প্রতিমা নীরবে পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিল; উৎপল আসিতেই প্রতিমা ডাকিল, "মা, ওঠ, অঞ্জলিটে দিয়ে নাও।"—

এর চেয়ে বেশী কথা বলার শক্তি প্রতিমার আজ আর ছিল না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু তবুও আজ সে বেশ করিয়াই জানিয়া রাখিয়াছিল যে তাহার সমস্ত লজ্জা ও অপমানের উপরেও তাহার কর্ত্তব্য অনেকটা বেশী বাড়িয়া উঠিয়াছে।

তাই সে জোর করিয়াই শান্তস্বরে কহিল, "এমন করে পড়ে রইলে তুমি, মা, এতে যে আমাদের অকল্যাণ হবে! ঠাকুরঝিরা মুখ মলিন করে ঘুরচে, তুমি যদি না ওঠ, ওরা কার মুখের দিকে চাইবে?"—

ক্ষমাসুন্দরী তিলমাত্রও বিলম্ব না করিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং দুই হাতে প্রতিমার মাথাটা বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া কিছুক্ষণ একেবারেই চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে কহিলেন, "ওরে, সবই তো আমি বুঝি, কিন্তু ভাবি, এমন কি মহাপাপ করেছিলাম যে, তোদের এ কাঁচা বয়সের হাসিখেলা দেখে চোখ্ জুড়াব, তাও অদৃষ্টে ঘট্‌ল না। ওরে, তোকে যে দিন কর্ত্তারা ঘরে এনেছিলেন, কত আহ্লাদে বরণ করে ঘরে তুল্‌লাম, কিন্তু তখন তো একবারটীও মনে করিনি যে, তোকে এই ঘরেই এম্‌নি করে ব্যথা সইতে হবে!"

কথা শুনিয়া প্রতিমার বুকের মধ্যে শুকাইয়া উঠিতেছিল, তবু সে

জোর করিয়া মুখের উপর হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল, "ঐটে তোমার একটা মস্ত ভুল, মা! এমন সোণার সংসারের মধ্যে যাকে কত আশা করেই নিয়ে এসেছিলে, সে যে তোমাদের সবারই ব্যথার কারণ হ'য়ে উঠেচে, এর চেয়ে বড় দুঃখ আর তার কিছুই তো নেই, মা! নইলে, ঠাকুরঝিদের মত বোন্ যে পায় এবং তোমার মত মায়ের কোলে ঠাঁই পেয়ে যে কৃতার্থ হয়ে গেছে, তার কাছে ও কথা বল্‌লে চল্‌বে কেন, মা!" বলিয়াই তাড়াতাড়ি নীচু হইয়া ক্ষমাসুন্দরীর পায়ের উপর মাথা ঠেকাইতে তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

ক্ষমাসুন্দরী দুইহাতে বধূকে টানিয়া তুলিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "কর্ত্তা বল্‌তেন, 'এ সোণা আমি দুঃখের কষ্টিপাথরে যাচাই করে নিয়ে এসেচি। এ বংশের গৌরব আমার এই ছোট্ট মা-টীই রক্ষে কর্‌তে পার্‌বে, সে কথা, গিন্নি, আমি বেশ করে জেনেই একে নিয়ে এসেছি। একে যত্ন করে রেখো, কোনও দুঃখ দিও না, ভবিষ্যতের বংশ-প্রদীপ এর কোল থেকেই আমার কুল উজ্জ্বল কর্‌বে!' ঠাকুর বল্‌তেন এবংশে কেউ মহাপাপ করেনি', এসব কথাও আমি এই কাণেই শুনেচি; আর এম্‌নি পোড়া অদৃষ্ট আমার যে, এসবও আমাকে চোখে দেখে যেতে হ'ল! কিন্তু শুধু এই কথাটাই ভাবি যে, ওরে, এসব দেববাক্যি কি মিথ্যে হবার?"

সরযূ দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে কহিল, "দেববাক্যি মিথ্যে হয় না, মা! এত অল্পেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেল্‌লে চল্‌বে কেন? ঠাকুর এর চেয়েও বড় আঘাত যদি কোনও দিন দিয়ে বসেন তখন কি কর্‌বে মা?"

ঠিক্ এম্‌নি ধরণের কতকগুলি কথা সতীশের কাছ হইতে এই মাত্র শুনিয়া আসিয়া উৎপলের মনটা পূর্ব্ব হইতেই ভার হইয়াছিল এবং সে

একথাও জানিত যে, এসব বিষয়ে সরযূ সতীশেরই শিষ্যা। তাই অস্পষ্ট স্বরে তর্জ্জন করিয়া কহিল, "তুই যা, তোর বোনাইয়ের কাছে! সৃষ্টি ছাড়া কথারে বাপু এ দুটীর! গুরুর উপযুক্ত শিষ্যাই জুটেচে।"

সরযূ কহিল, "তা' যাচ্ছি দিদি, খোকন্ কান্না সুরু করেচে শুনে এলাম! কিন্তু সত্যি দিদি, দুঃখের নগ্নমূর্ত্তিটাকে একটু আগে থেকেই চিনে রাখ্‌লে ক্ষতি ত কিছু নেইই, বরং দুঃখকে সহ্য কর্‌বার শক্তিটা বেড়ে যায়। কিন্তু তা' কি কেউ পছন্দ করে?—করে না ত! আর করে না বলেই তো যত গোল।"

সরযূ চলিয়া গেল।

উৎপলের ইচ্ছা হইতেছিল, সরযূকে টানিয়া বুকের মধ্যে আনিয়া বলে, "ওরে, তোর কচি-বুকের মধ্যে কতখানি দুঃখকেই তুই আর নগ্ন করে দেখেচিস্! দুঃখের কোথায় আরম্ভ এবং কোথায় শেষ সে খবরটা এই বয়সেই তোর কাছে তো এখনই পৌছায় নাই রে! কিন্তু যেদিন পৌছিবে সেদিন দুঃখের সে রুদ্র নগ্নমূর্ত্তি দেখে তুই একেবারেই মুস্‌ড়ে না যাস্, শুধু এই একটা কথাই যে এবাড়ীটার সকলেরই বুকের মধ্যে তীক্ষ্ণ কাঁটার মতই নিশিদিন বিঁধে রয়েচে।"

কিন্তু আজ সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার যে কি হইয়াছে, তাহা সে যেমন বুঝিতে পারিল না, তেমনি তাহার কেবলি মনে হইতে লাগিল যে, চোখের জল জিনিষটাকে বাধা দিতে গেলেই ত আরও বেশী করিয়া দেখা দেয়।

তাই সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া চোখ দুটো বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিয়া সোজাসুজি মার কাছে যাইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "হাঁ তবেই হয়েচে! বৌটাকে এম্‌নি করে তুমিই অতিষ্ঠ করে তুল্‌বে দেখচি! আচ্ছা মা, এমন কি ব্যাপার হয়েচে যে, ইষ্টদেবতার পূজাও ভুলে যেয়ে এই রাত পর্য্যন্ত

পড়ে রইলে। ছেলে চাকরী বাকরী করতে কারই বা বিদেশে না যায়? এখন ওঠ বাপু, বৌটাকেও একটু নিশ্বেস্ ফেল্‌তে দাও।”

পূজার আয়োজন সরযূ পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছিল। ক্ষমাসুন্দরী আসনের উপর বসিতেই উৎপল ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

যত জোর দিয়াই সে কথা বলুক না কেন, আর এক মুহূর্ত্তও এখানে অশ্রুশূন্য চোখে দাঁড়াইয়া থাকা তাহার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ, জননীর দিকে সে যখন চাহিয়া দেখিল, তখন মনে হইল, তাঁহার মুখের উপর দিয়া কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তনই এই কয়েকটা ঘণ্টার মধ্যে আসিয়া গিয়াছে!

ঠিক্ যেন দশবৎসর বয়স বাড়িয়া গিয়াছে, এমনি ভাবে আসনের উপর আসিয়া বসিলেন এবং যে ভাবে মালাগাছটী হাত বাড়াইয়া তুলিয়া লইলেন তাহা দেখিয়া উৎপলের বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে লাগিল।

প্রতিমা কহিল, “মা, তুমি অঞ্জলিটে আজ একটু তাড়াতাড়ি দিয়ে শেষ কর; আমি যা’ হোক্ দুটো কিছু সিদ্ধ করে নামাইগে।”

প্রতিমা চলিয়া গেল। তাহার গমন পথের দিকে স্নেহপরিপ্লুত দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ক্ষমাসুন্দরী কহিলেন, “দুঃখের কষ্টিপাথরে যিনি তোকে যাচাই করে নিয়ে এসেছিলেন, এখন ভাবি, তিনি কি আগে থাক্‌তেই সব জান্‌তেন? আর তা’ না জান্‌লেই বা তাঁর মুখ দিয়ে অমন কথা বেরুবে কেন? এই পূজোর আসনে বসেই আমার মনে হচ্ছে সরযূর মুখ দিয়েই তো তিনি আমাকে জানিয়ে দিলেন যে, “দেববাক্যি মিথ্যে হয় না।” আজ শুধু সেই জোরেই আবার বল্‌চি যে, আমি দেখি আর নাই দেখি মা লক্ষ্মীটি আমার, তোর মুখে হাসি ফুটবেই।—তুই যে ঠাকুরের দেওয়া দুঃখকে স্বীকার করে নিতে পেরেচিস্, তার চেয়ে বড় পারা সংসারে তো আর কিছুই হতে পারে না।”

উৎপল হিসাবে একটা মস্ত ভুল করিয়া রাখিয়াছিল।

সরযূ তাহার কচিবুকের মধ্যে দুঃখকে যে কতখানি নগ্ন করিয়া দেখিয়াছে, সে খবরটা উৎপলের কাছে না পৌঁছিলেও আর একজনের কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছিল।

সতীশ জানিত ঐ ক্ষুদ্র বালিকার কচিবুকের মধ্যে একটা বোঝাপড়া ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং সে সংগ্রাম যে কতখানি বিপুল ও তীব্র সে খবরটারও কিছু একদিন তাহার কাছে অন্যের অলক্ষ্যে পৌঁছিয়া গিয়াছিল।

তাই সে দিন হঠাৎ সরযূ যখন আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, সতীশ বাবু, আপনি সেদিন দিদিকে বল্‌ছিলেন, 'দুঃখটা তার কাছে মোটেই দুঃসহ হয়ে ওঠে না, যে ওটাকে ঠাকুরের দেওয়া বলে স্বীকার করে নিতে পারে, এবং দুঃখ যতই তীব্র হোক্‌না কেন, ওর মধ্যে তাঁর মঙ্গল বিধান রয়েচে বলে বিশ্বাস কর্ত্তে পারে'। কিন্তু আমি তো শুনে অবধি, ও কথাটাকে ঠিক্ মনের মধ্যে গ্রহণ করে উঠ্‌তে পার্‌লাম না।" তখন সতীশ একটুও বিস্মিত হইল না।

শুধু তাহার দুই চোখের গভীর দৃষ্টি সরযুর মুখের উপর স্থাপন করিয়া কিছুকাল একেবারেই চুপ করিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে কহিল, "ওরে পাগ্‌লি, গ্রহণ করে উঠ্‌তে কি একদিনেই পারা যায়,—আর তা' ক'জনেই বা পেরেচে! কিন্তু তবু এটা সব চেয়ে বড় সত্যি কথা যে, পার্‌লেই দুনিয়ার একটা প্রকাণ্ড সমস্যার মীমাংসা হয়ে যেত!"

সরযূ কহিল, "কিন্তু যা' পার্‌লেই ভাল হয়, তা' মানুষ পারে না কেন ?—বা পার্‌তে চায়না কেন ?"

"এমন একটা প্রশ্ন করে বস্‌লে, লক্ষীটি, যার উত্তর ঠিক্ কথায় বলে বুঝিয়ে দেওয়া চলে না ত ! মানুষ যে কেন পারে না, তার উত্তর তার নিজের মনের কাছেই রয়েচে, এবং দুঃখের ঝঞ্ঝা যখন তার কাছে এসে পৌঁছে যায়, ঠিক্ তখনি সে বুঝ্‌তে পারে, যে, সে কেন পারে না।"—

—"কিন্তু যে শুধু দুঃখকেই জেনেচে, সুখের সন্ধান কোনও দিনই পায় নাই, বা পাবে না, তার কাছে বোধ হয় এই গ্রহণ করে উঠ্‌তে পারাটা সহজ হয়ে উঠে।"

বলিয়াই সরযূ দেওয়ালের টাঙ্গানো 'রামচন্দ্রের বনগমনের' ছবিখানির দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

সতীশ বিস্মিত দৃষ্টিতে সরযূর দিকে চাহিয়া চাহিয়া মনে মনে কহিল, "মিথ্যার আয়োজন যতই বিপুল হোক্ না কেন, মানুষের মন জিনিষটাকে ফাঁকি দেওয়া কিছুতেই চলে না ! ঐটুকু বালিকার কাছেও আজ যে তার চিরন্তন দুঃখের খবরটী ধরা পড়ে গেছে, তার কারণ ও ছাড়া আর কিছু তো নয়ই, কিন্তু তবু মনে হচ্ছে, ও এত কথা কোথায় শিখ্‌ল ?"

ছবিখানার দিকে চাহিয়া চাহিয়া হঠাৎ সরযূ কহিল, "দুঃখকে স্বীকার করে নিয়ে উনি যখন বনে গিয়েছিলেন, তখনও কিন্তু দুঃখটা যে কত বড় হয়ে উঠ্‌তে পারে, তা' মনে কর্‌তে পারেন নি ! পাশে সীতাদেবী ও পিছনে লক্ষ্মণকে পাওয়া হাজার দুঃখের মধ্যেও যে কতখানি সুখ তা' উনি মনে মনে নিশ্চিতই জান্‌তেন। তাই যখন সীতাকে হারালেন, তখন কত চোখের জলই ফেলেছিলেন, এবং এ সবই দুঃখকে

ঠিক্ গ্রহণ কর্‌তে পারেন নি বলেই তো? আপনি ঠিক্ই বলেছেন, সতীশবাবু, দুঃখের ঝঞ্ঝা ঠিক্ সাম্‌নে এসে না পড়্‌লে, কেউ বুঝ্‌তে পারে না, যে, তার শক্তি কতখানি, এবং এসব কথার উত্তর তার নিজের মনের কাছেই রয়েচে!"

"এই জায়গায় একটা মস্ত ভুল করে ফেল্‌লে লক্ষ্মী! উনি বনে যাবেন সেই দুঃখটাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং গ্রহণও করেছিলেন, এক মুহূর্ত্তের জন্যও তো সে দুঃখটাকে গ্রহণ কর্‌তে মনের ভিতর থেকেও আপত্তি জানান নি'!—অম্লান মুখে সে সত্যকে উনি রক্ষে করেছিলেন, কিন্তু তা' বলে সীতাদেবীকে হারাবেন এবং অত বড় দুর্ভোগ ভুগ্‌বেন, এটাকেও তো ওঁর অংশ বলে, মেনে নিতে পারেন না। কিন্তু যেদিন কর্ত্তব্যের জন্য ঐ সীতাকেও বর্জ্জন করা দরকার হয়েছিল, সেদিনও তো পিছিয়ে যান্‌নি; সেই মহৎ দুঃখকে বরণ করে নিতে শুধু ওঁর পক্ষেই পারা সম্ভব হয়েছিল; জগতে আর কেউ কি পেরেছে?"

"কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে একেবারেই ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিলেন, তাতেও তো সন্দেহ কর্‌বার কিছু নেই!"

সতীশ একটু হাসিয়া কহিল, "মানুষগুলি ইট্‌পাথর দিয়ে তৈরী নয় তো, সরযূ! রক্তমাংসের একটা দাবী আছে; সেটাকে অগ্রাহ্য করা গেলেও অস্বীকার করা তো চলে না! ক্ষতবিক্ষত হতেই হবে। কিন্তু ক্ষতবিক্ষত হয়েও মুস্‌ড়ে না পড়্‌বার মাঝেই গ্রহণ কর্‌বার শক্তির পরিচয় রয়েচে! বাইরে কোনও প্রকাশ বা চিহ্ন না রেখেও সমুদ্রের একেবারে অন্তস্তলে বিপুল আন্দোলন চল্‌তে পারে,—যাকে দুঃখ বলে জেনেচি, তার সঙ্গে যুঝ্‌তে হবে; তাকে আয়ত্ত করে নিতে হবে; কখনই তার কাছে পরাজয় স্বীকার করা হবে না।"

সরযূ ম্লান মুখে কহিল, "কিন্তু আপনি একদিন গীতার একটী শ্লোক

বুঝিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, যে, সুখেও যেমন বিগতস্পৃহ হবে, ঠিক্‌ তেম্‌নি দুঃখেও অনুদ্বিগ্নমন হতে হবে! এতে তো তা' হচ্ছে না, সতীশ বাবু! এ যে দুঃখের উদ্বেগ ও ক্ষত সবটাই বুকের মধ্যে জমা রয়ে গেল; —শুধু বাইরে তার প্রকাশ হচ্ছে না, এইটুকুই তো!"—

প্রবীণ দার্শনিকের মতই উত্তরে সতীশ অনেক কথাই বলিতে পারিত, কিন্তু সরযূর এই ক'টা কথায় এমন একটী বিপুল ব্যথার চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছিল, যাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সে অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিল।

দুনিয়ায় এমন অনেক ব্যাপার আছে এমন অনেক মর্ম্মন্তুদ ব্যথার কাহিনী আছে, যাহা নীরস দর্শন বিজ্ঞানের যুক্তি তর্কের কোনও ধার তো ধারেই না, পরন্তু একটী চিরন্তন নিষ্ঠুর সত্যের মতই জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত বুকের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া রহিয়া যায় এবং অহরহঃ তাহার নিষ্ঠুর অস্তিত্ব জানাইয়া দিয়া অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। একে যেমন অস্বীকার করাও চলে না, তেমনি ঝাড়িয়া ফেলাও যায় না।

সতীশের দুই চক্ষের দৃষ্টি ব্যথায় ম্লান হইয়া উঠিল!

কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই সরযূ অন্য দেওয়ালের আর একখানি ছবির দিকে ফিরিয়া কহিল,—

"হাঁ, আপনি আর একদিন বলেছিলেন, ক্রুশের কাঠে যখন এঁকে বিঁধে মার্‌লে, তখনও উনি ওঁর শত্রুদের ক্ষমা করে গেলেন; অতবড় বিশ্বাসের জোর ছিল বলেই না অমন করে নিজের চরম দুঃখকেও গ্রহণ কর্‌তে পেরেছিলেন," বলিয়াই একটুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ম্লান হাসি মুখে কহিল, "কথাটা কি জানেন, মানুষ এই দুনিয়ার সুখ দুঃখের হিসাবটাকে, রক্তমাংসের দাবীটাকেই বড় করে দেখে; এর সঙ্গে যে পরের জীবনটারও একটা যোগ রয়েচে, সেটা একেবারেই ভুলে যায়।"

এইটুকু বলিয়াই হঠাৎ তুইটা চক্ষু কেন যে জলে ভরিয়া উঠিল, তাহা না বুঝিয়া সে একটু হাসিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—

"এই দেখুন, চোখ্‌গুলি এমনি পান্‌সে, এই তু'টো কথা বল্‌তে গিয়াও এর কাছে রেহাই পাওয়া দায় হয়ে ওঠে"—বলিয়াই সরযূ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কৈশোর যখন শেষ সীমারেখার কাছটীতে আসিয়া পৌঁছিয়া গিয়াছে এবং যাহার আগমনবার্ত্তা সে সূচনাতেই জানাইয়া দিয়া গেল, সতীশ জানিত, তাহার দাবী ক্রমে বাড়িয়া ওঠাই স্বাভাবিক রীতি। এ দাবী মানুষকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া তোলে, মুহূর্ত্তের জন্য স্বস্তি দেয় না, এতটুকু আরামের অবসর প্রদান করে না।

আজ এই ক্ষুদ্র বালিকা, সেই সীমারেখার কাছটীতে আসিয়া দাঁড়াইয়াই, সম্মুখে যাহা দেখিল, তাহা নির্ম্মম ঝঞ্ঝার মূর্ত্তি ধরিয়া দারুণ হইয়াই রহিয়াছে, এবং যবনিকার অন্তরাল এতটুকু যে সরাইতেই, তুঃসহ অন্ধকার তাহার চোখে ঠেকিল, তাহা একান্তই তুর্ভেদ্য ও অন্তহীনের মতই নিষ্ঠুর!

সতীশ ভাবিল, 'এ নির্ম্মম পরীক্ষায় এই বালিকাকে যিনি বর্ত্তি ধরে পথ দেখাবেন, শুধু তিনিই জানেন যে ওর ব্যথার পরিমাণ ঠিক কতখানি, এবং কেমন করেই বা ও ওর চিত্তের শান্তিলাভ কর্‌বে!'

ঘরের মধ্যে অনেকক্ষণ একলাটী বসিয়া থাকিয়া সতীশ হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। এখন খোলা বারান্দার উপর দিয়া পায়চারি করিতে করিতে হঠাৎ থামিয়া গেল, এবং ঠিক্ তখনই বিকালের আফিস্ ট্রেণটার শব্দ শুনিয়া রেলিংএর উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে অন্যমনস্ক ভাবে চাহিয়া রহিল।

গাড়ীর জানেলা দিয়া অসম্ভব রকম ঝুঁকিয়া পড়িয়া এই বাড়ীটার

সে খবরটী জানাইয়া দিবার জন্য অন্তরে অন্তরে উন্মুখ হইয়া উঠিতেছিল।

সরযূর কণ্ঠ শুনা গেল, "দিদি, মা ডাক্‌চেন, শীগ্‌গির!"

মুহূর্ত্তের জন্য সতীশের উত্তপ্ত নিশ্বাসের স্পর্শ উৎপলের ললাটে আসিয়া লাগিল, তারপরই সে ছেলে কোলে লইয়া চলিয়া গেল!

প্রতিমাকে যে এ ঘরে আনা হইয়াছিল, তার একটু বিশেষ কারণ ছিল।

শৈলেশের পিতা শশাঙ্ক মুখুয্যের সহিত প্রতিমার পিতা চন্দ্রচূড় বাঁড়ুয্যের বান্ধবতার কথা এ অঞ্চলের লোকদের কাছে গল্পের বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল।

ছেলেবেলায় পাঠশালার ছেলেদের মধ্যে যে প্রীতির সঞ্চার হইতে দেখা যায় বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহার অস্তিত্ব বড় একটা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কারণ প্রাচীন বটগাছগুলির পক্ষ হইতে যেমন তাহাদের সাক্ষ্যের কথা জানাইয়া দিবার জন্য কোনও উদ্যোগ একেবারেই দেখা যায় না, তেমনি আকাশের চিরকালের পুরাতন চাঁদটীও এ প্রকারের প্রতিজ্ঞা-বিনিময় এতই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, তিনিও একেবারেই নির্ব্বাক্ থাকিয়া তাঁহার নিজের হ্রাসবৃদ্ধির চিরন্তন পরীক্ষাগুলির মধ্য দিয়া নিজেকে টানিয়া নিয়া যাইতেই ব্যস্ত থাকিয়া যান, এসব কথা স্মরণ করাইয়া দিবার এতটুকু লক্ষণও আর দেখান না।

সুতরাং সাক্ষীদের এই বিশ্বাসঘাতকতায়ই ও-ব্যাপারটা যদি একেবারেই তলাইয়া যায়, তাহাতে উভয় পক্ষের কাহাকেই দোষ দেওয়া চলে না।

কিন্তু এই শশাঙ্কশেখর মুখুয্যে ও চন্দ্রচূড় বাঁড়ুয্যে কোনও দিনই এ সব প্রতিজ্ঞা-বিনিময়ও করেন নাই এবং তাঁহারা উভয়ে উভয়ের প্রতি কতটুকু প্রীতি পোষণ করেন, তাহাও মুখ ফুটিয়া বলিতে চাহেন নাই।

তাই একটা অচ্ছেদ্য প্রীতির সম্বন্ধ ভিতরে ভিতরে বাড়িয়া উঠিয়া যখন উভয়কে পারিবারিক জীবনের কাছটীতে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল, তখন এই দুই পরিবারের নবাগতেরাও জানিল যে, এই প্রীতির ফল্গুধারাটী চিরন্তন সত্যরূপে কখন একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

বধূরূপে ক্ষমাসুন্দরী যখন এই পরিবারে আসিলেন, তাহার ঠিক দুই সপ্তাহ পূর্ব্বেই চন্দ্রচূড়ের মাতাঠাকুরাণীও বিরজাসুন্দরীকে বরণ করিয়া ঘরে তুলিলেন।

বিরজাসুন্দরী অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যশালিনী বলিয়া খ্যাতি লাভ না করিতে পারিলেও, শিল্পে, চিত্রে, রন্ধনে, গৃহকর্ম্মে তুলনারহিত ছিলেন। চুল বাঁধিতে, টিপ্ কাটিতে, আলিপনা দিতে পার্শ্ববর্ত্তী দশখানা গ্রামের মধ্যে কোনও বধূই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। গ্রামের কোনও বাড়ীতে ক্রিয়া কর্ম্ম উপস্থিত হইলে বিরজাসুন্দরীকে রন্ধনের জন্য আদর করিয়া লইয়া যাইত। পাঁচসাত শত লোকের উপযুক্ত আহার্য্য প্রস্তুত শেষ করিয়া দিয়া যখন দিনান্তে এই বধূটী বাড়ী ফিরিয়া আসিত, তখন উপস্থিত সকলেরই প্রশংসাগুঞ্জন শুনিয়া শুনিয়া অবগুণ্ঠনের অন্তরালে তাহার মুখখানি লজ্জায় রঙ্গিন্ হইয়া উঠিত এবং পুত্রবতীরা এমনি একটী বধূ পাইবার কামনা দেবতার পায়ে জানাইয়া রাখিতেও ভুলিতেন না।

অল্প দিন পূর্ব্বেও পল্লীবধূরা এমনি প্রশংসা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। প্রবীণারা এইরূপ বধূকন্যাই কামনা করিতেন!

তখন দেশে স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্য ছিল; দেশের লোকের বুক ভরা আশা ছিল, আনন্দ ছিল। ক্ষেতের সোণার ধানে প্রাঙ্গণ ভরিয়া উঠিত; গোশালায় দুগ্ধবতী গাভীর অভাব ছিল না; পুকুরে প্রচুর মৎস্য ছিল।

বাগানের ফুলে, ফলে, তরকারীতে নিত্য সাজি ভরিয়া উঠিত! মনে সুখ ছিল, আত্মীয়কে দেখিলে প্রীতি উচ্ছ্বসিত হইত; অতিথি পাইলে গৃহস্থ কৃতার্থ হইত।

সিংহাসনে গৃহদেবতা শালগ্রাম ছিলেন; তুলসীমঞ্চ ছিল। প্রতি সন্ধ্যায় ঠাকুরদালানে, তুলসীগাছের তলায় বধূরা প্রদীপ জ্বালিত; গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিতে জানিত, এবং মনে মনে গৃহের কল্যাণ কামনা করিয়া এই দীপশিখাটীকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রার্থনা জানাইয়া, লজ্জানত দুইচক্ষুর দৃষ্টি আনন্দ দীপ্তিতে ভরিয়া তুলিত।

ছেলেগুলির "দস্যিপণায়" গ্রাম জ্বালাতন হইত। তাহারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলে ডুবিত, সাঁতার কাটিত; পেয়ারা কুল কাঁচা আমের যম ছিল। বর্ষায় নালা কাটিয়া মাছ ধরিত; রৌদ্রে বৃষ্টিতে শরীরটাকে লৌহবৎ করিয়া গড়িয়া তুলিত। কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠদের দেখিলে পলাইতে পথ পাইত না।

যুবকেরা প্রাণ ভরিয়া উচ্চরোলে হাসিতে পারিত; গান বাজনার আখ্‌ড়া বসাইত; মোটা লাঠি হাতে করিতে জানিত; মুগুর ভাঁজিত, তীর ছুঁড়িত; বাজি রাখিয়া আধখানা পাঁঠার মাংস খাইয়া ফেলিত; একটা কাঁঠাল হজম করিতে পারিত!

প্রবীণেরা চণ্ডীমণ্ডপে আস্তৃত ফরাসের উপর বসিয়া বসিয়া রামায়ণ মহাভারতের চির নবীন রসভাণ্ডারের মধ্যে 'মস্‌গুল্‌' হইয়া থাকিতে জানিতেন! আপদে, বিপদে পড়্‌শীর বাড়ীতে বুক দিয়া পড়িতেন; সমবেদনা জানাইতেন; দায়ে পড়িলে উদ্ধার করিতেন।

—কিন্তু কোথায় গেল বাঙ্গালার এই সোণার পল্লী?—এ আনন্দ-মুখর পল্লীর গৃহে গৃহে কে এ নিরানন্দের বাঁশী বাজাইল?

এ রাজপুরী কাহার নিষ্ঠুর মায়ার কাঠিটীর দারুণ স্পর্শে এমন করিয়া নিঝুম্, নিস্তব্ধ হইয়া গেল ?

গোশালায় গাভী নাই; সিংহাসনে শালগ্রাম নাই; তুলসীমঞ্চ লোপ পাইয়াছে; সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বলে না; মঙ্গল শঙ্খ আর বাজে না; সন্ধ্যারতি আর হয় না।

নির্ম্মম ফুৎকারে কে হৃদয়হীন বাঙ্গালার পল্লীর প্রদীপটী নিভাইয়া দিল ?—দেবতার দেউল অন্ধকার করিয়া দিল ?—বাঙ্গালার বেণুবন, নীপকুঞ্জ, মাধবীমূল, মধুমালঞ্চ শ্রীহীন করিয়া দিল ?

ওরে, কোথায় গেল, দোয়েল-শ্যামাকোয়েল মুখরিত বাঙ্গালার সোণার পল্লী ?—কোথায় গেল ?

শৈলেশের অন্নারম্ভের দিনও বিরজাসুন্দরী পাকশালার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। দিনান্তের অবসরের পর এই কর্ম্মনিরতা বধূটী যখন ক্ষমাসুন্দরীর ঘরে আসিয়া মুখের অবগুণ্ঠন ফেলিয়া হাঁপ ছাড়িল, তখন ক্ষমাসুন্দরীও পিছনে পিছনে ঘরে আসিয়া কহিল, "ইস্, মুখখানা একেবারে রাঙ্গা হয়ে গেছে যে। এত বড় দিনটা কেটে গেছে,—মুখে জল-ফোঁটা পড়েনি; তার পর সেই শেষ রাত্রি থেকে এ পর্য্যন্ত আগুনের কাছে রয়েছ !—ধন্যি মেয়ে তুমি !—"

বিরজা মৃদু হাসিয়া কহিল, "তুমিই কি কম, ঠাকরুন্ ?"—তারপরই ক্ষমাসুন্দরীর বাম কপোলের উপর একটা আঙ্গুলের একটু স্পর্শ দিয়া স্মিতমুখেই কহিল, "তোর ছেলের অন্নপ্রাশনের রান্না রাঁধ্‌ব বহুদিনের সাধ ছিল; আজ যখন বাড়ী থেকে বের হই, ঠাকুরের কাছে ভোগ মানত করে এসেছিলাম।"

দুই হাতে বিরজার মুখ তুলিয়া ধরিয়া ক্ষমাসুন্দরী কহিল, "ওরে, এ সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণার আর ভোগ মানত করা দরকার হয় না !"

বিরজা কহিল, "ঠাকুর দেবতারা যদি ভাল করে না দেন, তা' হ'লে কি ভাল হবার যো আছে রে। ও আমি দেখেচি, যেদিন নিজের উপর নির্ভর কর্‌তে যাই, সেদিন আর কিছুই স্থবিধে করে উঠ্‌তে পারিনে!"

—"তা' কি আমি জানিনে রে! ওরে, তোর উপর যে ঠাকুর দেবতাদের যথেষ্ট অনুগ্রহ রয়েচে!"—বলিয়াই ক্ষমাসুন্দরী তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

—"তা' তুই অত হাস্‌চিস্ কেন লা?"—

"হাস্‌চি যে কেন, তা' তোকে বল্‌ব!"—

—"কি?"—

"দেখ্ অনেক দিন থেকে একটা কথা ভাব্‌চি," বলিয়াই একটু এদিক ওদিক চাহিয়া গলার স্বর খাটো করিয়া কহিল, "তোর যদি মেয়ে হয়, তা' হলে সে মেয়েটীকে আমাকে দিবি?"

বিরজা সুন্দরীর মুখ এবার সত্যই লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল, ক্ষমা-সুন্দরীকে একটু ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "দূর, কি যে বলিস্,"—

কিন্তু যে কথাটা তুলিয়াছে, সে সহজে ছাড়িবার পাত্রী নহে।

সুতরাং ক্ষমাসুন্দরী কহিল, "তোদের রক্ত আমাদের এ সংসারে আন্‌ব, এর চেয়ে বড় সাধ আমার আর কিছু নেই, তাই ও যখন পেটে এল,"—বলিয়াই একটু মৃদু হাসিয়া সখীর মুখের উপর লজ্জাজড়িত চকিত দৃষ্টি বুলাইয়া লইতেই দেখিল, বিরজার মুখ হাসির ছটায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে!

"খুব বেহায়া ভাব্‌ছিস্ বুঝি? তা' হ'লামই বা তোর কাছে একটু বেহায়া! তারপর যা' বল্‌ছিলাম, ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জাল্‌তে যেয়ে কত ক'রেই মাথা খুঁড়ে জানিয়েচি, যে, প্রথম ছেলেই যেন,

আসে। এবং সে ছেলে, তোর মেয়ে হলে, তার সঙ্গে যেন বিয়ে দিতে পারি।” বলিয়াই ক্ষমাসুন্দরী বিরজার মুখের দিকে চাহিল।

বিরজার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, সে জোর করিয়া হাসিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, “এই ছাঁচে যাকে বিধাতাপুরুষ গড়ে তুল্‌বেন সে সুন্দরী হবে না ত!—তাই তার এত সৌভাগ্য কল্পনা করতেও আমার কিন্তু সাহস হচ্ছে না, ক্ষমা!”

ক্ষমাসুন্দরী দুই হাতে বিরজাসুন্দরীর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া কহিল, “তোর চেয়ে সুন্দরী কে, বিরু? তোর ছাঁচে ঢালা মেয়েটিকে যদি আমার ছেলে পায়, তার চেয়ে বড় কামনা আমি আর কিছুই কর্‌ব না।”

দুই সখীর নিভৃত আলাপ শেষ হইলে ক্ষমাসুন্দরী বিরজার কানের কাছে মুখ নিয়া কহিল, “তা’ হ’লে তুই আমার বেয়ান্ হলি আজ থেকে, বিরু?”

বিরজা মৃদু হাসিয়া কহিল, “গাছে না উঠ্‌তেই কাঁদি! আচ্ছা, মনে থাকে যেন, বেয়ান্ ঠাক্‌রুণ্!”

ক্ষমাসুন্দরী পরম গম্ভীর মুখে কহিল, “কিন্তু বৌভাতের দিন্‌কার রান্নার কি হবে?”—

“আচ্ছা, সে দেখা যাবে।” দুই সখীর মুখের উপর দিয়া একটী অনাবিল হাসির প্রবাহ বহিয়া গেল।

তার পর কয়েক বৎসরের মধ্যে অবস্থার কত পরিবর্ত্তনই ঘটিয়া গেল। দুই পরিবারের প্রবীণ প্রবীণারা একে একে স্বর্গারোহণ করিলেন। যাঁহারা একদিন নবীন নবীনা ছিলেন তাঁহারা সংসারের ভার গ্রহণ করিলেন। আর তাহাদের স্থানে এমন আর একদল তরুণ তরুণী দেখা দিল, যাহাদের জীবনের দিনগুলি অন্তহীন বিচিত্রতায় রঙ্গিন হইয়া উঠিতেছিল!—

"চিরদিন কখনও সমান না যায়," এই অত্যন্ত খাঁটি কথাটা যাঁহার মুখ দিয়া প্রথম বাহির হইয়াছিল, তিনি যে কত বড় একটা সত্যের প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহা সম্যক্ বোধ হয় তিনিও তখন জানিতেন না।

প্রতিমার জন্মের প্রায় চৌদ্দ বৎসর পরে একদিন ভোরের দিকে কেহ আসিয়া জানাইয়া গেল চন্দ্রচূড়ের শারীরিক অবস্থা ভাল নহে, শশাঙ্কশেখরকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।

শশাঙ্ক যাইতেই চন্দ্রচূড় শয্যার উপর একবার উঠিয়া বসিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিলেন।

শশাঙ্ক উদ্বেগপূর্ণ মুখে কহিলেন, "থাক্‌না, শুয়েই কথা বল, শরীরটা হঠাৎ এমন হয়ে পড়্‌বার কারণ কি ?"

চন্দ্রচূড় হাসিয়া কহিলেন, "ওর আর কারণ কিছু নেই, ভাই! কিছু আগেই যেতে হ'ল, তা' বেশ্‌তো—অজানা যায়গা, একটু আগে গিয়ে সব দেখে শুনে গুছিয়ে রাখা যাবে"—

"কি যে বল,"—তার পর একটু হাসিয়া কহিলেন, "ঘরসংসার পাতাবার মত যায়গাই যদি হয়, কর্ত্তারা সব আগে গিয়েছেন এবং তাঁরাই সব ঠিক্ করে নিশ্চয়ই রেখেচেন; ওর জন্য তোমার যাবার তাড়া কিছু নেই তো!" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গম্ভীর মুখে কহিলেন, "রহস্য যাক্,—ব্যাপারটা কি বল ত ?—শরীরটা খুব খারাপ মনে হচ্ছে কি ?"

"কাল রাত থেকেই শরীরটা ভাল নেই; যে প্রথম আক্রমণেই এমন অবস্থা করে তুলেচে, সে যে আমাকে এতদিন পরে এ দেহটার অধিকার থেকে বেদখল কর্‌বেই, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ রাখিনে" বলিয়াই চন্দ্রচূড় হাসিলেন।

কিন্তু তাঁহার হাসি দেখিয়াও বেশ বুঝা গেল শরীর কতখানি কাতর হইয়াছে।

শশাঙ্কশেখর ভিতরে ভিতরে শিহরিয়া উঠিলেও জোর করিয়াই কহিলেন, "ও কিছু না, ওষুধ খাও, ভাল হয়ে যাবে" বলিয়াই তিনি কবিরাজ ডাকিতে লোক পাঠাইয়া দিলেন।

"সেরে উঠি ভালই তো! তবু কয়টা কাজের কথা তোমাকে বলে রাখি, কি জানি, যদি শেষে সময় না পাই।"

দুই জনের কথা শেষ করিতে বেশী সময় লাগিল না। গৃহ দেবতার সেবার ব্যবস্থার কথা হওয়ার পর, যে সম্পত্তিটুকু ছিল তাহার কথা উঠিতেই চন্দ্রচূড় তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন—

"এই দেখ, মানুষের হিসাবেরও যেমন শেষ নাই, ভুলেরও তেমনি অন্ত নেই; যাবার সময়ও কি এই চিরদিনের অভ্যাস ছাড়তে পারে! যাক্ ওসব থাকুক ও নিয়ে আলোচনা করে আজ আর মনটাকে অপ্রসন্ন করে তুলতে চাইনে! যতক্ষণ আছি, এখান থেকে তুমি আর যেতে পাচ্ছ না, শশাঙ্ক! ওরে প্রতিমা তোর কাকা বাবুর পূজো আহ্নিকের ব্যবস্থা করে রাখিস্ মা! কই, এদিকে এসে প্রণাম তো করে গেলিনে পাগলি!"

অশ্রুমুখী প্রতিমা আসিয়া শশাঙ্ককে প্রণাম করিতেই তিনি তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া আনিয়া পরম স্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিলেন—

"লক্ষ্মী মা আমার, তোমার মা ঠাকরুণের মতই হও; এর চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ আর আমি কিছুই জানিনে।" বলিয়াই কিছুক্ষণ একেবারেই চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে কহিলেন, "কিন্তু আজ একটা কথা তোমার বাবার সামনেই তোমাকে

জানিয়ে যাচ্ছি মা! তোমার জন্মের বহুপূর্ব্বেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল, লক্ষ্মী, যে তুমি তোমার মা ঠাকরুণের সকল গুণের সম্পদ নিয়ে তোমার এই কাকাবাবুটীর ঘরেই চিরদিনের লক্ষ্মীটি হয়ে রইবে! আজ তোমার বাবার শরীরের এই অবস্থা দেখে আমার মনে হচ্ছে, হয়তো আমারও আর বেশী দিন নেই; কারণ জ্ঞান হয়ে অবধি তো ওঁকে ছেড়ে একদিনও থাকিনি মা! তাই আজ তোমাকে এ খবরটা জানিয়ে রাখলাম!"—

তারপর চন্দ্রচূড়ের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "শৈলেশের জন্ম কোষ্ঠীতে উনিশ বছরটা ভারি খারাপ ছিল, তাই একথা এতদিন তুলিনি চন্দ্রচূড়! এখন তা কেটে গেছে"—

প্রতিমার হঠাৎ মনে হইল; সে যেন একটা নূতন আলোকের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; তাহার জন্মের বহুপূর্ব্ব হইতেই যে কথাটা একেবারে পাকা হইয়া রহিয়াছে তাহার বিরুদ্ধে যেন কাহারও কিছু বলিবারই থাকিতে পারে না। যে শৈলেশকে সে এতদিন বড় ভাইয়ের মতই দেখিয়া আসিয়াছে এবং সেই এতটুকু বয়স হইতে এ পর্য্যন্ত ছোট বড় নানা আব্দারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে তাহাব সঙ্গে সম্পর্কটাকে এতই নিবিড় করিয়া অনেক পূর্ব্ব হইতেই গড়িয়া রাখা হইয়াছে অথচ তাহারা কেহই একথাটার বিন্দুবিসর্গও জানিত না, ইহা মনে করিয়া তাহার মুখ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল!

ঘরের কাছের যে মাটীর স্তূপটা চিরদিনের পরিচয়ের ভিতর দিয়া নিতান্তই নিত্যকার হইয়া রহিয়াছে এবং যাহার দিকে লক্ষ্য রাখিবার কোনও দরকারই হয় নাই, তুচ্ছ প্রয়োজনে সে স্তূপটাকে কাটিয়া ফেলিতে যাইয়া যদি কেহ গুপ্ত ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পাইয়া বসে তাহা হইলে তাহার মনের অবস্থাটা যেমন হওয়া সম্ভব, প্রতিমারও বোধ হয় তেমনই একটা অবস্থা হইয়া উঠিয়াছিল।

সরে ফেলি,—

প্রতিমার লজ্জাবনত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া শশাঙ্কশে
দিকে চাহিয়া কহিলেন "তোমার বৌঠাকরুণ যে একে এর জ... কহিলেন,
চেয়ে নিয়েছিলেন সে খবরটা ওর মা নিশ্চয় তোমাকে বলেচেন, বলি,
আবার ওকে আমি তোমার কাছ থেকে চেয়ে নিচ্ছি। এরপর ...
হিসেব নিকেশ মিটাতে আমিই বা ক'দিন সময় পাব তাওত জানা নেই। কিন্তু আমাদের দুঃখ করবারও তো কিছু নেই; সাংসারিক সুখ যাকে বলে তা ত ঠাকুর আমাদের একটুও কম করে দেন নি, চন্দ্রচূড় !"

অশ্রুসজল দুই চোখের দৃষ্টি এতক্ষণ শশাঙ্কশেখরের মুখের উপর স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন ধীরে ধীরে গাঢ় স্বরে কহিলেন, "এত আনন্দের মধ্যেও একটা দুঃখ হচ্ছে শশাঙ্ক, ওর মা কি আমার চেয়েও তোমাকে বেশী করে চিন্‌ল ? প্রতিমার বিয়ের কথা তুল্‌তেই সে বরাবরই বলে এসেচে, 'জন্মের আগেই, ও যার হাতে পড়বে, তা' ঠিক হয়ে রয়েচে ! ওর জন্যে তোমার ছেলে খুজতে হবে না,'—কিন্তু আমি যে একথা কোন দিনই তোমাকে মনে করে দিতে পার্‌ব না, তা' যখনই বলেছি, তখনি ও হেসে বলেচে, 'ওগো, তা' তোমাকে জানাতে হবে না, ও তিনি সময় হলে নিজেই বল্‌বেন।' ওরে, মানুষের দর্প এম্‌নি করেই ঠাকুর চূর্ণ করে দেন ; একটা তুচ্ছ বিষয়ের এতটুকু দর্প, তাও তিনি সইতে পারেন না ! গর্ব্ব ছিল, আমি তোমাকে যতখানি চিনেছি, এমন আর কেউ চেনে নি' ; কিন্তু আজ যাবার আগেই ঠাকুর আমাকে এম্‌নি করেই জানিয়ে দিলেন যে, এতেও আমি নিজের ঘরের লোকের কাছেই হেরে গেছি।"

বিরজাসুন্দরী কবাটের আড়ালে বসিয়া কথা শুনিতেছিলেন ; এখন চোখের জল মুছিতে মুছিতে উঠিয়া যাইতেছিলেন, চন্দ্রচূড় সেই দিকে

জানিয়ে যাচ্ছিলন, "আজ্ আর লজ্জা কর্‌বার তোমার কিছু নেই, লক্ষ্মী, যে াক। মেয়েকে এতদিন আগ্‌লে রেখেছ, ওঁর সম্পত্তি উনি এই কনলেন; ছেলেটা আর তুমি; তা ঠাকুর রয়েছেন, শশাঙ্কও যে ক'দিন থাকে!"

চোখে অশ্রুর আভাষ, বুকের মধ্যে একটা অজানিত কম্পন লইয়া প্রতিমা উঠিয়া যাইতেই চন্দ্রচূড় তাহার গমন পথের দিকে স্নেহস্রাবী দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া, একটা পরম নিশ্চিন্ততার নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "যা' একটু অপূর্ণ ছিল, তা'ও আজ মিটে গেল! সারা-জীবন ভরেই তো তোমার অসীম করুণা অনুভব করে কৃতার্থ হয়ে গেছি, ঠাকুর!"—

এর পরই যেন অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এমনি ভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

তৃতীয়দিন পবিত্র ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তেই চন্দ্রচূড়ের অবিনশ্বর আত্মা স্বর্গগত হইল।

প্রায় এক বৎসর পরে একদিন ভোরের দিকে শশাঙ্কশেখর ক্ষমা-সুন্দরীর পূজার ঘরের কাছে দাঁড়াইয়া একটু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "জানইতো গিন্নি শ্রীকৃষ্ণ চলে গেলে অর্জ্জুন আর গাণ্ডীব ধর্‌তে পারেন নি;—কাজ করবার শক্তি একেবারেই হারিয়ে ফেলেছিলেন।"—

ক্ষমাসুন্দরী দুয়ারের কাছে আসিয়া উদ্বিগ্নমুখে কহিলেন, "আজ শরীর কি খুব বেশী খারাপ হয়েচে? এত ভোরেই স্নান করে এলে!"—উদ্বেগে আশঙ্কায় ক্ষমাসুন্দরীর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

শশাঙ্কশেখর হাসিয়া কহিলেন, "মুখের চেহারা অমন করে তুল্‌লে কেন? ভয় নেই কিছু, তবে হিসেবগুলি যত শীঘ্র মিটিয়ে ফেলা যায়

সেই ভাল নয় কি ?—২৯ এ ভাল দিন আছে, কাজটা সেরে ফেলি,—কি বল ?”—

ক্ষমাসুন্দরী স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বিবর্ণ মুখে কহিলেন, “কিছুই বলিনে, কি আর বল্‌ব ! একটু সাবধানে থাক্‌তে এত বলি, তা’ তো শুন্‌বে না, এমন করে শরীর আর ক’দিন বইবে ?”—

শশাঙ্ক ক্ষমাসুন্দরীর মুখের দিকে ক্লান্ত দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়া একটু হাসিলেন এবং কোনও কথা না বলিয়া বৈঠকখানা ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

ক্ষমাসুন্দরী দুই হাতে দুয়ারের কাঠটা চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন, যেন কত অবসাদ ও ক্লান্তি আসিয়াছে, এমনিভাবে স্বামী হাঁটিয়া চলিয়া গেলেন !

দুই চক্ষু ভরিয়া জল আসিতেছিল। আঁচলে চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া কম্পিত বক্ষে পূজার আসনের উপর যাইয়া বিহ্বলের মতই অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন।

ঠিক সেইদিন হইতে শশাঙ্কশেখরকে সমস্ত হিসাব নিকাশ লইয়া ব্যতিব্যস্ত দেখা গেল। নিজেকে আর এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম না দিয়া ছোট বড় সমস্ত কাজগুলিই মিটাইয়া ফেলিলেন। এবং তাহারই ফলে, শৈলেশের গোপন অশ্রু ও নিষ্ফল অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও একদিন বৈশাখী সন্ধ্যায় প্রতিমা বধূরূপে আসিয়া এ বাড়ীতে দেখা দিল।

এ ঘর তাহার চিরদিনের আপনার ঘরের মতই ছিল ; তবুও আজ প্রথম বধূজীবনের রঙ্গিন্ আলোকের মধ্যে, নবীন আশায় কম্পিত হৃদয় লইয়া এখানে পা দিয়াই বুঝিতে একটুও বিলম্ব হইল না, যে, স্বামীর অন্তরে তাহার জন্য বিরাগ ও অপ্রীতিই পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে।—এতটুকু প্রীতিও নাই, এতটুকু আদর, সোহাগও নাই।

যাহার অন্তর নবনীত-কোমল বলিয়াই এতকাল সে জানিত, অদৃষ্টদোষে আজ তাহাই তুষার-শীতল প্রস্তরখণ্ডে পরিণত হইয়াছে!

—কিন্তু কেন এমনটা হইল?—কেন এমন হয়?—

প্রীতির রাজ্য জয় করিতে আসিয়া কেন সে এমন নিষ্ঠুর বাধা পাইল?

এই বাড়ীটার প্রত্যেকেই যখন তাহাকে স্নেহের বন্যায় প্লাবিত করিয়া দিল, তখন সে শুধু এমন এক জনেরই প্রীতিতে বঞ্চিত রহিয়া গেল, যাহার কাছে তাহার সমস্ত আনন্দ ও উৎসবের সোনার কাঠিটি লুকানো রহিয়াছে!

শুধু একটী মাত্র স্পর্শ দিয়াই তো সে তাহার সাজানো মালঞ্চ মুঞ্জরিত করিয়া তুলিতে পারিত,—ফলে পুষ্পে সুশোভিত করিয়া দিতে পারিত!

কিন্তু ওরে, সে তো নিষ্ঠুর, অকরুণই রহিয়া গেল!—

সেদিন কি একটা পর্ব্বোপলক্ষে আফিসে ছুটি ছিল বলিয়া অশ্রুময় বাড়ীতেই আছে।

ছুটির দিনের সকালবেলাটায় একটা নিশ্চিন্ত আলস্যে সে যখন কল্যাণীর সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিয়াছিল, ঠিক তখনি মা আসিয়া কহিলেন, "ওরে অশ্রু, নরেশ এসে তোকে ডেকে গেল যে! খুব ব্যস্ত দেখ্‌লাম তাকে; ওই ভট্‌চায্‌দের বাড়ীর দিকে গেল,—তুই যা' না, একবারটি খোঁজ নিয়ে আয়।"

অশ্রুময় মার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "তোমার নরেশের ব্যস্ত হওয়া, মা, ও তো চব্বিশঘণ্টা সমান ভাবেই রয়েছে! বোধ হয় ভট্‌চায্‌দের বাড়ীতে কারু অসুখ বিসুখ কিছু হবে, তাই ও ছুটোছুটি কর্‌চে!"

হাতের আলুটার খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে কল্যাণী একটু মুখ নীচু করিয়া লইল। তাহার মুখখানি একটা অতর্কিত হাসির সুষমায় মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

মানদাসুন্দরী কহিলেন,—"তা' হবে,—কত ছেলেই তো দেখি, কিন্তু পরের জন্য গলাজলে নাম্‌তে ওর মত আর কাউকেই দেখিনি!"

"সত্যি মা, ও যে এতগুলি পাশ দিয়েছে, তা' ওকে দেখ্‌লে বুঝ্‌বার উপায় নেই। আমাদের ঘরের মাঝে ওকে যখন দেখি, তখন বাইরে ও যে দিগ্বিজয়ী, সে কথাটা মা, একেবারেই ভুলে যাই,"—বলিয়াই অশ্রুময় হঠাৎ কল্যাণীর দিকে চাহিয়াই বলিয়া উঠিল, "ইঃ করিচিস্‌ কিরে, আঙ্গুলটা একেবারে কেটে ফেলেচিস্‌!"—

কল্যাণীর হাত টানিয়া লইতেই সে হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "কই, এমন বেশী কাটেনি ত !"

—"আর কি আঙ্গুলটা দুভাগ হয়ে যাবেরে ? ইস্, রক্তে ভেসে গেল যে !"—

মানদাসুন্দরী একটা বাটীর মধ্যে খানিকটা জল গড়াইয়া দিয়া কহিলেন, "জলের মধ্যে আঙ্গুলটা ধর,—আমি ন্যাকড়া নিয়ে আসি।"

তিনি পিছন ফিরিতেই নরেশ দুয়ার ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে কহিল, "আমি পি, আর, এস্, পেয়েচি, কাকী মা,"—তারপর হঠাৎ কল্যাণীর দিকে দৃষ্টি পড়িতেই বলিয়া উঠিল, "ইঃ, কেমন করে কাট্‌ল ?" এবং একটুও দ্বিধা না করিয়া কল্যাণীর সম্মুখে যাইয়া বসিয়া পড়িয়া তাহার হাতটা দুই হাতে তুলিয়া লইয়া কহিল, "হাঁ তবেই হয়েচে ! অম্‌নি করে জলের মধ্যে চেপে ধর্‌লেই বুঝি রক্ত পড়া বন্ধ হবে,"—বলিয়াই অশ্রুময়কে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "আর অত বড় অপদার্থও তুই হয়েছিস্ যা' ও ঘরে তাকের উপর একটা শিশি রয়েচে, সেইটে নিয়ে আয় !"—

অশ্রুময় হাসিয়া কহিল, "নে, অপদার্থ তুইও কম 'ন'স্ ; এতবড় একটা খবর দিয়েও তো মাকে প্রণাম না করেই তুই আগেই এসে কল্যাণীর হাত ধর্‌লি !"—

এই কথাটার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যাহার অর্থ, কথাটা যে বলিল, মোটেই না বুঝিলেও কল্যাণী একেবারেই ঘামিয়া উঠিল ; এবং অত্যন্ত নীচু হইয়া পড়িয়া, হাতখানা টানিয়া লইবার জন্য একটু আকর্ষণ করিল। কিন্তু নরেশের কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙ্গা হইয়া উঠিলেও, সে কল্যাণীর কাটা জায়গাটা খুব জোরে টিপিয়া ধরিয়াই অত্যন্ত সহজকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওরে রক্তটা একবার বেরিয়ে এলে আর ফেরানো যাবে কি ?

কাকিমা তো রয়েছেনই, এর পর না হয় হাজার বার প্রণাম করে ত্রুটী সেরে নেব,”—বলিয়াই নরেশ জোর করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মানদাসুন্দরী হাসিমুখে কহিলেন, “না বাবা, তুমি আজ যে খবরটা এনেচ, তা’ জানিয়ে দিয়েই তোমার কাকিমাকে প্রণাম করা হয়ে গেছে! ধর্ম্মে তোমার মতি অক্ষয়, অটল হোক্, এবং চিরজীবী হয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল কর, এই প্রার্থনাই ভগবানের কাছে যেমন চির দিন জানিয়েচি, আজও ঠিক্ তেমনি জানিয়ে রাখ্‌লাম!”

নরেশের অত্যন্ত বলিষ্ঠ হাত দুইটার মধ্যে কল্যাণীর কোমল উত্তপ্ত হাতখানি স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এখন অশ্রুময় শিশিটা আনিতেই ঔষধ লাগাইয়া পটী বাঁধা শেষ করিয়া দিয়া নরেশ উঠিয়া আসিয়া কাকিমাকে প্রণাম করিল!

দুই হাতে মাথাটা বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিলেন, “আজ যে তোর মা নেই, সেই কথাটাই কেবল মনে পড়ছে, নরু।”

এইটুকু বলিতেই দুই চোখ্ জলে ভরিয়া উঠিল, কিছুক্ষণ একেবারেই চুপ করিয়া থাকিয়া গাঢ়স্বরে কহিলেন, “তা’ সে স্বর্গে থেকেও যে তোর মাথায় আশীষ ঢেলে দিচ্ছে, এতে আমার সন্দেহ মোটেই নেই, বাবা!”

নরেশের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল; সে দুই হাতে মানদা-সুন্দরীর পায়ের ধূলা লইয়া কহিল, “আর যাই হোক্ কাকিমা, তোমার স্বরের মধ্যে চিরদিনই যেমন আমার মায়ের গলার স্বর শুনে আস্‌চি, আজও ঠিক তেম্‌নি করেই শুন্‌তে পাচ্ছি! আমি অনেক সময়ে ভেবে অবাক্ হয়ে যাই, যে মানুষের স্বরের মধ্যে এমন আশ্চর্য্য মিল কেমন করে হয়!”

অশ্রুময় কহিল, “এ কিন্তু বেশ্, মা, ও এল একটা সুখবর নিয়ে আর

তুমি নিজে তো কেঁদে ভাসালেই এবং সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখেও জল বের করে ছাড়্‌লে! ও চিরদিন সর্দ্দারি করে কাটাল, ঘা দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিলেও যার চোখ্‌ দিয়ে জল বেরোয় না, সে তোমার কাছে এলেই একেবারে কোলের ছেলেটী হয়ে যায়!—আর ওর ওই চোখ্‌ ছুটোর আগুনও নিভে যেয়ে পান্‌সে হয়ে ওঠে!"

মানদাসুন্দরী তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিয়া জোর করিয়া হাসিয়া কহিলেন, "অশ্রুময়ের মা ত আমি, তাই চোখে জলটা সহজেই এসে পড়ে। কিন্তু ওরে, ছেলে বাইরে যত বড় দুরন্তই হোক্‌, যত বড় দিগ্বিজয়ীই হোক্‌, ঘরে মা-খুড়ীর কাছে চিরদিনই কোলের ছেলেটীই থাকে রে, পাগল!—"

নরেশ কহিল, "তোমার যেমন বুদ্ধি, অশ্রু! ওরে, মানুষ বাহিরেই ছুটোছুটি করে, ক্ষমতা জাহির করে, কিন্তু তার মনটী পড়ে থাকে ঘরের দিকে, যেখানে তার সব ক্লান্তির বিশ্রাম স্থান রয়েচে, মায়ের অঙ্ক-স্বর্গে! ভাল করে জ্ঞান হবার পূর্ব্বেই তো এ স্বর্গে বঞ্চিত হয়েছিলাম, তবু কাকিমার কোলে ঠাঁই পেয়েই যে বেঁচে গেছি!—"

এর পর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকা মানদাসুন্দরীর পক্ষে একেবারেই কঠিন হইয়া উঠিল! অশ্রুপূর্ণ চোখে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইয়া পূজার ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

কল্যাণী কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই এ ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইয়া পাশের ঘরে একখানা খাটের উপর চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

নরেশের এ কথাগুলি যে কতখানি সত্য তাহা অশ্রুময় তো ভাল করিয়াই জানিত, তাই আর কোনও তর্কের মধ্যে না যাইয়া কহিল, "তা' তুই ভট্‌চায্‌দের বাড়ীর দিকে গিয়েছিলি কেন রে—এই খবর দিতে?"

নরেশ হাসিয়া কহিল, "তবেই হয়েচে! তুই তোর সওদাগরী আফিসের চাকরী ছেড়ে দেরে, অশ্রু! এমন পরিষ্কার মাথা আফিসের ঘানিতে দিয়ে একেবারে মাটিই করে তুলেচিস্ রে! এর পরে ইউনিভারর্সিটী তোর ডিগ্রি কেড়ে নেবে দেখ্‌চি!"

অশ্রুময় রাগের ভাণ করিয়া কহিল, "তোর সঙ্গে পারাই বাপু দায় হয়ে উঠ্‌ল যে," বলিয়াই দুই হাতে নরেশকে ঠেলিয়া দুয়ারের দিকে চলিয়া যাইতেই নরেশ হাত বাড়াইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া কহিল,—

"আচ্ছা খবরটা পেয়েই কাকিমার কাছে না এসে ভট্‌চায্‌ বাড়ী যাব, এটা তোর মাথায় কেন এল বল্‌তে পারিস্? অথচ একটু আগেই কাকিমার কাছে তোর কথা জিজ্ঞেস্ করে গেছি! আসল কথা কি জানিস্, ভট্‌চায্‌ বাড়ী একটা চাকরের অসুখ হয়েচে, তারি খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম ; ফির্‌বার পথে খবর পেয়েই এখানে চলে এসেছি।"

অশ্রুময় হাসিয়া কহিল, "যাক্, ভট্‌চায্‌দের বাড়ীতে তা' হলে তোর শীকার মিলে গেছে!"

পরম গম্ভীর মুখে নরেশ কহিল, "ছোট শীকার, ও আমার ছেলের দলই পার্‌বে। জানিস্ তো ওলা দেবীর আবির্ভাব না হলে আর ছেলের দল আমাকে রাত জাগ্‌তে দেয় না। 'পজিশন্' অনেকটা বেড়ে গেছে যে রে!"

নরেশ খানিকটা হাসিয়া লইল।

অশ্রুময়ও হাসিল।

নরেশ কহিল, "তবু চল্, সব ঠিক্ করে দিয়ে আসি,—বিনয়কে সব বুঝিয়ে দেব, সেই সব ঠিক করে নেবে। এই ছেলেটী বেশ তৈরি হয়েচে কিন্তু,"—

দুইজনে উঠানে পা' দিতেই পাকঘরের দুয়ারের কাছ হইতে মানদা-

সুন্দরী ডাকিয়া বলিলেন, "নরু, এখানেই তোর পাক হচ্ছে কিন্তু, শীগ্‌গির ফির্‌বি তো তোরা ?"

"এখুনি আস্‌ব ; খাওয়াটা যে এখানেই জুট্‌বে তা' আমি অনেক আগ্‌ থাকৃতেই বুঝে রেখেছিলাম, কাকিমা !" বলিয়া নরেশ অশ্রুময়ের হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

মানদাসুন্দরী স্নেহস্রাবী দৃষ্টিতে তাহাদের যাওয়ার পথের দিকে অনেক্ষণ চাহিয়া রহিলেন। চক্ষুর পাতা নিতান্ত অকারণেই কেন যে ভিজিয়া উঠিতেছিল, তাহা বুঝিতে আজ আর কোনও চেষ্টা করিলেন না, শুধু একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অন্যমনস্ক ভাবে কাজের মধ্যে ফিরিয়া গেলেন।

ঠিক্‌ সেই সময়েই আর একটী প্রাণী তাহার নিভৃত কক্ষের দুয়ারের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং কম্পিতবক্ষে সেই পথটার দিকেই মুগ্ধনেত্রে চাহিয়াছিল, যে পথ দিয়া এইমাত্র এমন একজন চলিয়া গেল, যাহাকে দূরে, কাছে কতবারই তো সে দেখিয়াছে, তবুও আজও একবার দূর হইতে এমনই করিয়া দেখিবার জন্য অন্তরটা ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল।

এমন একটা ইচ্ছা কেন হইল, তাহার কোনও কারণ সে খুঁজিয়া পাইল না বটে, কিন্তু তাহার বুকের মধ্যে যে অত্যন্ত কাঁপিতেছিল, লজ্জার সঙ্কোচ প্রতি পদক্ষেপে বাধা দিতেছিল, কাণের কাছটা অসম্ভব রকম উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল এবং দুই চক্ষুর স্নিগ্ধ দৃষ্টি চঞ্চল হইয়াছিল, তাহা সে সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া একবারেই বিস্মিত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে মানদাসুন্দরীর স্নেহতরলকণ্ঠস্বর শুনা গেল, 'কল্যাণি !"—

দুয়ারের কাছ হইতে দ্রুতপদে ঘরের ভিতরের দিকে সরিয়া যাইয়া কল্যাণী উত্তর দিল, "মা !"—

কিন্তু তাহার গলা একেবারেই শুকাইয়া গিয়াছিল, এবং দ্রুততর তালে বুকের শোণিত স্পন্দিত হইতেছিল।

একটু পরেই ঘর হইতে বাহির হইয়া মার কাছে যাইয়া দাঁড়াইল।

তখনও তাহার ললাটের স্বেদবিন্দুগুলি ও কপোলের রক্তিমাভা সম্পূর্ণ মিলাইয়া যায় নাই।

নরেশ যে এ বাড়ীর ছেলে নয়, তাহা বাহিরের কেহ হঠাৎ বুঝিতে পারিত না। ছেলেবেলা হইতেই সে এ বাড়ীতে আসা যাওয়া করিতেছে, মার মৃত্যুর পর হইতে দিনরাতের বেশীর ভাগই এ বাড়ীতে কাটাইয়াছে। মানদাসুন্দরীর কাছে সে এমন একটী স্নেহ প্রস্রবণের সন্ধান পাইয়াছিল, যাহা তাহাকে মায়ের কথাই মনে করাইয়া দিত! এবং তাহার মাতৃহীন বালক অন্তরের ক্ষুধা মিটাইবার উপকরণ যথেষ্ট পরিমাণেই যে তাঁহার বুকের মধ্যে সঞ্চিত রহিয়াছে, সে খবরটীও নরেশের কাছে নিঃসন্দেহ পৌছিয়া গিয়াছিল।

এই কল্যাণী যখন ছোটটী ছিল, এবং নরেশ যখন গ্রামের স্কুলের ছাত্র ছিল, তখন এই ক্ষুদ্র বীরই কল্যাণীর সকল প্রকারের আব্দার রক্ষা করিবার ভার সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিল। পেয়ারা, কালো জাম, কাঁচা আম সংগ্রহ করা, দীঘির জল হইতে পদ্মফুল তুলিয়া আনা, বকুল ফুলের মালা গাঁথিয়া খোঁপায় পরাইয়া দেওয়া, সময়ে অসময়ে আম-গাছে চড়িয়া পাখীর বাচ্চা পাড়িয়া আনিয়া পোষমানাইবার বৃথা চেষ্টা করা প্রভৃতি ছোটখাটো কাজের অন্ত তো ছিলই না, তা' ছাড়া কল্যাণীকে লেখাপড়া শিখাইবার ভারটাও সেই গ্রহণ করিয়াছিল।

কল্যাণী যখন কিছুতেই পড়িতে চাহিত না, এবং যখন নরেশের ভয়ে একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে বইয়ের পাতার অর্থশূন্য অক্ষরগুলি তাহার চোখের সম্মুখে সারিবাঁধা কালো পিপ্‌ড়ার মতই নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইত, তখন এই অত্যন্ত অমনোযোগী ক্ষুদ্র মেয়েটীর সুবৃহৎ খোঁপাটা ধরিয়া সবলে নাড়িয়া দিতেও সে ছাড়িত না।

কিন্তু এই দুর্দ্দান্ত ছেলেটাকে জব্দ রাখিবার শুধু দুইটা লোকই সংসারে ছিল, একজন মানদাসুন্দরী ও অন্যজন কল্যাণী!

মানদাসুন্দরীর কাছে শ্রীমান্ নরেশ চিরদিনই কোলের ছেলেটা রহিয়া গেল। এবং বাল্যে ও কৈশোরে তাহার দুর্দ্দান্তপ্রতাপমধ্যেও কল্যাণী যখনই প্রকাণ্ড কাল চোখ দুইটার অদ্ভুত দৃষ্টি তাহার মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়াছে, তখনই মুহূর্ত্তের মধ্যে সে একেবারেই শান্ত হইয়া গিয়াছে।

বালকের সৃষ্টিছাড়া কল্পনা লইয়া নরেশ অনেক সময় চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিত, যে, এমনটা কেন হয় এবং কেমন করিয়া হয়! ওর দুইটা কালো চোখের মধ্যে কি আছে তাহা একদিন কল্যাণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবে।

কিন্তু হঠাৎ এক দিন প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, সে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। তখন সে পরম গম্ভীর-মুখে কলেজের পড়া পড়িবার জন্য অশ্রুময়ের সঙ্গে কলিকাতা চলিয়া গেল।

কলেজের পড়া আরম্ভ করিবার পর ছুটীর দিনে যখন দুই বন্ধুতে বাড়ী আসিত, তখন নরেশের পেয়ারা গাছে চড়া ক্রমেই বিরল হইয়া আসিতে লাগিল এবং এমন কতকগুলি সৃষ্টিছাড়া কাজে সে হাত দিয়া বসিল, যাহাতে গ্রামের প্রবীণদের মধ্যে প্রবল আন্দোলন ও মতভেদ উপস্থিত হইলেও ছেলের দল নরেশকেই তাহাদের মাথার মণি করিয়া লইল।

কিন্তু গ্রামের অসহায়দিগের সাহায্যের জন্য যে দিন তাহারা ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইল, এবং অস্পৃশ্য জাতীয়ের বাড়ীতেও রোগীর শিয়রে ঐ নরেশের দলকে দেখা গেল, সে দিন ভট্টাচার্য্যদের চণ্ডীমণ্ডপে প্রবীণদের নস্য লওয়ার ধুম পড়িয়া গেল।

নানা বাগ্‌বিতণ্ডার পরও যখন এ কথাটার কোনও মীমাংসাই করা গেল না, তখন সেরখানেক তামাকু পোড়াইয়া সন্ধ্যার পর যে যাহার বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

প্রায় প্রত্যেক বাড়ীর ছেলেই নরেশের দলের মধ্যে ছিল সুতরাং তর্ক যতই চলুক, এবং নস্য তামাকুর যতই সদ্ব্যবহার হউক্, একটা মীমাংসায় উপনীত হওয়া ততটা সহজ হইল না!

তার পর মখুয্যেদের ছোট কর্ত্তার কলেরা হইলে যখন এই ছেলের দলই সেবার ভার গ্রহণ করিয়া বেচারীকে বাঁচাইয়া তুলিল, এবং তাহার পাঁচ দিন পরেই বোসেদের বাড়ীর অগ্নিকাণ্ডের সময় এই নরেশের প্রকাণ্ড দলকে ছোট ছোট বাল্‌তি ও দা' হাতে উপস্থিত হইয়া নরেশের নেতৃত্বাধীনে সুশিক্ষিত সৈন্যদলের মতই আগুন নিভাইয়া, রাত্রিকার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া যাইতে দেখা গেল। তার-পর হইতেই এই দলটীর বিরুদ্ধে আর কেহই একটী কথাও বলিল না।

এর পরেই এক রবিবারের সকালে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নগ্নপদে যখন ইহাদের রাস্তায় বাহির হইতে দেখা গেল, ঠিক্ তখনই হরিহর ভট্টাচার্য্য আহ্নিক সারিয়া পুকুর ঘাট হইতে ফিরিতেছিলেন। ছেলের দল পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায় দেখিয়া তিনি তাহাদের সম্মুখে পথবন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "ওরে নরেশ, তোর বাপের বয়সী আমি, তার সঙ্গে আমার বান্ধবতাও কম নয়। আজ তোর কাছে ক্ষমা চাইতে গেলে তোর অকল্যাণ করা হবে! তোর এই ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে যদি তোর সঙ্গে গ্রামে বেরুতে পারতাম্ তবেই ঠিক হ'ত! কিন্তু এ বয়সে তা' আর কুলোবে না, বাবা; তুই চল্, তোর ঐ ঝুলিটে ভরে দিয়ে এ কয় মাসের দেনা মিটিয়ে ফেলি।"

নরেশ এতক্ষণ মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া কথা শুনিতেছিল, এখন

দুই হাতে হরিহর ভট্টাচার্য্যের পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইয়া হাসি মুখে কহিল, "সে কি কাকা, আমি যে আপনার ছেলের মত! আমাকে এ সব কথা বলে অপরাধী করবেন না! চলুন, আপনার দান মাথায় করে নিয়ে আসব,—আর সত্যি আপনাদের আশীর্ব্বাদ না পেলে আমাদের এ সব কাজ তো এক দণ্ডও বাঁচতে পারে না, কাকা!—"

এই হরিহর ভট্টাচার্য্য এক দিন ভিক্ষা চাহিতে গেলে ছেলের দলকে সোজা পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন এবং এদের এই সব অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া কাজগুলি যে ভদ্রসমাজের মুখে চুণকালীর একটা স্থায়ী প্রলেপ দেওয়া হইতেছে, তাহাও জানাইয়া দিয়াছিলেন!

তার পর কয়েকটা বৎসর কাটিয়া গেল।

দেবী সরস্বতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পূজার উপকরণগুলির চন্দনপঙ্কটুকু তুলিয়া লইয়া বৎসরের পর বৎসর এই পল্লীযুবকটির ললাটে বিজয়তিলক অঙ্কিত করিয়া দিতে লাগিলেন, এবং আজ যখন প্রভাতের প্রথম রশ্মি ছিন্ন মেঘের আড়াল দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া এই বাড়ীটীর প্রাঙ্গণের উপর পড়িয়া হাসিয়া উঠিল, ঠিক তখনই নরেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজয়-গৌরবের সংবাদটী তাহার অভিনন্দন জানাইয়া গেল।

প্রায় দুই ঘণ্টা পরে নরেশ ও অশ্রুময় ফিরিয়া আসিল।

রান্নাঘরের দুয়ারের কাছে মুখ বাড়াইয়া মানদাসুন্দরী কহিলেন, "তোদের এত দেরী হ'ল কেন রে নরু?"

"তোমার নরেশের তো কাজের অন্ত নেই, মা! এখান থেকে বেরিয়েই ওদের বাড়ীতে খবরটা জানিয়ে ভট্টাচায্‌দের ওখানে রোগী দেখ্‌তে গেলাম, তার পর ওর ছেলের দল এসে জুট্‌ল, তারা ওকে মাথায় করেই নাচ্‌বে, না কি করবে ঠিকই পায় না।"

মানদাসুন্দরী হাসিমুখে কহিলেন, "তা' এতো মাথায় করেই নাচ্‌বার কথা, অশ্রু !"

"তুমিও যেমন ও পাগলাটার কথা শোন ;"—বলিয়াই নরেশ পাকঘরের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "তোমার রান্না হ'তে ঢের বাকী বুঝি, তবেই হয়েচে, এদিকে যে নাড়ীশুদ্ধ হজম হতে চল্‌ল কাকিমা !"

মানদাসুন্দরী কহিলেন, "ও আমি জানিই ! পাক সারা হ'য়ে গেলে বেলা দুটোর মধ্যেও তোদের খাওয়ার নামটী থাকে না, দুজনে তর্কের ঝড় তুলে দিস্ ! আর চোখে যদি পড়্‌ল পাক হয় নি, রক্ষে নেই, অমনি নাড়ীশুদ্ধ হজম হ'তে বসে !"—বলিয়াই হাসিতে হাসিতে উঠিয়া গেলেন এবং ওঘর হইতে থালা ভরিয়া লুচি তরকারি মিষ্টি আনিয়া হাজির করিয়া কহিলেন, "কিন্তু বাছারা খাওয়ার সময় নানা বাহানা তুল্‌তে পার্‌বে না বলে দিচ্ছি ;—বেশ লক্ষ্মীর মত বসে এটুকু খাও তো ; তার পর তর্ক কর্‌তে বসে যাও, আমিও এদিকে পাকটা সেরে নেই,—"

খাবারের পরিমাণ দেখিয়া নরেশের মুখ শুকাইয়া উঠিয়াছিল ; সে শুষ্ককণ্ঠে কহিল. "আমি কি সত্যি করেই বলেচি, কাকিমা ? আর এই থালাভরা খাবার কি তোমার 'এটুকু"—

"ও সব আমি শুনিনে বাছা, খাবার দিলেই তোমার নানা কৈফিয়ৎ জোটে, তা' আমি তো বেশ করেই জানি—" তার পর রান্নাঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, "ওরে কল্যাণি ! দুখানা আসন ও জলের গেলাস নিয়ে আয় তো ।"

কোনও ওজর আপত্তিই যে এই স্নেহময়ী নারীর কাছে খাটে না, তাহার পরিচয় নরেশ বাল্যকাল হইতেই পাইয়া আসিতেছে, সুতরাং সে

অশ্রুময়ের হাত ধরিয়া টানিয়া বসিয়া পড়িল এবং মানদাসুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "আচ্ছা এ আমরা দু মিনিটেই শেষ করে দিচ্ছি কাকিমা ;" তারপর পরম গম্ভীর মুখে, "খেয়ে কেবল তোমার কাছেই আমার নাম হ'ল না কাকিমা ! নইলে অশ্রু জানে, বাইরে এ বিষয়ে আমি কত বড় ওস্তাদ, এবং কতখানি নাম করে ফেলেচি,"—বলিয়াই কথাটা প্রমাণিত করিয়া দেখাইবার জন্য খানিকটা খাবার মুখের মধ্যে পূরিয়া দিয়া হাসিয়া উঠিল।

"খাবার মুখে দিয়ে হাসিস্‌নেরে পাগল, বিষম লাগবে যে—" বলিয়া হাসিতে হাসিতে পাকঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

কিন্তু এত হাসি ও আনন্দের মধ্যেও আজ নরেশ কেন যে মোটেই স্বস্তি পাইতেছিল না, তাহা সে একেবারেই বুঝিতে পারিল না। বুকের মধ্যে কোথায় একটা রক্তঝলক চঞ্চল শিশুটির মতই নাচিয়া ফিরিতেছিল ; তাহার যেমন সময় অসময় জ্ঞানও ছিল না, তেমনি একটা ছন্দের বোধও ছিল না। তবুও সে যে একটা নূতনতর পুলককম্পন সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবারও কিছু ছিল না।

কল্যাণীর আঙ্গুলের ক্ষতস্থানটা সজোরে টিপিয়া ধরিতেই সে যে হাতখানি টানিয়া লইবার জন্য একটু আকর্ষণ করিয়াছিল; তাহার তখনকার লজ্জানত সুগৌর মুখখানির কোমল শ্রী, বর্ণসুষমার উপর দিয়া শোণিতের দ্রুত ক্ষণিক উচ্ছ্বাস শুধু এই কয়টা কথাই যে কেবল ঘুরিয়া ফিরিয়া কেন মনে পড়িতেছিল, তাহা সে ভাল করিয়া না বুঝিলেও এই অনুভূতিটুকু যে আজই তাহার কাছে প্রথম মূর্ত্ত হইয়া ধরা দিয়াছে, এটুকু বুঝিয়া তাহার দুই চোখ লজ্জায় ও বিস্ময়ে ভরিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তাহার হঠাৎ যখন মনে হইল, এত বড় সুখবরটা জানাইবার পরও কল্যাণী আজ তাহাকে একবারও অভিনন্দন জানায় নাই, এবং বরাবরই

ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া কথা শুনিয়া গিয়াছে, তখন তাহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না !

অথচ তাহার দুই চোখই যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল এবং হাতের কাজগুলি মোটেই সারা হইতেছিল না তাহাও সে বরাবর লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছে।

দুপুরে আহারের শেষে অশ্রুময় যখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, তখন নরেশ নির্জ্জন পড়িবার ঘরের মধ্যে একটা আরাম চৌকীর উপর পড়িয়া একখানা বাঙ্গলা মাসিকের পাতা উল্‌টাইতেছিল।

তখনও তাহার মনের উপর দিয়া আকাশের ছিন্ন মেঘের মতই সমস্ত দিনের কথাগুলি আনাগোনা করিতেছিল। ঠিক সেই সময় কি একটা নিতে আসিয়া কল্যাণী ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া নরেশকে দেখিয়া একেবারে অপরাধীর মত এতটুকু হইয়া গেল এবং তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইবার জন্য ফিরিতেই নরেশ উঠিয়া বসিয়া কহিল, "শোন"—

কল্যাণী দাঁড়াইয়া গেল, কিন্তু দুয়ারের দিকেই মুখ করিয়া রহিল দেখিয়া নরেশ কি বলিবে ঠিক্ বুঝিয়া উঠিল না, অথচ যাহাকে কিছু বলিবার জন্যই যাইতে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহাকে যাহাই হউক একটা কিছু বলাও দরকার হইয়া পড়িয়াছিল।

সুতরাং সে আর কোনও কথা না পাইয়া হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "প্রতিবার পাশের খবর বের হ'লে একটা প্রণাম পেতাম, এবার অদৃষ্টে তাও জুটল না দেখচি ! এর চেয়ে পাশ না করাই ভাল ছিল যে !"

কথাটা এমন করিয়া বলিবার ইচ্ছা একেবারেই ছিল না এবং এই মেয়েটীকে সে চির দিনই খোঁপা টানিয়া, বেণী দুলাইয়া নাকের নোলকটী নাড়িয়া দিয়া কথা বলিতেই অভ্যস্ত ছিল ;—তাই আজকার এ কথাগুলি তাহার নিজের কাণেই এমন বিশ্রী শুনাইল যে, কল্যাণী যখন মৃদু হাসিয়া,

আঁচলখানি গলার উপর দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া, তাহার পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া দুই হাতে পায়ের ধূলা তুলিয়া মাথায় দিল, তখন নরেশ একেবারে কোনও কথাই না বলিতে পারিয়া আড়ষ্ট হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কল্যাণী অঞ্চলের প্রান্তটা ডান হাতে তুলিয়া ধরিয়া বাম হাতের আঙ্গুলগুলিতে জড়াইতে জড়াইতে এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তার পরই "মেয়ে মানুষ প্রণাম কর্‌লে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে হয় যে," বলিয়াই স্মিতমুখে একবার নরেশের মুখের উপর চকিত দৃষ্টি বুলাইয়াই দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

নরেশ চেঁচাইয়া বলিল, "একটু দাঁড়িয়ে শুনে যাও!—"

কিন্তু কাহারও কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

১৩

ঘটনাগুলি এমন কিছুই নয় যাহাতে চিত্তের উপর একটা ছাপ রাখিয়া যাইতে পারে।

অন্তর যখন বিজয়গর্ব্বের পুলকে চঞ্চল ছিল, তখন একটা কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জ্জিত যুবকের সামান্য একটা মুখের কথা দুটা চিরপরিচিত কালো চোখের গভীর লজ্জানত দৃষ্টি, সর্ব্বোপরি একখানি পরমশুভ্র পাণিপদ্মের উত্তপ্ত স্পর্শ ও একটু সলজ্জ মৃদু আকর্ষণ, এমন কি বিচিত্র মায়ালোক সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারে, যাহার মোহ নরেশকে একেবারে পাইয়া বসিল।

এই কল্যাণীকে এতটুকু হইতেই তো দেখিতেছে; কিন্তু আজিকার এই শান্ত অরুণোজ্জ্বল প্রভাতেই সে যেন সমুদ্রমন্থনের পর উত্থিত বিশ্বলক্ষ্মীর মতই একটী নূতন বিস্ময়ের মূর্ত্তিতে তাহার মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে প্রথম আসিয়া দাঁড়াইল। নরেশ বুঝিতেই পারিল না ঠিক কখন, এই এতদিনের বালিকাটী নারীর ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী মূর্ত্তিতে তাহার চিত্তের অনুরাগকে মায়াস্পর্শ দিয়া জাগাইয়া তুলিয়াছে এবং কখন অন্তরলক্ষ্মীরূপে ইহাকেই বরণ করিয়া লইবার জন্য সে ভিতরে ভিতরে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে!

এ সবই তাহার অজ্ঞাতে কখন ঘটিয়া গিয়াছে এবং ইহার জন্য কাহাকে দায়ী করিবে, যখন ঠিক বুঝিতে পারিল না, তখন সে একে-বারেই সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

কিন্তু ঠিক আগেকার মতই সহজভাবে কল্যাণীকে দেখা সম্ভব কি না এই কথাটা মনে উঠিতেই নরেশ তাহার নিঃসঙ্গ শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল এবং কোনও দিকেই না চাহিয়া একেবারে এ বাড়ীতে চলিয়া আসিল।

তখন আকাশে প্রথম আশ্বিনের বর্ষণক্লান্ত মেঘের নিষ্ফল গুরু গর্জ্জন

চলিতেছে। পথ ঘাট শুখাইয়া উঠিয়াছে। খণ্ড, শুভ্র, মেঘের আড়াল দিয়া বৈকালিক সূর্য্যের খানিকটা রশ্মি পথের ধারের গৃহস্থ বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপের সম্মুখে ঠিকরিয়া পড়িয়াছিল। সেখানে ছোট ছেলে মেয়ের দল বিস্ময়-পুলকিত দৃষ্টিতে প্রতিমা-নির্ম্মাণ দেখিতেছিল। এই শিশুদলের কলহাস্য কানে আসিতেই পথের কাছে দাঁড়াইয়া নরেশ একবার ইহাদের মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইয়াছিল।

দুয়ার ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিতেই নরেশ দেখিল, সম্মুখের দিকে অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া কল্যাণী একখানি বইয়ের পাতা উল্‌টাইতেছে।

নরেশ আসিতেই চকিতদৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মুখের উপর তুলিয়া ধরিল এবং বইটা তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

আজ এ বাড়ীতে আসিবার পূর্ব্বে নরেশ স্থির করিয়াই আসিয়াছিল যে, পূর্ব্বের মতই সহজ ভাবে কল্যাণীর সঙ্গে কথা বলিয়া যাইবে। তাই সে গলার স্বর যথাসম্ভব স্বাভাবিক করিয়া বলিল, "কাল ডাক্‌লাম এলে না যে?"

কল্যাণী মুখ নত রাখিয়াই কহিল, "কেন?"

একবার কাসিয়া গলাটা পরিষ্কার করিরা নরেশ বলিল, "আশীর্ব্বাদ চাইলে, তাই তো ডাক্‌লাম।"

একটু মৃদু হাসির রেখায় কল্যাণীর মুখ ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। খোলা দুয়ারের দিকে চাহিয়া বলিল, "ও এই কথা! আমি মনে কর্‌লাম, ভারি দরকারী কিছু হবে বা!"

দুএকটা কথা হইয়া যাইতেই উভয় পক্ষেরই বাধ বাধ ভাবটা কিছু কমিয়া গেল।

নরেশ হাসিয়া বলিল, "কেন ওটা বুঝি তেমন একটা মস্ত কথা কিছু নয়?"

কল্যাণী এইবার মুখ তুলিয়া নরেশের দিকে চকিত দৃষ্টিতে চাহিয়া "দূর্ তা কেন? ও আমি না যেয়েও পেয়ে গেছি যে,—" বলিয়া ফেলিয়াই লজ্জিত মুখে, ঘর হইতে চলিয়া যাইবার জন্য তাড়াতাড়ি দুয়ারের দিকে গেল।

নরেশ বলিল, "যেও না, আজ পড়া বল্‌বার দিন যে!"

কল্যাণী একটু হাসিয়া দুয়ারের কাছেই থামিয়া দাঁড়াইল।

যাহার কাছে এত কাল পড়া দিয়া আসিয়াছে, এবং ঠিক তিন দিন পূর্ব্বেও দিয়াছে, আজ যে সে পড়া বলিবার দিনটাকে মনে করিয়া দিবে ইহার মধ্যে নূতন কিছুই ছিল না। কিন্তু কল্যাণী যখন ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিল যে, সে দিন কিছুতেই তাহার পড়া বলিবার দিন নহে এবং সে পড়িবার জন্য মোটেই প্রস্তুত নহে, তখন নরেশের ইচ্ছা হইতেছিল পূর্ব্বের মতই তাহার দোদুল্যমান বেণীটি ধরিয়া টানিয়া পড়া লইবার জন্য বসাইয়া দেয়।

কিন্তু আজ আর তাহা পারিল না এবং বলিবার বিশেষ কিছু না থাকিলেও, একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিমুখে কহিল, "তা হোক্, কালই আমি কল্‌কাতা চলে যাচ্ছি, ফির্‌তে ক'দিন দেরীও হতে পারে; সুতরাং এ কয় দিনের পড়া আজ ঠিক করে দিয়ে যাব,—" তার পর হঠাৎ টেবিলের দিকে চাহিয়া কহিল, "ওটা কি বই পড়্‌ছিলে এতক্ষণ?"

অগত্যা কল্যাণী ফিরিয়া আসিয়া পূর্ব্বের জায়গাতেই দাঁড়াইল এবং বইটা টেবিলের উপর হইতে নরেশের দিকে সরাইয়া দিতে দিতে মৃদুস্বরে কহিল, "এখন কল্‌কাতায় কেন?—"

কিন্তু তাহার চিরদিনের গুরুটীর কাছে এই কথাটা বলিতেই আজ তাহার শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হইল, এবং এটা যে তাহার পক্ষে

অনাবশ্যক কৌতূহল তাহাও ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তেই মনে পড়িয়া লজ্জায় মুখ চোখ রাঙ্গা হইয়া উঠিল।

বইটা তুলিয়া লইতে লইতে নরেশ কহিল, "সে অনেক কথা, আজ তোমাকে বল্‌ব মনে করেছি"—বলিয়াই নরেশ তাহার দৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্য কল্যাণীর মুখের উপর স্থির করিয়া রাখিল।

কিন্তু হঠাৎ এই কল্যাণীর কাছেই নিজের কথাগুলি বিশেষ ভাবে জানাইয়া দিবার জন্য এমন কি প্রয়োজন ছিল, এবং এমন একটা আগ্রহ কেনই বা মনে উঠিল, তাহার কারণ খুঁজিয়া দেখিবার সাহস তো হইলই না, বেশীর ভাগ এত দিন যাহাকে একটী ক্ষুদ্র ছাত্রীরূপেই দেখিয়া আসিয়াছে এবং জীবনের ছোট বড় কাজগুলির মধ্যে যাহার অস্তিত্বকে স্বীকার করিবার মত আবশ্যকতাও একটী মুহূর্ত্তের জন্যও তেমন করিয়া অনুভব করে নাই, আজ তাহার কাছেই অনেক কথা বলিবার আছে এই খবরটা জানাইয়া দিয়া সে নিজেই বিস্মিত হইয়া উঠিল এবং ভিতরে ভিতরে একটু লজ্জাও অনুভব করিতে লাগিল!

একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া, হাতের বইটার পাতাগুলি অন্যমনস্ক-ভাবে উল্‌টাইতে গিয়া যে শ্লোকটা প্রথমেই তাহার চোখে ঠেকিল, সেই শ্লোকটাকে নরেশ একবার মনে মনে পড়িয়া গেল এবং মুহূর্ত্তের জন্য দুই চোখ্ তুলিয়া কল্যাণীর দিকে চাহিয়াই আবার বইয়ের পাতার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

কিন্তু অদৃষ্টের এমনি উপহাস, যে, এই বইটার দেবনাগরী হরফগুলি ঠিক্ তখন আর তাহার কাছে মোটেই ধরা দিতে চাহিল না। শুধু মনের ভিতরে

"ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়োঃ।"

শ্লোকের এই প্রথম চরণটীই ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা ছন্দে দেখা দিতে লাগিল এবং বইয়ের প্রত্যেক পাতার উপরেই যেন মোটা মোটা অক্ষরে শুধু ঐ কয়টা কথাই উঠিতে লাগিল।

কিন্তু এই বইটার এই সব শ্লোকই সে কল্যাণীকে এর পূর্ব্বে কত-বারেই বুঝাইয়া দিয়াছে।

অন্যমনস্কভাবে বইটার পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে নরেশ বলিল, "যা বল্‌ব, তা আর কারু কাছে বলিনি কিন্তু"—

কল্যাণী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "আচ্ছা"—

যেন সে চিরদিনই নরেশের ছোট বড় সকল কথার সঙ্গেই একান্ত পরিচিত এবং এ সব কথার গুরুত্বও সে বেশ বোঝে!

নরেশ বলিল, "এবার কল্‌কাতা যেয়ে একটা জায়গায় যাওয়ার বন্দোবস্ত সব ঠিক করে আস্‌ব মনে করেছি,"—বলিয়াই কল্যাণীর মুখের দিকে চাহিল।

কল্যাণী উৎকণ্ঠিত মুখে কহিল, "কোথায়?"—

নরেশ বলিল, "ও সে অনেক দূর,"—

ডান হাতের আঙ্গুলগুলি বাম হাতের মধ্যে মুঠি করিয়া, ধরিয়া কল্যাণী একবার নরেশের মুখের দিকে চাহিয়াই চক্ষু নামাইয়া লইল, তার পর কহিল, "বাঃ, কোথায়, তা' বল্‌তে নাই নাকি?"—

একটু নড়িয়া চড়িয়া ঠিক্ হইয়া বসিয়া পরম গম্ভীর মুখে নরেশ বলিল, "হুঁ,—বল্‌চি; কিন্তু বল্‌লে একেবারেই চম্‌কে না যাও তাই ভাব্‌চি।—"

কল্যাণী কোনও কথা কহিল না; কিন্তু তাহার দুই চোখের দৃষ্টির মধ্যে যে একটা বিপুল উৎকণ্ঠা ফুটিয়া উঠিল, তাহা বুঝিতে নরেশের একটুও বিলম্ব হইল না। এবার স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ কল্যাণীর মুখের

দিকে চাহিয়া রহিল, তার পর ধীরে ধীরে কহিল, "ছেলে বেলা থেকেই একটা আকাঙ্ক্ষা মনের মধ্যে পোষণ করে আস্‌চি, এবার সেটাকে পূরণ করবার সুযোগ এসেছে,—ওকি শুন্‌ছ না ?" বলিয়াই নরেশ থামিয়া গেল !

কল্যাণী শুষ্কমুখে কহিল, "শুন্‌ব না কেন, শুন্‌ছি ; কিন্তু এত গুছিয়ে, এত সাবধান হয়ে যে কথাটাকে জানাতে হয়, সেটা যে খুব সহজ নয়, তা' আমি বেশ্‌ বুঝে নিয়েছি,—"

কল্যাণী এতগুলি কথা একসঙ্গে বলিয়া ফেলিয়া লজ্জায় একেবারে এতটুকু হইয়া গেল।

সে বুঝিয়াছিল, তাহার বুকের মধ্যে যে উৎকণ্ঠা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে, তাহা এই কথার মধ্য দিয়াও নরেশের কাছে ধরা পড়িয়া গিয়াছে। তখন সে মুখ নীচু করিয়া লইয়া টেবিলের কোণটা খুঁটিতে লাগিল।

নরেশ একটু জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তবে বলেই ফেলি ;—বৃত্তিটা যখন পেলামই, তখন ইচ্ছে হচ্ছে বিলেতটা একটু ঘুরে আসি।"

কিন্তু যাহার কাছে সংবাদটা দেওয়া গেল তাহার মুখের উপর দিয়া এমন অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আসিয়া গেল যে, কল্যাণী তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইলেও, তাহা নরেশের দৃষ্টি এড়াইল না।

কল্যাণী কোনও কথা বলিল না ; কিন্তু তাহার পা দুটা কাঁপিতেছিল এবং মুখখানা একেবারেই বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নরেশ কহিল, "প্রায় চার বছর থাক্‌তে হবে,—"

এবার শিহরিয়া উঠিয়া নরেশের মুখের দিকে চাহিয়া কল্যাণী বলিয়া উঠিল, "চার বছর !"—

তার পর একটু থামিয়া, অন্ধকারের মধ্যে সহসা আলোক রেখা দেখিলে মানুষ যেমন আশান্বিত হইয়া উঠে, তেমনি ভাবে কহিল, "জ্যেঠা মহাশয় যেতে দেবেন ?" কথাটা বলিয়াই তাহার মনে হইল, এমন একটা বাধা সে হঠাৎ উপস্থিত করিয়া দিল, যাহার কথা নরেশ বোধ হয় ভাবিয়া দেখে নাই।

কিন্তু নরেশ যখন কহিল, "হাঁ, তাঁহার মত না পেয়ে কি আর এসব সাহস কর্‌ছি,—" তখন তাহার চোখের সম্মুখটা একেবারে ঝাপ্‌সা কুয়াসায় ঢাকা মনে হইতে লাগিল। কিন্তু তাহার চোখ দুইটাও যে জলে ভরিয়া উঠিতেছে, এ কথাটা নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, এবং একেবারে ছাদের উপর উঠিয়া গিয়া আলিসায় বুক রাখিয়া পশ্চিমের আকাশের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন পল্লীর উপর দিয়া আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিতেছিল।

নীচের ফুলবাগানের একটা পাশে নানা রংএর সন্ধ্যামণি ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। দোপাটী ফুলের গাছ ভরিয়া বিচিত্র ফুল ফুটিয়াছে; স্থলপদ্মের কুঁড়িগুলি স্ফুটোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। বাতাস কুয়াসায় গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে এবং নির্ম্মল স্বচ্ছ আকাশের গায়ে দশমীর চাঁদ দিনের আলোক হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছিল।

একটু পরেই ষ্টেসনের রাস্তার দিক্ হইতে অশ্রুময়কে আসিতে দেখিয়া কল্যাণী নীচে নামিয়া আসিল।

উঠানে পা দিয়াই হাসিমুখে অশ্রুময় জিজ্ঞাসা করিল, "মা,—মা কোথায় রে ?"

পাশের ঘরে কি কাজে ব্যস্ত ছিলেন, উত্তর আসিল, "অশ্রু

এসেছিস্। এই যে আমি এ ঘরে রয়েছি;—মালাটা শেষ করে এখনি আস্‌ব।”—

দুয়ারের কাছেই জুতাটা ছাড়িয়া ঘরে আসিয়া মাকে প্রণাম করিতে করিতে অশ্রুময় বলিল,—“মা, সাহেব আজ আমার মাইনে আশী টাকা করে দিয়েছেন; তিন মাস পরে একশ’ টাকা কর্‌বেন বল্‌লেন।”

মানদাসুন্দরী নিঃশব্দে মালা ফিরাইতে লাগিলেন, একটু পরেই জপ শেষ করিয়া মালা গাছটী একবার কপালে ঠেকাইয়া সাবধানে তুলিয়া রাখিলেন, তার পর ছেলেকে কোলের কাছে টানিয়া বসাইয়া সর্ব্বাঙ্গে নীরবে হাত বুলাইয়া দিলেন।

নরেশ কখন চলিয়া গিয়াছিল।

বাড়ীর দিকে না যাইয়া একেবারে নদীর দিকে চলিয়া আসিল। সেখানে বাঁধা ঘাট্‌লার উপর বসিয়া পড়িয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

তখন চারিদিক নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় ভরিয়া গিয়াছিল। শুভ্র মেঘের পাড়িতে আঁটা, সুনীল হ্রদের মতই খণ্ড আকাশের মধ্য দিয়া চাঁদ ভাসিয়া যাইতেছিল। নদীর বীচিমালা চুম্বন করিয়া, তীরের কাশপুষ্প দুলাইয়া, বেতসকুঞ্জ কাঁপাইয়া, বায়ুপ্রবাহ সন্তর্পণে ফিরিতেছিল।

এ কয় দিন কতকগুলি কথা মনের মধ্যে নিতান্তই বিশৃঙ্খলভাবে ঘুরিতেছিল। এখন সেগুলিকে ঠিক্ করিয়া গুছাইয়া ভাবিয়া দেখিবার জন্য নরেশ এই নিরবিলি স্থানটীতে আসিয়া বসিল।

যে কথাটা আজ দুই দিন পর্য্যন্ত অনবরত তাহার মনের মধ্যে সাড়া দিয়া ফিরিতেছে, একটু ভাবিতেই নরেশ বুঝিল, এটা অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন ভাবে বহু দিন হইতেই তাহার মনের মধ্যে বাড়িয়া উঠিয়াছে। হাওয়া

পাইয়া জ্বলিয়া উঠিবার পূর্ব্বেও যেমন আগুন ভিতরে ভিতরে পুড়িয়া বহু বিস্তৃত হইয়া থাকিতে পারে, এও ঠিক্ তেমনি এত দিন মনের অন্তরতম স্থলে গোপনে এমনি ভাবে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, যাহার খবর তাহার নিজের কাছেও এত দিন পৌঁছায় নাই।

কিন্তু আজ যখন এ এর অস্তিত্বকে জানাইয়া দিয়া গেল, তখন, একে যেমন অস্বীকার করিবারও উপায় নাই, তেমনি একেবারে চিহ্নহীন করিয়া মুছিয়া ফেলিয়া দেওয়াও অসম্ভব!

মাথার উপর হইতে চাঁদ কখন নামিয়া গিয়াছে। তবু জ্যোৎস্নায় দিক্‌বিদিক ভাসিয়া যাইতেছিল। বাতাস কেয়াফুলের মিষ্টগন্ধ বহন করিয়া লইয়া আসিয়া নরেশের সর্ব্বাঙ্গে সন্তর্পণে মৃদু স্পর্শ দিয়া যাইতেছিল। দূরের ও নিকটের নৌকার আলোকগুলি একে একে নির্ব্বাপিত হইয়াছে। ক্বচিৎ দুই একখানি অনাবৃত জেলেডিঙ্গির উপরে আলোক দেখা যাইতেছিল এবং দুই একটা রাগিণীর ছিন্ন অংশ ভাসিয়া আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য ধীবরপ্রবরের সঙ্গীত প্রীতির পরিচয় প্রদান করিয়া একেবারে নীরব হইয়া যাইতেছিল। দূরের পল্লীর দিক্ হইতে সারমেয়ের অস্পষ্ট ক্ষীণধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছিল।

তখনও নরেশ সেই ঘাট্‌লার উপরেই নদীর উচ্ছ্বসিত জলরাশির দিকে নির্ণিমেষ চোখে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিয়াছে!

হঠাৎ বাহুমূল ধরিয়া কেহ সবলে নাড়া দিতেই নরেশ চকিতদৃষ্টিতে মুখ তুলিয়া চাহিল।

অশ্রুময় কহিল, "খুব 'যা' হোক! এখানেই কি রাত কাটা'তে হবে?—না খুঁজিচি এমন যায়গাই নেই যে!"—

নরেশ একটু হাসিয়া উঠিয়া পড়িল। তখন হাত ধরাধরি করিয়া দুই বন্ধু বাড়ীর দিকে ফিরিয়া আসিল।

পর দিন অশ্রুময়ের সঙ্গেই কলিকাতা যাইবার জন্য ভোরের দিকে বাড়ী হইতে একেবারে প্রস্তুত হইয়া এ বাড়ীতে আসিয়া নরেশ যখন উঠানে পা' দিল, তখন কল্যাণী শিউলীতলায় মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া ফুল তুলিতে ব্যস্ত ছিল।

গাছের তলা ফুলে ফুলে ছাইয়া গিয়াছে। এই পরিষ্কৃত শিউলী-গাছের তলাটীতে গত রজনীর জ্যোৎস্নালোকের মধ্যে কোন্ অজানিত লোকের সুরকিশোরী তাহার লীলাচঞ্চল সখীজনের সহিত আসিয়া গিয়াছে এবং ঐ শিউলী ফুলের দলে দলে তাহাদের চরণচিহ্ন আঁকিয়া দিয়া গিয়াছে ; তাহাদেরই কর্ণভূষণচ্যুত মুক্তাফল দূর্ব্বাদলের শীর্ষে শীর্ষে লাগিয়া রহিয়াছে !

অদূরে রক্তকরবী গাছটার উপর বসিয়া একটা দোয়েল অনেকক্ষণ হইতেই শিষ্ দিতেছিল। নরেশ আসিতেই পাখীটা উড়িয়া গেল। ডালটা একটু দুলিয়া উঠিল ; কয়েকবিন্দু শিশির টুপ্‌টাপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

এত ভোরে বাড়ীতে আর কেহই উঠে নাই। নরেশ সন্তর্পণে আসিয়া শিউলী গাছটা ধরিয়া নাড়িয়া দিতেই একরাশ ফুল কল্যাণীর সর্ব্বাঙ্গে ঝরিয়া পড়িল। চমকিয়া মুখ তুলিয়া ফিরিয়া চাহিতেই কল্যাণী দেখিল, ঠিক্ তাহার পিছনেই দাঁড়াইয়া নরেশ মৃদু মৃদু হাসিতেছে।

কল্যাণী রঞ্জিত মুখে মাটির দিকে চোখ নামাইয়া লইতেই নরেশ কহিল, "এত ভোরেই হিমে বেরিয়েচ যে !"

কল্যাণী মুখ না তুলিয়াই কহিল, "তাই বুঝি সর্ব্বাঙ্গে গাছের শিশিরের জলগুলি ফেলে শাস্তি দেওয়া হ'ল,"—

সত্যই নাড়া পাইয়া শিউলী গাছ হইতে যথেষ্ট শিশিরবিন্দু কল্যাণীর মাথায় গায় পড়িয়াছিল।

নরেশ একটু অপ্রতিভ হইলেও হাসিয়া কহিল, "সঙ্গে ফুলও তো যথেষ্ট আছে! জান ত, ব্যাধের নাড়া পেয়ে বেলপাতা আর শিশিরের জল মাথায় পড়্‌তেই শিব ঠাকুর কত খুসি হয়ে উঠেছিলেন, ব্যাধকে ডেকে বর দিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন!—সর্ব্বাঙ্গে যখন এত ফুলজল ঝরেছে, তখন তুমিও তুষ্ট হয়ে বর দিতে পার!—সে বর নিতে আমি একটুও অস্বীকার কর্‌ব না বা কুণ্ঠিত হব না—বুঝ্‌লে?"—বলিয়াই নরেশ নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

"তুমি তো আর ব্যাধ নও নরেশ দা'," হঠাৎ বলিয়া ফেলিয়াই কল্যাণী ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল; নরেশের মুখের দিকে আর মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। শুধু অনুভব করিতে লাগিল, তাহার দুইটা কানের কাছ দিয়া আগুন বাহির হইতেছে, এবং বুকের ভিতর একটা গুরু স্পন্দন চলিতেছে; আর ফুল না কুড়াইয়া সাজি তুলিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই নরেশ কহিল, "ওকি, ফুল কুড়ালে না? তলায় একরাশ ফুল রয়ে গেল যে।"—

নত মুখে, "থাকে থাক্‌," বলিয়াই কল্যাণী মার পূজার ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

নরেশ ডাকিয়া বলিল, "কিন্তু বর না দিয়েই চলে গেলে, মনে থাকে যেন।"

পূজার ঘরে আসিয়াই ফুলের সাজিটা ফেলিয়া রাখিয়া পূবের দিক্‌কার খোলা জানালাটার কাছে গিয়া কল্যাণী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

তখন সবেমাত্র প্রভাতের অরুণ পূবের আকাশে দেখা দিয়াছে!

তাহার কোমল রঙ্গিন্ রশ্মি কল্যাণীর মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে এবং তাহার চূর্ণকুন্তল উড়াইয়া, নীল সাড়ীখানির প্রান্ত একটু দুলাইয়া চঞ্চল বায়ু শীতল স্পর্শ দিয়া যাইতেছে।

নয়টার গাড়ীতে অশ্রুময় ও নরেশ কলিকাতা যাইবার জন্য রওনা হইয়া গেল।

পথ চলিতে চলিতে অশ্রুময় কহিল, "আচ্ছা নরু, তুই যখন বিলেত থেকে ফিরে আস্‌বি, তখনও কি ঠিক্ এম্‌নিটী থাক্‌বি ?"

নরেশ হাসিয়া কহিল, "অদ্ভুত প্রশ্ন! এম্‌নিটী থাক্‌ব না ত কি বদ্‌লে আর একজন হয়ে যাব রে ?"

"বদ্‌লে ঠিক্ আর একজন না হ'ক, বদ্‌লে কি যায় না নরেশ ? আর এটাও ঠিক, ও দেশটা থেকে ফিরে এলে অনেককেই দেখে মনে হয়, আর একজন ফিরে এল! একেবারে চেনাই শক্ত হয়ে ওঠে!"

নরেশ কহিল, "কিন্তু এতে শুধু যে বদ্‌লে যায় তাকেই দোষ দেওয়া চলে না, সমাজও এম্‌নি শক্ত করে আঁটাআঁটি করতে থাকে যে, না বদ্‌লেও উপায় থাকে না!"

এ সব তর্কে অশ্রুময় চিরদিনই সমাজের পক্ষ গ্রহণ করিত; আজও নরেশের এই কথা শুনিয়া সে রাস্তার মাঝখানেই দাঁড়াইয়া গেল এবং উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "কখনই নয়! ও দেশটার মোহ এদের এমন করেই পেয়ে বসে, যে ঘরের যা' কিছু তা' আর প্রীতির চোখে দেখ্‌বার শক্তিই এদের থাকে না! ঠিক্ যেমনটী গিয়েছিল তেমনিটীই যদি ফিরে আস্‌ত, তবে সমাজ এদের বুকে করে নিত, এবং নিয়েও যে থাকে তার যথেষ্ট পরিচয়ও এই সমাজই দিয়ে আস্‌চে! কিন্তু যখন এদের কাছ থেকে শুধু উপেক্ষাই পায় এবং সমাজের চির কালের নিয়মগুলিকে ভেঙ্গে অপমান করেই যখন এরা বাহাদুরী দেখায়, তখন সমাজ নিজকে

বাঁচাবার জন্যই যে একটু আঁটাআঁটি কর্‌বে এটা তো খুবই স্বাভাবিক,”—

নরেশ হাসিয়া কহিল, “কিন্তু ষ্টেশনে যাবার রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়েই এ সব কথার মীমাংসা হতে পারে না,—এবং তা’তে গাড়ীও অপেক্ষা করবে না,”—

অশ্রুময় বলিল, “অতএব যেতে যেতেই তর্ক চলুক্।”

নরেশ কহিল, “কিন্তু সমাজের আঁটাআঁটি একটুখানি নয়, অশ্রু! এ যে আঘাত দিয়ে দিয়ে নিজকেও ক্রমেই দুর্ব্বল করে তুল্‌বে!”—

অশ্রুময় কহিল, “সঙ্গে সঙ্গে যাকে আঘাত কর্‌চে সেও যে দুর্ব্বল হয় নি এ কথা বলা চলে না!”

“ঠিক্ কথা; সে প্রথম দিনের আঁটাআঁটিও যেমন সমাজের আর নেই, তেমনি এই বিলাতফেরৎ দলের একান্ত গোঁড়ামি ও সাহেবিয়ানাও আর তেম্‌নি দেখা যাচ্ছে না!”

“তবু যথেষ্ট আছে!”

“ঠিক্ ততটুকু, যতটুকু গোঁড়ামি আমাদের সমাজের রয়েচে! এটা একটা অত্যন্ত সত্য কথা যে, দুই পক্ষকেই কিছু এগিয়ে আস্‌তে হবে এবং ঠিক্ মাঝ পথে এই দুই পক্ষ এসে মিশ্‌বে!”

অশ্রুময় কহিল, “তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ নরেশ, একদিকে একটা বিরাট সমাজ, অন্যদিকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন বিলাতফেরত! এই দলকেই বেশী করে সমাজের দিকে এগিয়ে আস্‌তে হবে!”—

নরেশ গম্ভীর মুখে কহিল, “এগিয়ে আস্‌তে কিছুই আপত্তি নেই, অশ্রু! কিন্তু আজ এই কথাটাই যে সমাজ স্বীকার করে নিচ্ছে, এতেই কি প্রমাণ হয়ে যায় নি যে, এদের সমাজায়তনের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখ্‌লে আর চল্‌বে না। ভিতরেও এদের জন্য আসন পেতে

দিতে হবে! এদের অস্বীকার কর্‌লে সমাজের বাঁচবার উপায় নেই”—

“সমাজায়তনের ভিতরেই এদের আসন চির দিনই ছিল, এখনও রয়েচে! কিন্তু বুট পায়ে দিয়ে সমাজের ঠাকুর-ঘরে ঢুক্‌বার জন্য যখন এরা সাহেবী চালে পা ফেলে আস্‌বে, তখন সে ঘরের পবিত্রতা রক্ষা করবার জন্য দুয়ার বন্ধ করা দরকার হয়ে পড়্‌বেই! ঘরের ছেলে ঘরে আস্‌লে কেউ কোনও দিন আপত্তি করেও নাই, করবেও না।”

নরেশ হাসিয়া কহিল, “কিন্তু সে শক্তি কি আর সমাজের আছে?”—

অশ্রুময় দৃঢ়স্বরে কহিল, “নিশ্চয়ই আছে! সমাজের শক্তির কোনও দিন ক্ষয় হয় না। এ শক্তি শাশ্বতঃ এবং চির দিনের!”—

নরেশ একটু হাসিল।

হাসি দেখিয়া অশ্রুময় উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, “গ্রহণ কর্‌তে পারার মধ্যে যেমন শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি কাউকে অনধিকার প্রবেশ করতে না দিতে পারার মধ্যেও শক্তির পরিচয় রয়েচে। এ সমাজ যে অনেক বিচিত্রতাকেই নিজের কুক্ষিগত করে নিয়েচে, অথচ নিজের স্বাতন্ত্র্য হারায় নি, এর মধ্যে কি শক্তির পরিচয় নেই? কত বিপ্লবই তো এর বুকের উপর দিয়ে ঘটে গেছে, তা’তে যে এর অস্তিত্ব একেবারেই মুছে যায় নি, এইটেই যে যথেষ্ট শক্তির পরিচয়! পৃথিবীর ইতিহাসে অন্য কোনও সমাজই এতটা শক্তির পরিচয় দেয়নি। কত বিচিত্রতা, কত নূতনত্বই তো এর কাছে এসেচে; কিন্তু এ সমাজ কোনও দিনই সেই নূতনের বিচিত্রতার মোহে আত্মবিসর্জ্জন করেনি; পরীক্ষার আগুনে পুড়িয়ে তাকে আঘাতে আঘাতে জর্জ্জরিত করেচে; তার পর নিজের উপযোগী করে গড়ে নিয়ে কাজে লাগিয়েচে।—”

“সমাজ যখন জীবিত ছিল, তখন ও সব কথা খাটত, অশ্রু; সমাজ

এখন মৃত, এখন এর আর যেমন গ্রহণ করবারও শক্তি নেই, তেমনি বাধা দেওয়ারও ক্ষমতা নেই। সমাজের দেউল ভেঙ্গে পড়্‌ছে একে আর কেউ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না। এর বিরাটমৃত দেহটার উপরেই নবীন সমাজ গড়ে উঠ্‌বে।”—

“তবেই হয়েচে;—তুমিও ঠিক সেই ভুলের পথটা ধরে ব’সে আছ, যে পথে ‘ইয়ং বেঙ্গল’ আজ প্রায় একশো খানি বছর চলে এসেছে! ওরে, ছেলেবেলায় বইয়ে পড়েছিলাম, এক প্রকার গাছ আছে যার সাম্‌নে কোনো জীবজন্তু এসে পড়লেই তার ডালপালাগুলি প্রবল বেগে নড়ে ওঠে এবং তাকে ধরে একেবারে গ্রাস করে বসে, এবং এই গ্রাস করার কাজটা শেষ হয়ে গেলেই আবার ডালগুলো স্থির হয়ে দাঁড়ায়! ঠিক ঐ বইয়ের গাছের মতই হিন্দুসমাজের অবস্থা; গ্রাস করে কুক্ষিগত করবার পূর্ব্বেই একটা প্রবল ঝড় এর উপর দিয়ে বয়ে যায়! এ মর্‌বার পূর্ব্বেকার আক্ষেপ, অস্থিরতা নয়, নরেশ; এ গ্রাস কর্‌বার পূর্ব্বেকার আয়োজন মাত্র! নইলে হিন্দুসমাজ মরে তো নাই-ই, শীগ্‌গির মর্‌বারও কোনও লক্ষণ এর আপাততঃ দেখা যাচ্ছে না!”—

ইতিমধ্যে ষ্টেশনের কাছেই আসিয়া পৌঁছিয়া নরেশ হঠাৎ বাধা দিয়া কহিল, “ও সব তর্ক এখনকার মত থাক্‌। এই আমাকেই কি আমাদের গ্রামের সমাজ গ্রহণ কর্‌বে, যদি সত্যিই আমি যাই?”—

অশ্রুময় একটু দ্বিধা না করিয়া কহিল, “তুমি যদি ঠিক্ ঘরের ছেলেটাই ফিরে আস, আজ না হ’ক্ কাল গ্রহণ কর্‌বেই! তবে আঘাত দিয়ে দিয়ে দেখ্‌বে, তুমি পূর্ব্বেকার নরেশই আছ কি কিনা! কিন্তু তুমি যদি বিদেশিনীর রূপই জীবনের সার কর, বা বামুনের ঘরের মেয়ে আর তোমার কাছে রুচিকর না হয়, একটু অসুবিধে হবে বইকি!”—বলিয়াই হাসিয়া উঠিল।

নরেশ গম্ভীর মুখে কহিল, “আচ্ছা, ধর্, তেম্‌নি কিছুই যদি করে বসি, তুই কি কর্‌বি?”

অশ্রুময় দৃঢ়স্বরে কহিল, “সামাজিক হিসাবে তোমার ছায়াও মাড়াব না,—কস্মিন্‌কালেও না! আর ঠিক্ যদি এম্‌নিটীই ফিরে এস, একটু তুলসীর জল গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে ঘরে তুলে নেব,”—বলিয়াই একটু হাসিয়া নরেশের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল।

নরেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, “তবু তুলসীর জলের ছিটা দিতে হবে, অশ্রু! আচ্ছা, বেশ্!”—

গাড়ীটী আসিয়া পড়িয়াছিল; দুইজনে টীকেট লইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

সকালের আফিস্ ট্রেণ কেরাণীর দলে বোঝাই হইয়া কলিকাতার দিকে ছুটীয়া চলিয়াছে।

এ ষ্টেশন হইতে যাহারা উঠিল, তাহাদের কেহ পকেট হইতে এক-খানা খবরের কাগজ বাহির করিয়া বেঞ্চির উপর পাতিয়া বসিল; কেহ পূর্ব্ব পরিচিতের সন্ধান পাইয়া ভিড় ঠেলিয়া তাহার কাছে যাইতে লাগিল এবং যাইবার সময় হয় তো কাহারও গায়ে পা লাগিতেই হাত তুলিয়া একটী ক্ষুদ্র নমস্কার করিল;—যাহার গায়ে পা লাগিল, সে অসন্তুষ্ট মুখে প্রতি-নমস্কার করিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল। যাহারা পূর্ব্ববর্ত্তী ষ্টেশন হইতে আসিয়াছে, তাহারা কেহ গল্প জুড়িয়া দিয়াছে; কেহ পানের ডিবাটী সযত্নে বাহির করিয়া একটা পান মুখে দিতে দিতে, বাড়ী হইতে আসিবার সময়ে যে সুন্দর মুখের অধিকারিণী পানের ডিবাটা হাতে দিয়া একবার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়াছিল, তাহারই কালো চোখ ও রাঙ্গা অধর মনে করিয়া একবার গোঁফে তা’ দিয়া লইল, এবং হঠাৎ অত্যন্ত

গম্ভীর হইয়া উঠিয়া বুক পকেট হইতে একটু ছোট কাগজে লেখা ফর্দ্দ বাহির করিয়া অন্যের অলক্ষ্যে একবার দেখিয়া লইল! এই ফর্দ্দের মধ্যে সেই সুন্দর মুখের অধিকারিণীর কাঁচা হাতের বাঁকা অক্ষরে কয়েকটা জিনিষের নাম লেখা ছিল, যাহা কলিকাতা হইতে লইয়া যাইতে হইবে। অন্য কেহ জামার ইস্ত্রি ভাঙ্গিবার ভয়ে অত্যন্ত সোজা হইয়া বসিয়াছিল! কেহ 'ক্রেডিট্ ডেবিটের' খাতার পাতার উপর দিয়া সন্তর্পণে চোখ্ বুলাইয়া যাইতেছিল; কেহ পিছনের রেলিংএর উপর কোনও মতে মাথাটা রাখিয়া নাক ডাকাইবার আয়োজন করিতেছিল! এই নিদ্রাতুর লোকটী ঝিমাইয়া গায়ে পড়িয়া হঠাৎ আয়ুঃক্ষয় করিয়া দিতে না পারে, এ জন্য পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিটী অত্যন্ত সতর্ক হইয়া বসিয়া রহিয়াছে! কেহ চুরুট টানিয়া টানিয়া অনর্গল ধূম নির্গত করিতেছিল! একটা জায়গায় কয়েকজন হল্লা করিয়া তাস খেলিতেছিল!

কেহ একখানি মলাট বিহীন বটতলার "রূপসী বরবর্ণিনী" বাহির করিয়া অখণ্ড মনোযোগের সহিত পড়িয়া যাইতেছিল। ঐ বইয়ের নায়িকা রূপসীটীকে নায়ক কেমন করিয়া দস্যুর হাত হইতে উদ্ধার করিল; তার পর কেমন করিয়া আবার জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নৌকাডুবি হইতে বাঁচাইল; কুচক্রী দলের কত ষড়যন্ত্রই ব্যর্থ করিয়া দিল; জলে, আগুনে, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রিতে, ত্রিতল গৃহের চূড়ায়, রেলে, জাহাজে, সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গের মধ্যে, পর্ব্বতের কন্দরে, এই নায়ককে ছদ্মবেশে, সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদে, পিস্তল হস্তে উপস্থিত দেখা যাইতেছে! প্রত্যেক পরিচ্ছেদে অপূর্ব্ব বর্ণনা, রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী, বিস্ময়কর ব্যাপার, সমজদার পাঠকটীকে নিশ্বাস ফেলিতে অবসর দিতেছিল না! তার পর শেষের দিকে, নায়কের সঙ্গে নায়িকার ঠিক্ মিলনের মুহূর্ত্তটীতে,

নায়িকা বুকে ছোরা বসাইয়া দিয়া প্রায় আধঘণ্টা পর্য্যন্ত তিন পৃষ্ঠাব্যাপী জ্বলন্ত বক্তৃতার মধ্যে তাহার প্রেম নায়কের কাছে নিবেদন করিয়া দিল এবং নায়কের কোলেই মাথা রাখিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল ! তার পর সেই দুর্দ্ধর্ষ নায়কও আরও তিন পৃষ্ঠাব্যাপী হা-হুতাশের পর, প্রেয়সীর বুকের ছোরাখানা টানিয়া তুলিয়া নিজের বুকে বসাইয়া দিয়া আখ্যায়িকার শেষ করিয়া দিল।

পাঠকের চোখে জল আসিতেছিল। সে বইখানি মুড়িয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চলন্ত গাড়ীর বাহিরের গাছপালার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া রহিল !

ট্রেণ হঠাৎ কখন পরবর্ত্তী ষ্টেশনে থামিয়া গেল। দুই একজন যাত্রী নামিয়া গেল। দশবার জন গাড়ীতে উঠিল। এ গাড়ীতেও উঠিবার জন্য দু' তিন জন আসিল।

হঠাৎ নরেশ জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া ডাকিল, "সতীশ,—এদিকে, সতীশ।"—

অশ্রুময় সতীশের মুখের দিকে তাহার চকিত দৃষ্টি তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "ওঁকে তুই জানিস্, নরু ?"

নরেশ দুয়ার খুলিয়া দিতে দিতে কহিল, "ও সতীশ,—ওর সঙ্গে এম্, এ, ক্লাশে পড়েচি যে ! কেন, ওকে তুই জানিস্ নাকি ?"—

অশ্রুময় কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই সতীশ গাড়ীর মধ্যে উঠিয়া আসিয়াছিল, হঠাৎ অশ্রুময়ের মুখের উপর দৃষ্টি পড়িতেই কহিল, "বাঃ, আপনিও যে,—নমস্কার, ভাল ত ?"

অশ্রু প্রতি-নমস্কার করিয়া একটু হাসিয়া কুশল প্রশ্ন করিল, কিন্তু ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তটীতে সতীশের স্মিত হাস্যোজ্জ্বল মুখের উপর দিয়া একটা দ্রুত ম্লানিমা পলকের জন্য ছায়া ফেলিয়া গেল !

প্রথম পরিচয়ের দিনেও অশ্রুময় এমনি একটা বিষাদের ছায়া সতীশের মুখের উপর ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছিল।

অশ্রুময় বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া লইতেই দেখিল, সেই বাড়ীটার খোলা বারান্দার উপর দাঁড়াইয়া রেলিংএ বুক রাখিয়া কেহ গাড়ীর দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে।

অশ্রুময় তাহাকে চিনিতে পারিল না। কিন্তু সতীশ জানালার ভিতর হইতে মুখ বাড়াইয়া দিয়া একবারমাত্র চাহিয়াই চিনিতে পারিল, সে উৎপল।

তাহার দুই চক্ষুর দৃষ্টি নিবিড় প্রীতিতে কোমল ও স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল!—

১৫

সপ্তাহ পরে বাড়ী ফিরিয়া ভিতর বাড়ীর উঠানে গিয়া দাঁড়াতেই নরেশের বৌদিদি সুস্নাতা আসিয়া হাসিমুখে কহিল, "কিছু নূতন খবর আছে ঠাকুরপো, বক্‌শিষ্‌ পাওয়ার ভরসা দাও তো বলে ফেলি!"—

তাহার এই কৌতুকময়ী বৌদিদিটী তুচ্ছ খবরটীকেও ঘোরালো করিয়া তুলিয়া মাঝে মাঝে পরম গম্ভীর মুখে জানাইয়া দিতে যে কতখানি অভ্যস্ত ছিল, তাহা নরেশ ভাল করিয়াই জানিত। তাই, সে এতটুকুও আগ্রহ না দেখাইয়া যখন জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা বাড়ীতে আছেন?", তখন সুস্নাতা মনে মনে অত্যন্ত রাগিয়া গিয়া কহিল, "আছেন গো আছেন! ভাল মানুষকে ছুটে খবর দিতে এলাম!"—

নরেশ হাসিয়া কহিল, "তা' বল্‌তে তো আর কেউ নিষেধ করেনি, বৌদি'।" বলিয়াই কথাটা শুনিতে যেন তাহার একেবারেই আগ্রহ নাই এমনি ভাবে বারান্দার উপর উঠিয়া পড়িল।

নরেশ জানিত, সুস্নাতার নিকট হইতে অল্প আয়াসে কথাটা পাইবার ঐ একমাত্র উপায়!

কিন্তু সুস্নাতা আজ সেটা হঠাৎ ধরিয়া ফেলিয়া তাহার উপরেও একচাল দিয়া বসিল।

সুস্নাতা কহিল, "আচ্ছা থাক্‌, এখন না হয় নাই বল্‌লাম; হাতে আমার কাজের অন্ত নেই; সেই গুলিই আগে সেরে নিইগে, তার পর যখন হয় বল্‌লেই হবে!"—বলিয়াই নিজের ঘরে যাইবার জন্য নরেশের পাশ কাটাইয়া দ্রুতপদে উপরে যাইবার সিঁড়ির দিকে চলিয়া গেল।

নরেশ ডাকিয়া কহিল, "কথাটা না বলেই যে চল্‌লে, বৌদি,'!"—

"তোমার তো শোন্‌বার তাড়া নেই! যখন হয় বল্‌লেই হবে, এমনই বা কি?" বলিয়াই খুব তাড়াতাড়ি দুই তিন ধাপ উপরে উঠিয়া গেল।

সপ্তাহ পরে বাড়ী আসিয়াছে বলিয়া নূতন খবরগুলি জানিয়া লইবার জন্য একটা প্রবল আগ্রহ ছিল; তাই নরেশ হাসিয়া কহিল, "হার্ মান্‌চি, বৌদি'!—বলে যাও, কি কথা!"

নরেশের এই পরাজয় স্বীকারে মনে মনে ভারি খুসি হইয়া উঠিয়া কহিল, "শুন্‌তে চাও উপরে এস, আমি একশ' বার সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা কর্‌তে পারিনে!"

নিঃশব্দে হাসিতে হাসিতে সুস্নাতা উপরে উঠিয়া গেল। নরেশ মনে মনে জানিত, বেশীক্ষণ তাহার এই নির্লিপ্ত ভাবটী থাকিবে না, তাই সে কোনও কথা না বলিয়া নিজের ঘরেই চলিয়া গেল।

নরেশ কাপড় বদ্‌লাইয়া এক[illegible]রামচে[illegible]র উপর হাত পা মেলিয়া দিয়া পড়িয়াছিল।

সুস্নাতা দুয়ার ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "হাত মুখ ধোয়া হয়ে গেছে? খাবার নিয়ে এসেচি যে!"

নরেশ দুয়ারের শব্দ পাইয়াই দুই চক্ষু বুজিয়াছিল, এখন চোখ না খুলিয়াই কহিল, "বেশ, টেবিলটার উপর রেখে যাও।"

"না হয় আমি খাওয়ার সময় কাছেই থাক্‌লাম," বলিয়াই পাশের টেবিলটার উপর রেকাবী খানা রাখিয়া দিয়া জলের কুঁজা হইতে এক গেলাস জল গড়াইয়া লইয়া আসিল এবং চলিয়া যাইবার কোনও লক্ষণই না দেখাইয়া ঘরের আস্‌বাবপত্রগুলি গুছাইতে লাগিয়া গেল।

অগত্যা নরেশ চক্ষু চাহিয়া কহিল, "সর্ব্বনাশ, এত খাবার নিয়ে এসেচ! ক'জন খাবে?"

কোটটা ঝাড়িয়া আল্‌নায় রাখিতে রাখিতে সুস্নাতা কহিল, "কেন, তুমিই খাবে! এ আর এমন বেশী কি?" তার পর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িতেই, "সে দিন অশ্রু ঠাকুরপোদের বাড়ীতে তো এর চেয়ে ঢের বেশীই খেলে যে," বলিয়াই একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া লইল।

নরেশ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "সে খবরটা তোমার কাছে এরি মধ্যে পৌঁছে গেছে?"

কিন্তু জোর করিয়া হাসিলেও, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তাহার মুখ চোখ যে রাঙ্গা হইয়া উঠিল, তাহা সে নিজেই অনুভব করিল, এবং ঠিক তখনই সুস্নাতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যে তাহার মুখের উপর স্থাপিত রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া ভিতরে ভিতরে লজ্জিতও হইয়া উঠিল।

কিছুই সুস্নাতার চোখ এড়ায় নাই, তবু সে যেন একেবারেই কিছু লক্ষ্য করে নাই এমনি ভাবে কহিল, "তা' হ'লে ওঠ, আমার ঢের কাজ রয়ে গেছে যে!"

"তা সত্যিই তো," বলিয়া খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিতে বসিতে নরেশ কহিল, "কিন্তু সে কথাটা তো বল্‌লে না, বৌদি'!"

সুস্নাতা হাসিয়া উঠিল। "তাই বল! এতক্ষণ ওকথাটা যে ভিতরে ভিতরে তোমাকে কতখানি অতিষ্ঠ করে তুল্‌চে, তা' কেমন করে বুঝ্‌ব! আচ্ছা, তুমি খাও, আমি বল্‌চি!"

অনুরোধে পড়িয়া মানুষ নাকি একটা অত্যন্ত অসম্ভব রকমের বস্তু, যাহা কস্মিন্‌কালেও খাদ্য শ্রেণীভুক্ত নহে, তাহাও নির্ব্বিবাদে গলাধঃকরণ করিয়া থাকে; নরেশেরও বোধ হয় এই মুহূর্ত্তে সেই কথাটা মনে পড়িয়া গেল, তাই সে খাবারগুলির সদ্ব্যবহার করিবার জন্য একটুকরা ভাঙ্গিয়া মুখে দিতে দিতে তাহার দুই চোখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি সুস্নাতার মুখের উপর তুলিয়া ধরিল!—

তখন সুস্নাতা তাহার গল্প ফাঁদিয়া বসিল। রাজকন্যার মতই এক রূপসী যে অর্দ্ধেক রাজ্য লইয়া শীঘ্রই এ বাড়ীতে নরেশের অঙ্কলক্ষ্মীরূপে দেখা দিবে এবং তাহারই বিস্তৃত আয়োজন যে ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, এমন অনেক কথাই অনর্গল বলিয়া যাইতে যাইতে, হঠাৎ থামিয়া গিয়া নরেশের মুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিল।

রেকাবীর উপরকার খাবারগুলি যেমন তেমনি পড়িয়া রহিয়াছে; মুখখানা একেবারেই রক্তহীন হইয়া গিয়াছে এবং দুই চোখের দৃষ্টি ব্যথায় ম্লান হইয়া উঠিয়াছে!

একবার চাহিয়াই কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "ওকি, তোমার মুখ চোখ যে কেমন হয়ে গেছে,—অসুখ করে নি ত?"

নরেশ সাম্‌লাইয়া লইয়া কহিল, "ও কিছু নয়।" তার পরই জোর করিয়া হাসিয়া, "তোমার কথা খুব মন দিয়ে শুন্‌ছিলাম কিনা—তাই,"—বলিয়াই হঠাৎ চুপ করিয়া গিয়া অন্যমনস্কভাবে রেকাবীর উপরেই খানিকটা খাবার দুইটী আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া টিপিয়া ভাঙ্গিতে লাগিল!

সুস্নাতা তাহার দুই চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি কিছুক্ষণ নরেশের আনত মুখের উপর স্থির করিয়া রাখিল; তার পর মনে মনে কহিল, "ঠাকুর তো ছেলের বিয়ে দেবেন বলে রাজ্যিশুদ্ধ তোলপাড় করে তুলেচেন; কিন্তু এ ছেলেটী যে নিপাট্ ভাল মানুষটিই নয় এবং ওরও পেটে পেটে যে অনেক বিদ্যে রয়েচে, তা' তো তিনি টের পাননি! ও হরি, আমি ভাবতাম্ ও বুঝি ওর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি নিয়ে আর বিলেত যাওয়া নিয়েই মেতে রয়েচে! কিন্তু উহুঁ, তা'তো নয়ই, এ যে যথেষ্ট এগিয়েও গেছে! আচ্ছা থাক চাঁদ, তোমার পেটের এ খবর যদি না বের কর্‌তে পারি ত়া' হলে আমার এই নামটাই বদ্‌লে নেব!"

তার পর মুখ ফুটিয়া কহিল, "খুব তো খেয়েচ, এখন রেকাবটা নিতে দাও।"

নরেশ জলের গেলাসটা তুলিয়া লইয়া এক চুমুকে সবটা জল নিঃশেষে পান করিয়া কহিল, "আচ্ছা বৌদি', তুমি বাপের বাড়ী কত দিন যাওনি ?"

সুস্নাতা একটু হাসিয়া কহিল, "কেন, তা জিজ্ঞেস্ করচ কেন ?"

নরেশ বলিল, "না, এই অম্‌নি জিজ্ঞেস্ কর্‌লাম! কেমন করে যে ছেলেবেলার সব স্মৃতি ভুলে যাও, তাই অনেক সময়ে ভাবি! কত দিন পাঠিয়ে দিতে গেলেও তুমি যেতে চাও নি—এ কেমন করে পার বৌদি' ?"

নরেশের কথা শুনিয়া সুস্নাতার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছিল, তবু সে হাসিয়া কহিল, "তোমাদের সব ভারই যে আমরা নিয়ে বসি ভাই; তাই, ফেলে রেখে চলে গেলে কতই অসুবিধে তোমাদের হবে, সেই কথাটাই আগে মনে পড়ে যায়! ঘর সংসারের সব ব্যাপারেই তোমাদের অক্ষম পুরুষজাতটা যে কতই অপটু, তা' জান্‌তে এই, মেয়েমানুষগুলোর তো একটুও দেরী হয় না! বাপের বাড়ীর সব স্মৃতি পিছনে রেখে এরা ঘোম্‌টা টেনে এসে পৌঁছেই ও অক্ষম জাতটার সব খবরই টের পেয়ে যায় যে! এরা তেমন বেশী করে বাপের বাড়ী গেলে একেবারে সবই যে অচল হয়ে ওঠে! শুধু তোমাদের উপর দয়া করেই তো মেয়েমানুষের আর বাপের বাড়ী যাওয়ার নাম করা ঘটে ওঠে না,—বুঝ্‌লে ত! নইলে ঠাকুরপো, নাড়ীর টান, সে তো রক্তমাংসের সঙ্গে জড়িয়েই রয়েছে; সে কি যায় কোনো দিন ?—যায় না ত!"—বলিয়াই হাসিতে হাসিতে রেকাবী ও গেলাস তুলিয়া লইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল!

নরেশ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল !

হাসি ও ব্যঙ্গের ভিতর দিয়া কি নিষ্ঠ প্রেমে পরিপূর্ণ নারী হৃদয়ের চিত্রই সুস্নাতা তাহাকে আঁকিয়া দেখাইয়া গেল !

দুপুরে অনেকবার ওবাড়ীতে যাওয়ার ইচ্ছা হইলেও নরেশ যাইতে পারিল না ! শুধু তাহার পড়িবার ঘরটার পশ্চিমের দিককার জানালাটা খুলিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হাতে একখানা ইংরাজি নভেল ছিল। কিন্তু বইটার পাতায় মনোযোগ করিবার মত মনের অবস্থা আজ আর তাহার ছিল না।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই আর কোনও দিকেই না চাহিয়া নরেশ যখন এ বাড়ীতে আসিয়া পা দিল, তখন কল্যাণী নিত্যকার মতই বারান্দার উপর অশ্রুর জন্য জল গামছা ইত্যাদি গুছাইয়া রাখিয়া ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিতে যাইতেছিল। হঠাৎ নরেশকে দেখিয়া একটু থম্‌কিয়া দাঁড়াইল ; বোধ হয় মনে করিয়াছিল, নরেশ কিছু বলিবে। কিন্তু নরেশ যখন কোনও কথাই না বলিয়া অশ্রুর পড়িবার ঘরের দিকে গেল, তখন সে একটী ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া ঠাকুর ঘরের দিকে চলিয়া গেল।

আঁচলটা তুলিয়া গলায় জড়াইয়া সে যখন ঠাকুরের সম্মুখে প্রণাম করিল, তখন তাহার চোখের পাতা নিতান্ত অকারণেই ভিজিয়া উঠিতেছিল।

নরেশ তখন ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া মানদাসুন্দরীর সহিত কি কথা বলিতেছিল। কল্যাণী প্রদীপটা জ্বালিয়া আরতির আয়োজন করিয়া দুয়ারের আড়ালেই আসিয়া চুপ করিয়া অন্যমনস্ক ভাবে দাঁড়াইয়া

নরেশ কখন যে চলিয়া গেল সে খবরটা না পৌছিতেই, মার ডাকটা তাহার কানে আসিল। সে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিতেই মানদা

সুন্দরী কহিলেন, "ওখানে এতবেলা কি করছিলিরে পাগ্‌লি ; নরেশ এসে গেল, তোর পড়া ত আজ আর দেখে নিলিনে !"

"ও থাক্, কাল দেখে নেব'খন !" বলিয়া ফিরিতেই দেখিল, অশ্রুময় আসিয়াছে।

অশ্রুময় কহিল, "মা, আমি নরেশদের বাড়ী হয়ে এলাম। তাকে বাড়ীতে পেলাম না ত ! কিন্তু একটা খবর জেনে এলাম মা, ওর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, এই অগ্রহায়ণেই হবে।"

মানদাসুন্দরীর বুকের মধ্যে যেন অতর্কিত আঘাত লাগিল। দারুণ বিস্ময়ে কারণ খুঁজিতে যাইয়া তাঁহার মনে হইল, ভিতরে ভিতরে এই খবরটাকে তিনি মোটেই চাহেন নাই। এবং কখন যে তাঁহার মনটার মধ্যে একটা অত্যন্ত অসম্ভব রকমের আশা অলক্ষ্যে পুষ্ট হইয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা আজই এই খবরটা পাইয়া বিশেষ করিয়া চোখে পড়িয়া গেল।

উৎসাহশূন্য কণ্ঠে বলিলেন, "কই আগে তো কিছু শুনি নি,—"

হাত মুখ ধুইতে ধুইতে অশ্রুময় কহিল, "না মা, আমাকেও তো কিছুই বলেনি।—"

কল্যাণী চলিয়া গিয়াছিল। অন্ধকারে হাত বাড়াইয়া সে তাহার পড়িবার ঘরের ক্ষুদ্র শয্যাখানি খুঁজিয়া লইল এবং একলাটী সেই বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া নিমেষহীন চোখে খোলা জানালার পথ দিয়া নক্ষত্র-বিরল আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার দুই চোখ যখন জ্বালা করিয়া উঠিল তখন সে উঠিয়া গেল এবং পূজার ঘরে মানদাসুন্দরী যেখানে মালা জপ করিতেছিলেন, সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া মার বুকের মধ্যে কিছুক্ষণ 'উস্‌খুস্' করিয়া

কল্যাণী ঘুমাইয়া পড়িল। মানদা সুন্দরী এতক্ষণ তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন, এখন মৃদুস্বরে একবার ডাকিলেন, "কল্যাণী—"

কোনও উত্তর না পাইয়া আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "অশ্রু, ঘুমুলি ?—"

"ঘুমাইনি ত, মা ! কেন ?"

"না, এমন কিছু নয়," বলিয়াই কল্যাণীর চুলের মধ্যে অঙ্গুলি গুলি একটু দ্রুত বুলাইতে লাগিলেন ; তার পর হঠাৎ কিছু মনে পড়িলে মানুষ যেমন ভাবে কথা বলে, তেমনি ভাবে কহিলেন, "ভাল কথা, ওর বিয়ে যে ঠিক্ হয়ে গেছে, কার কাছে শুনে এলি ?"

ঠিক এই সব কথাই অশ্রুময়ের মনের মধ্যে এতক্ষণ সাড়া দিয়া ফিরিতেছিল। এখন মার মুখ হইতে শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "বউদিদির কাছেই শুন্‌লাম, আর বাড়ী ঘর মেরামতের ধূম লেগে গেছে, তা' তো চোখেই দেখে এলাম, মা !—"

"কিন্তু তখন বল্‌ছিলি না যে, নরেশ তোকেও এ সব কথা কিছু বলে নি ?—"

"কিছুই বলে নি তো,—আমি এতক্ষণ তাই ভাব্‌ছিলাম মা, ও এমন করে চেপে গেল কেন ?"

মানদাসুন্দরী আর কোনও কথা না বলিয়া কল্যাণীকে বুকের মধ্যে টানিয়া আনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন !

প্রায় পনের মিনিট্ পরে অশ্রুর ডাক শুনিয়া কহিলেন, "কিরে, তুই ঘুমাস্‌নি এখনো ?"

"তুমিও তো ঘুমাওনি মা" ; তার পর গলার স্বর খাটো করিয়া কহিল, "এত দিন কি পাগলের মতই ভেবেচি যে, কল্যাণীকে, মা, ওর হাতেই দেবে ! এখন মনে হচ্ছে এমন একটা অসম্ভব

কল্পনা কেনই বা মাথায় আস্‌ত!—" বলিয়াই অশ্রুময় একটু হাসিল।

অশ্রুময়ের কথা শুনিয়া মানদাসুন্দরী বুঝিলেন, মনের কোথায় একটা গূঢ় বেদনা অতি সন্তর্পণে মাথা তুলিয়াই রহিয়াছে, আজ তাহাকে আর বাড়িতে না দেওয়াই ঠিক্! তাই জোর করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সত্যিই ত! এমন একটা কথা তোর মাথায় উঠ্‌লই বা কেন?—অমন ছেলে, তা'ছাড়া ওদের রাজার সংসার, ওদের মত ধনীর ঘরে কাজ না ক'রে তোর ঘরে কর্‌বেই বা কেন রে, পাগল।"—

"তা' হ'ক্; আমার এই কল্যাণী বোন্‌টীও তো কোনও রাজার ঘরেই অশোভন হয় না, মা!"—

মানদাসুন্দরী আর একটী কথাও বলিলেন না। তাঁহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিতেছিল।

কথার আরম্ভেই কল্যাণীর তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল; এখন অতি সন্তর্পণে একটী ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া সে পূর্ব্বের মতই নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

শরশয্যায় পড়িয়া যতই তত্ত্বকথা ভীষ্মদেব বলুন না কেন, তাঁহার যে খুবই অসুবিধা হইয়াছিল, এ কথা হলফ্ করিয়া বলা যায়। কিন্তু তবু তাঁহার তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য ফাল্গুনী উপস্থিত ছিলেন এবং কুরুকুলের এই পিতামহ দেবটী অম্লানবদনে দুর্য্যোধনের স্বর্ণঝারির পানীয় উপেক্ষা করিয়া অর্জ্জুনের তীরের ফলার পম্প করা তোলাজল পান করিয়াছিলেন এবং তাহাতে তাঁহার তৃষ্ণাও নাকি মিটিয়াছিল।

রেঙ্গুণে আসিয়া শৈলেশ তাহার নিজের চারিদিকে এমন একটী ব্যূহ রচনা করিয়া তুলিয়াছিল, যে ব্যূহটী ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিবার সম্ভাবনা তো তাহার ছিলই না, বেশীর ভাগে ভীষ্মের মত তাহার ইচ্ছামৃত্যুর বর পাওয়া না থাকাতে, সেই ব্যূহের মধ্যেই শরশয্যা রচনা করিয়া বাকী জীবনটা কাটাইয়া দেওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর ছিল না!

কিন্তু অর্জ্জুনের মত তীরের ফলায় জল তুলিয়া তৃষ্ণা মিটাইয়া দিবার কেহ না থাকাতে, আকণ্ঠ তৃষ্ণা লইয়াই তাহাকে পড়িয়া থাকিতে হইল; অদৃষ্টের এমনি উপহাস, যে, দেবতার আগাইয়া দেওয়া স্বর্ণঝারির পানীয়ে তৃষ্ণা মিটাইবার মত সাহসও তাহার হইল না।

ইংরাজিতে একটা কথা আছে, "যেমন বীজ বপন করিবে, ঠিক তেমনি শস্য কর্ত্তন করিবে," এই কথাটা যে কত বড় একটা অভ্রান্ত সত্য, তাহা দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষই নিজের কৃতকার্য্যের ফল ভোগ করিতে আরম্ভ করিলেই ঠিক করিয়া বুঝিতে পারে। এবং এই নিষ্ঠুর সত্যকে অনুভব করে নাই এমন মানুষ ত বোধ হয় নাই।

সুদূর বাঙ্গালার স্নেহনীড় ছাড়িয়া আসিবার কালে শৈলেশ নিজেই

ইচ্ছা করিয়া দুই হাতে সমস্ত বাধা বন্ধনই ছিন্ন করিয়া আসিয়াছে, তখনও এ কথাটা তাহার কাছে নিষ্ঠুর উলঙ্গমূর্ত্তিতে দেখা দেয় নাই। তখনও এই সরিৎসাগর ভূধরের দুস্তর ব্যবধান সমস্ত তুচ্ছ অপরাধগুলির উপর বিস্মৃতির প্রলেপ লেপিয়া দিয়া যাহা দারুণ ছিল, তাহাকে করুণ করিয়া তুলে নাই। যাহা আঘাতেরই ইতিহাস ছিল, তাহাকে ব্যথার কাহিনীতে পরিণত করে নাই !

চিত্তের ঠিক এমনি অবস্থায়, একটী অসহায়া তরুণী তাহার শঙ্কা-ব্যাকুল দুই চোখের কাতর দৃষ্টির মধ্যে একটী করুণ কাহিনী লইয়া একেবারেই অপরিত্যাজ্যরূপে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল !

তখন প্রথম উদ্দাম যৌবনের দারুণ ক্ষুধা ছিল, রূপপিপাসুর অফুরন্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল, সর্ব্বোপরি একটী অসহায়া সুন্দরীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়রূপে নিজেকে স্থাপন করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় ভালমন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা লোপ পাইয়াছিল !

অদৃশ্য দেবতাটি বাঙ্গালার সুদূর পল্লী হইতে এই উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির যুবকটীকে টানিয়া আনিয়া এখানে পৌঁছাইয়া দিয়াই ক্ষান্ত তো রহি-লেনই না, সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনগতিকে একেবারে এমন একটী বক্রপথে তুলিয়া দিয়া গেলেন যে, বক্র পথটী ধরিয়া তাহার কত কালই যে চলিতে হইবে তাহাও একেবারেই অনির্দ্দিষ্ট রহিয়া গেল।

মলিনার বাবা তারাপদ মুখুয্যে রেঙ্গুণের একজন বিখ্যাত উকীল ছিলেন বলিলেই তাঁহার পরিচয় সম্পূর্ণ দেওয়া হইবে না। দেশে তাঁহার একটা ভিটা ছিল, কিন্তু সে ভিটা দাবী করিবার মত আপনার জন কেহই ছিল না। ঠিক্ দুই বৎসর পূর্ব্বে মলিনার মার মৃত্যু হওয়ার পরই ওকালতী বন্ধ করিয়াছিলেন। সংসারে কোনও বন্ধনই ছিল না; শুধু এই একটি মাত্র মেয়ে মলিনা। রেঙ্গুণের সঙ্গে স্বর্গগতা পত্নীর

বহুস্মৃতি জড়িত ছিল, তাই মায়া কাটাইয়া দেশে ফিরিবার কল্পনা করিতেই বছর দুই কাটিয়া গেল।

ইচ্ছা ছিল, কলিকাতায় গিয়া মলিনাকে সৎপাত্রস্থা করিয়া কাশী-ধামে বা অন্য কোনও তীর্থে জীবনের বাকী দিনগুলা কাটাইয়া দিবেন।

কিন্তু রেঙ্গুণ যেমন তাহাকে ধনসম্পদ অনেক দিয়াছিল, তেমনি রেঙ্গুণের মাটি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছিল। ইরাবতীর তীরে একটা বিশেষ স্থানেই যে তাঁহার জীবন মধ্যাহ্নের সমস্ত আশা-আনন্দ ছাইয়ের মুঠিতে পরিণত করিয়া দিয়াছেন, এ কথাটা মুহূর্ত্তের জন্যও ভুলিতে পারিলেন না।

কিন্তু হঠাৎ এমন একটা দিন আসিয়া বসিল, যে দিন দেখা গেল, রেঙ্গুণের মাটি ব্যথা দিয়া থাকিলেও ব্যথা বুঝিয়াছে; এবং সকল ব্যথা হরণ করিয়া লইবার জন্যই দুই বাহু বাড়াইয়া দিয়াছে!

তারাপদ শৈলেশের পিতার বাল্যবন্ধু ছিলেন; রেঙ্গুণে আসিয়া শৈলেশ পিতৃবন্ধুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিল।

এক দিন,—সে দিন জ্যোৎস্নায় দিগ্‌বিদিক্ ভাসিয়া যাইতেছিল; কেহ আসিয়া নিদ্রাতুর শৈলেশকে তাহার ঘর হইতে ডাকিয়া লইয়া গেল। ঘুমের চোখে তারাপদর ঘরে ঢুকিয়াই শৈলেশ দেখিল, উজ্জ্বল আলোক জ্বলিয়া জ্বলিয়া স্তিমিত হইয়া আসিতেছে, তবু সেই আলোকে তারাপদর মরণাহত মুখের উপরকার পাণ্ডুর ছায়া সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মলিনা শিয়রেই বসিয়াছিল। শৈলেশ আসিয়া দাঁড়াইতেই তারাপদর দুইচোখের আবিল দৃষ্টি তাহার মুখের উপর প্রায় স্থির হইয়া আসিল। মরণাহতের শেষ চেষ্টায় তিনি তাহাকে কাছে ডাকিলেন।

মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া শৈলেশ কহিল, "কিছু বল্‌লেন আমাকে কাকাবাবু?"

মুখ একটু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; মৃত্যুর ঠিক্ পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে মানুষ যেমন চরম উইলের কাগজখানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কোনও মতে ভাঙ্গাচোরা অক্ষর টানিয়া তাহার একটা সহি রাখিয়াই শেষ নিশ্বাস ফেলে, তেমনি এই মুহূর্ত্তে তারাপদ মলিনার নিস্পন্দ হাতখানা কোনও মতে শৈলেশের হাতের উপর রাখিয়া প্রাণপণে বলিয়া উঠিলেন, "তুমি আমার বন্ধুর ছেলে শৈলেশ, মলিনাকে তোমার হাতেই দিয়ে যাচ্ছি, এ আমার শেষ মুহূর্ত্তের দান, এ দানকে অস্বীকার করে অপমান ক'র না বাবা !"

"এ আপনি কি কর্‌লেন !" শৈলেশের এই আর্ত্ত চীৎকার শেষ হইবার পূর্ব্বেই তারাপদর মুখের উপর তাহার চোখ পড়িল। শৈলেশ দেখিল, জীবনের শেষ স্ফুলিঙ্গটুকু নিভিয়া গিয়াছে, শুধু একটু তৃপ্তির চিহ্ন তখনও প্রশান্ত মুখের উপর লাগিয়া রহিয়াছে।

মলিনার মুখের দিকে চোখ্ তুলিয়া চাহিয়া শৈলেশের মনে হইল, ঠিক্ এই মাত্রই যেন একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া সে নিদ্রাজড়িত চোখে একেবারে বিছানার উপরে উঠিয়া বসিয়াছে ; কি যে ঠিক্ তাহার প্রকৃত অবস্থা তাহা বুঝিবার ক্ষমতা তখনও ফিরিয়া আইসে নাই।

একটু পরেই যখন মলিনা বাপের বুকের উপর লুঠাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, অদৃষ্টের এমনি উপহাস, তখন হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিবার মত লোকও ঐ শৈলেশ ছাড়া আর কেহই ছিল না। এবং শৈলেশকে সে অধিকারটুকুও তাহার বাবাই যে শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে দিয়া গিয়াছেন, মলিনারও তাহা বুঝিতে ভুল করিবার কিছুই ছিল না।

আজ হঠাৎ জীবনের হিসাব বুঝাইয়া দিবার মুহূর্ত্তে অত্যন্ত আদরিণী মেয়েটাকে যে একটা আশ্রয় দিয়া যাইতে পারিলেন এ কথা মনে করিয়া

বোধ হয় তিনি সত্যই সান্ত্বনা পাইয়াছিলেন। কারণ মেয়ে যত আদরেরই হউক, তাহার যে তিনকুলে কেহই ছিল না, এ কথাটা অহর্নিশি তাঁহার মনের মধ্যে জাগিয়াই ছিল। কিন্তু রেঙ্গুনের মাটি তো তাঁহাকে এমন অবসর দেয় নাই, যাহাতে কিছু একটা বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারেন!

সারারাত কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়া মলিনা যখন পর দিন ভোরের দিকে তাহার ঘরের মধ্যে একলাটী পড়িয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল, তখন শৈলেশ ঝিকে দিয়া খবর পাঠাইল যে, সে তাহার সঙ্গে দেখা করিতে চাহে।

মলিনা গায়ের কাপড় ঠিক করিয়া লইয়া ঝির মুখে জানাইল, সে প্রস্তুত আছে। কিন্তু শৈলেশ আসিয়া দু'একটা সান্ত্বনার কথা বলিতে সে কাঁদিয়াই অস্থির হইল।

কিছু কাল চুপ করিয়া থাকিয়া শৈলেশ কহিল, "মানুষ যদি নিজের ভিতর থেকে সান্ত্বনা না পায়, তা' হ'লে তা'কে কেউই সান্ত্বনা দিতে পারে না। আজ তোমার নিজ থেকেই শান্ত হ'তে হবে; শোক জিনিষটা যত বড় নিষ্ঠুর মূর্ত্তিতেই দেখা দিক্ না, তাকে সহ্য করে নিতেই হবে। সহ্য না করে উপায়ও তো কিছু নেই, লক্ষ্মীটী!"—

তার পর আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "মনের এ অবস্থায় যদিও তোমাকে কিছু না বলাই ঠিক্, তবু কটা কথা না বল্‌লেই যে নয়! হাজার দুঃখ কষ্টের মধ্যেও মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য চিন্তাটা অনেক সময়ে বড় হয়ে ওঠে এবং তাকে উপেক্ষা করাও তো চলে না, মলিন্!"—বলিয়াই শৈলেশ মলিনার মুখের দিকে একবার চাহিয়া দেখিল।

মলিনা ঠিক্ একটী পুতুলের মতই আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া রহিয়াছে।

মনের উদ্বেগ মুখে চোকে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া বিচারকের মুখ হইতে দণ্ডাজ্ঞা শুনিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে অপরাধী যেমন অর্থশূন্য দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিয়াই বিচারকের মুখের উপরেই দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখে, ঠিক্ তেমনি ভাবে মলিনা শৈলেশের মুখের দিকে চাহিল।

মুখ ফিরাইয়া লইয়া শৈলেশ কহিল, "এর পর ঠিক্ কোন্ পথ ধর্‌বে তা' আমি জানিনে; কিন্তু তোমার স্বাধীন ইচ্ছার উপর কেউ হাত না দেয়, এই আমি সর্ব্ব প্রথমে চাইব," তার পর আরও মৃদুস্বরে কহিল, "কাকাবাবু যাবার সময়ে যে দু' একটা কথা বলে গেছেন, তার উপরেই তোমার ভবিষ্যৎ জীবনকে দাঁড় করাতেই হবে, তা' তুমি মনে না কর্‌লেও পার, মলিনা,।"—

কথাগুলি এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিয়া মলিনার মুখের দিকে চাহিয়াই একেবারে চুপ করিয়া গেল।

মলিনার দুইটী চক্ষু জলে ভরিয়া গিয়াছে; সমস্ত মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে; চোখের কোণে কোণে একটা বিপুল ব্যথার আভাস জাগিয়া উঠিয়াছে! দুই হাতে আঁচলের প্রান্তটা প্রাণপণে মুঠি করিয়া ধরিয়া একটিও কথা না বলিয়া একবার জলে ভরা চোখ্ দুইটা শৈলেশের মুখের উপর তুলিয়া ধরিয়াই মুখ নীচু করিয়া লইল।

একটুকাল নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঝিকে ডাকিয়া দিয়া শৈলেশ নিজের ঘরে চলিয়া আসিল।

ঠিক্ এই মুহূর্ত্তে তাহার বুকের ভিতর ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইতেছিল। একখানি অত্যন্ত ম্লান মুখের স্মৃতি অন্তরের কোথায় যেন দুর্দ্দিনের মেঘের ছিন্ন অবকাশের ভিতর দিয়া দীপ্তিহীন নক্ষত্রটীর মতই ম্লান ছায়া ফেলিতেছিল। যাহাকে সে উপেক্ষায় দুই পায়ে দলিয়া আসিয়াছে, সে

তাহার কাছে কোনও দিনই তো কিছু চাহে নাই। শুধু দুইটী শঙ্কা-জড়িত চোখের দৃষ্টি, একটী চিরন্তন ব্যথার কাহিনী লইয়া তাহার দিকে নিমেষহীন হইয়াই ফুটিয়াছিল।

আজ এই প্রভাতের উজ্জ্বল, শুভ্র আলোক যখন তাহার ঘরের মধ্যে ঠিকরিয়া পড়িয়া হাসিতেছিল, ঠিক্ তখনই তাহার আর এক দিনকার কথা মনে পড়িয়া গেল। প্রতিমা বলিয়াছিল, "মান দিতে পার আর না পার, অপমান কর্‌বে সেটা ত ঠিক নয়।"—ঠিক্ কথা!

কিন্তু অপমান জিনিষটাকে যে কত বড় করিয়াই দেওয়া যায়, তাহা বোধ হয় প্রতিমা তখন একবারটীও মনে করিতে পারে নাই।

আজ দুই হাতে নিজের কণ্ঠনালীটা টিপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল, ওরে নিষ্ঠুর প্রবঞ্চক, আজ অপমান করাই যে তোর সব চেয়ে বড় কাজ হয়ে উঠ্‌ল, এবং এ অপমানের সীমারেখাটীকেও যে তুই ক্রমাগতই বাড়িয়ে চল্‌লি!—

কিন্তু তবু দেবতার এ নিষ্ঠুর উপহাসের কাছে নিজেকে ধরিয়া দিবার জন্য ভিতরে ভিতরে উন্মুখ হইয়া উঠিল। এ যেন অমোঘ দণ্ডের মতই তাহার মাথার উপর উদ্যত রহিয়াছে। এর নীচে ইচ্ছায় হউক্, অনিচ্ছায় হউক্, মাথা পাতিয়া দিতেই হইবে!

আজ চোখের সম্মুখেই যে উজ্জ্বল রূপের শিখা জ্বলিয়া উঠিয়াছে, শৈলেশের মনে হইল, পতঙ্গের মত এই দীপ্ত শিখায় তাহাকে পুড়িয়া মরিতেই হইবে!

নীলকণ্ঠের হলাহল পাত্র নিঃশেষ করিয়া এ অমৃতবিন্দু দেবতা স্বয়ং তাহাকে উপহার দিতেছেন, সে মাথা পাতিয়া দিল, দুই হাত বাড়াইয়া দিল, এ যে তাহাকে গ্রহণ করিতেই হইবে, পান করিতেই হইবে!

অন্ধকার রাত্রিতে পথ চলিতে চলিতে রত্ন কুড়াইয়া পাইয়া লুব্ধ পথিক যেমন নিজের কাছেই পরম যত্নে লুকাইয়া রাখিয়া ধারণ করিতে চাহে, কিন্তু কিছুতেই সাহসে কুলায় না, এবং দারুণ অস্বস্তির মধ্যেই নিশিদিন কাটাইতে থাকে, তেমনি শৈলেশ এই তাহার কুড়াইয়া পাওয়া মাণিকটীকে লইয়া যে কি করিবে তাহাই ভাবিয়া অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। কণ্ঠে ধারণ করিবার সাহসও যেমন ছিল না, তেমনি এর কাছে জীবনের প্রচ্ছন্ন ইতিহাসটীকে খুলিয়া বলিয়া ফেলিয়া যাহাই হউক্ একটা কিছু মীমাংসায় পৌঁছিবার মত বুকের জোরও ছিল না।

তবু স্রোতের প্রথমবেগ সমতলক্ষেত্রের উপর নামিয়া আসিবার পূর্ব্বে যেমন কোনও বাধাকেই বাধা বলিয়া গ্রাহ্য করে না, তেমনি মলিনা দেবতার অযাচিত দানরূপে যখন তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন শৈলেশ প্রথম উচ্ছ্বাসের মুখে লুব্ধের মতই মনে করিল, এমনি করিয়া দিন কাটিয়া যাইবে; মলিনা তাহার কোমল দুইখানি হাত দিয়া যে নন্দন রচনা করিয়া তুলিবে তাহারই ছন্দে, গন্ধে, বর্ণে, নিজেকে ডুবাইয়া রাখিয়া অতীত জীবনের ব্যথা, বেদনা সবই ভুলিবে!

কিন্তু মানুষের সব চেয়ে বড় ভুল এই যে, সে জানে না যে বিশ্বের ভাঙ্গাগড়া তাহার কল্পনা বা কার্য্যের উপর একেবারেই নির্ভর করে না।—এমন কি তাহার নিজের জীবনের ছোট বড়, নগণ্য কাজগুলি পর্য্যন্ত না।

সে যখন মনে করে গড়িতেছে, তখন ভাঙ্গা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; আবার মানুষ যখন ভাঙ্গিতেছে মনে করে, ঠিক্ তখনই বিশ্বের বিচিত্র খেয়ালী কারিগরটী গড়িয়া তুলেন।

শৈলেশ যখন মনে মনে গড়িতেছিল, তখন ভাঙ্গা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে! ভিতরে ভিতরে তখন ছন্দের গোল বাধিয়াছে; সুর বাঁধা বীণ বেসুরা বাজিতে আরম্ভ করিয়াছে!

সে দিনকার নিবিড় সন্ধ্যায় যখন বুকের মাঝে নিশ্বাসটা পর্য্যন্ত জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছিল, ঠিক্ তখনই শৈলেশের মনে হইল, এমন করিয়া চলিতে পারে না। উর্ণনাভের মতই মস্ত একটা ফাঁকির জাল পাতিয়া ইহাকে ধরিতে গেলে নিজেকে তো জড়াইতে হইবেই, কিন্তু তাহাতে লাভ বেশী কি লোকসান বেশী সে কথাটা একবারও তাহার মনে না উঠিলেও, শৈলেশ এটুকু জানিত, যে এই পথে সুখের চেয়ে অস্বস্তির ভাগ অনেক পরিমাণে বেশী।

আর কোনও কারণে না হইলেও শুধু ঐ একটী কারণেই সে ভাঙ্গন্ কূলের কাছে আসিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল, ঠিক চোখের সম্মুখেই নির্ম্মল শীতল পানীয় বুকে লইয়া যে স্রোতস্বিনীটি উচ্ছ্বলিত রূপ তরঙ্গে ছুটিয়া চলিয়াছে, শৈলেশ জানিত, সকল বাধা বন্ধন ছিন্ন করিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিলেই ওর বুকে তাহার তৃষ্ণা মিটাইবার মত অনন্ত সুধার ভাণ্ডার রহিয়াছে।

কিন্তু দুর্ব্বল চিত্তের লক্ষণই এই যে, তাহারা না পারে জোর করিয়া কিছু ভোগ দখল করিতে, না পারে সব ঝাড়িয়া ফেলিয়া নিজেকে ক্ষুদ্র স্বার্থ হইতে বিযুক্ত করিয়া লইতে। ভোগ করিবার উগ্র আনন্দও যেমন ইহারা পায় না তেমনি ত্যাগ করিবার নির্ম্মল চিত্তপ্রসাদও ইহাদের অদৃষ্টে জুটে না!

শৈলেশও ঠিক্ এই প্রকৃতির লোকই ছিল। তাহার দুর্ব্বল অন্তর যেমন তাহাকে পীড়িতও করিতেছিল, তেমনি তাহার পিপাসু চিত্ত রূপের নেশায় মাতাল হইয়া উঠিয়াছিল।

একই লোকের পক্ষে যে "শ্যাম ও কুল" উভয়ই রক্ষা করা একেবারেই সম্ভব নহে; এটা সে বেশ করিয়াই জানিত। তাই আজ হঠাৎ চিত্তের সমস্ত দুর্ব্বলতাকে সবলে ঝারিয়া ফেলিয়া দিয়া, স্থির করিল, মলিনাকেই তাহার চাইই, এবং তাহাকে পাওয়ার জন্য সে সকল বাধা বিঘ্নকেই উপেক্ষা করিবে।

কিন্তু ঘরের বাহিরে দাঁড়াইতেই সর্ব্বপ্রথমেই নক্ষত্রখচিত আকাশের খানিকটা তাহার চোখে পড়িয়া গেল; খোলা মাঠের দিক্ হইতে শীতল বাতাস বহিয়া আসিয়া তাহার মুখে লাগিয়া, ঘরের মধ্যের এতক্ষণের উত্তেজনার ভাবটাকে কতকটা শান্ত করিয়াও দিয়া গেল। মলিনার ঘরে আলো জ্বলিতেছিল, তাহার রশ্মি জানালার অবকাশ দিয়া বাহিরের বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে! একবার সেই দিকে চাহিয়াই শৈলেশের মনে হইল, ও ঘরের দিকে চোখ্ তুলিয়া চাহিবার অধিকারও তাহার যেমন নাই, তেমনি চিত্তের এই দুর্ব্বলতাকে আর বাড়িতে দেওয়াও তাহার পক্ষে ঠিক্ নহে! তাহার নিজের জীবনের যে একটা বিশ্রী প্রচ্ছন্ন ইতিহাস আছে, সেটাকে গোপন রাখিয়া মলিনার সঙ্গে একবাড়ীতে থাকাও একেবারেই ভদ্রতার নিয়মের বাহিরে!

শৈলেশের মাথার ভিতরে দপ্ দপ্ করিতেছিল, বাঁ হাতে কপালের পাশটা টিপিয়া ধরিয়া রেলিংএর উপরেই বুক রাখিয়া অনেকক্ষণ দূরের অস্পষ্ট বাড়ীগুলির দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

সহরের মিশ্র কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছিল, অদূরে বড় রাস্তার উপরকার লোকজনের আনাগোনা, কর্ম্মব্যস্ততা চোখে পড়িতেছিল। এ সব কিছুরই দিকে শৈলেশের দৃষ্টি ছিল না; বায়োস্কোপের ছবির মতই মনের ভিতরে তাহার গত জীবনের প্রত্যেকটা ছোট বড় ব্যাপার

নিঃশব্দে আসা যাওয়া করিতেছিল। একটা রসশূন্য মরুর মধ্যে স্বেচ্ছায় নিজেকে টানিয়া আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। কোথায় ইহার শেষ, শুধু এই প্রশ্নটাই ঘুরিয়া ফিরিয়া মনের মধ্যে দাগ কাটিয়া কাটিয়া যাইতেছিল! ক্লান্তিতে, অবসাদে সমস্ত চিত্ত ভরিয়া উঠিতেছিল, রেলিংএর উপর উত্তপ্ত মাথাটা রাখিতেই তাহার দুই চোখ্ জলে ভরিয়া উঠিল! কিন্তু এমন পাষাণপ্রকৃতির মানুষের চোখেও জল আসিতে পারে ইহা মনে করিয়া তাহার নিজেরই বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

পায়ের শব্দে হঠাৎ মুখ তুলিয়া চাহিতেই ঝি কহিল, "দাদা বাবু, আপনার চা' ঘরে রেখে এলাম যে।" শৈলেশ গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া "চা খাব না, আজ আর," বলিয়াই একটুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "তোমার দিদিমণির কাছে জেনে এস ত ঝি, এখুনি দেখা কর্‌তে তাঁর কোনও অসুবিধা আছে কি না; কটা দরকারী কথা বল্‌বার আছে।"

ঝি চলিয়া যাইতেছে, শৈলেশের মনে হইল, আজ্‌কার ঠিক্ এই মুহূর্ত্তেই দেখা করিতে না চাহিয়া অন্য কোনও দিন দেখা করিলেই ভাল হইত! একটা বিশ্রী তিক্ততায় মনটা ভরিয়া গেল, এমন সময়ে ঝি আসিয়া বলিল, "আসুন, দাদাবাবু!"

দু'দিন বাদেই এই দুইটির সম্পর্ক কি দাঁড়াইবে তাহা এ বাড়ীর ঝি চাকরেরাও নিঃসন্দেহ জানিয়াছিল। ঝি একটু মৃদু হাসিয়া, "দিদিমণি, ও ঘর থেকে চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে আস্‌চি গো" বলিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মলিনা রক্তিম মুখে বাঁ হাতের আঙ্গুল গুলিতে আঁচলের প্রান্তটা জড়াইতে জড়াইতে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

কোন কথা না বলিয়া এমনিভাবে দুইটী প্রাণীর পক্ষে দাঁড়াইয়া

থাকা একেবারেই অসম্ভব, বিশেষ শৈলেশের চিত্তের অবস্থা যখন মলিনার মনের গতির সঙ্গে একেবারেই অনুরূপ ছিল না।

শৈলেশ একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "তোমার শরীর ভাল নেই তো মলিন্! মুখ চোখ যে একেবারে ভারি বিশ্রী হয়ে গেছে,"—

কথাটার মধ্যে অনেকখানি সত্যতা ছিল। সান্ত্বনা দিতে আসিয়া শৈলেশ প্রথম দিনেই যে কয়েকটা কথা বলিয়াছিল, মলিনা এত দিন পর্য্যন্ত তাহাই মনের মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানা প্রকারে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে! শৈলেশ যে মলিনাকে তাহার বাপের শেষ ইচ্ছার বন্ধন হইতেও মুক্তি দিতে চাহিয়াছিল, এ কথাটা সে কোনও ক্রমেই ভুলিতে পারে নাই। মলিনার কাছে তাহার বাবার শেষ আদেশ, শুধু শেষ আদেশ বলিয়াই যে কত বড় হইয়া উঠিতে পারে, তাহা কি শৈলেশ বুঝে না?

শুধু তাহাই তো নহে; মৃত্যুর স্পর্শে যখন পৃথিবীর আলো তারাপদর চোখে নিভিয়া আসিতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্ত্তটিতেই তো তিনি মলিনাকে হাতে ধরিয়া শৈলেশের হাতে সম্প্রদান করিয়া গিয়াছেন ।
সে সম্প্রদানের সাক্ষী স্বয়ং মৃত্যু; সুতরাং এ বন্ধন ছিন্ন ...দেরও
অধিকার যেমন তাহারও নাই, তেমন শৈলেশেরও নাই ...নও দিনই
কায়মনোবাক্যে জানিয়াছিল, শৈলেশের সঙ্গে তাহার ... দেখিবার পূর্ব্বেই
গিয়াছে। লৌকিক হিসাবে দুই চারিটা বাঁধা মন্ত্র উচ্চা... আসিয়া গিয়াছে,
ছিল। সে টুকুও যে কোনও শুভ মুহূর্ত্তে শেষ করিয়া ... বিপুল চেষ্টা মাত্র,
বাধাও তো ছিল না। ...া নহে!

মনের ঠিক্ এমনি অবস্থায় শৈলেশের সেই প্রথ... চ পারিল না। তার
বিশ্লেষণ করিতে গিয়া হঠাৎ মলিনার মনে হইল যে, ...া বিশেষ করে কোনও
টাকে শুধু নিজের দিক্ হইতেই বিচার করিয়াছে,

বর দিয়াছেন কি না জানিনে, তবে এইটুকু জানি, নিজের শরীরকে উপেক্ষা কর্‌বার অধিকার কারুরই নেই, মেয়ে মানুষেরও না”—

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া শৈলেশ এই মনে করিয়া নিজেই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া উঠিল, যে এমন সব কথা আজ তাহার মুখ দিয়াও বাহির হইল! ঠিক এই মেয়েমানুষ জাতটার অস্তিত্বকেও সে এক দিন স্বীকার করিতে চাহে নাই!

তাহার মুখ হইতে এমন একটা কথা পাইলে যে জাতেরই একজন কৃতার্থ হইয়া যাইত, আজ সেই জাতেরই আর একজনের সঙ্গেই মানুষের কি সাধারণ অধিকার আছে না আছে, তাহাই বিচার করিতে বসিয়া গিয়াছে। তবু এ সব কথা শৈলেশের নিকট হইতে পাইবার তাহার যতখানি অধিকার ছিল, ইহার তাহাও নাই!

মলিনা একটু হাসিয়া কহিল, “বর যারা নিয়ে এসেছে, তারাই সে খবরটা ভাল রাখে। তোমরা না জান্‌লেও কোনও ক্ষতি আছে বলে মনে হয় না। সাধারণ নিয়মের বাহিরে ঢের ব্যতিক্রমও তো থাক্‌তে দেখা যায়,—যায় না কি? মেয়ে মানুষগুলোও সেই সাধারণ নিয়মের বাইরে”—বলিয়াই মলিনা তাড়াতাড়ি টেবিলের দিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল, “ভাল কথা, আজ্‌কার ডাকে একটা চিঠি এসেচে, পাঠিয়ে দিতে ভুলে গিয়াছিলাম।”

চিঠিখানা টেবিলের উপর দিয়াই শৈলেশের দিকে সরাইয়া দিতে দিতে কহিল, “কল্‌কাতার মোহর রয়েছে, সেখানকার বন্ধুবান্ধব কেউ লিখে থাক্‌বেন হয় তো।”

উপরের হাতের লেখাটার দিকে চাহিয়াই শৈলেশ বুঝিল, সে চিঠিখানা কাহার।

হঠাৎ পথের মাঝখানে বহু দিনের পরিত্যক্ত আপনার জনকে দেখিলে,

মানুষ যেমন অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে, না পারে সপ্রতিভভাবে কথা বলিতে, না পারে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে, শৈলেশের অবস্থাটাও কতকটা ঠিক্ তেমনি হইয়া উঠিল।

চিঠিখানা হাতে ধরিয়া তুলিয়া লইবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত লোপ পাইয়া গিয়াছিল, কিছুক্ষণ আড়ষ্টের মতই দাঁড়াইয়া থাকিয়া শৈলেশ যখন চোখ্ তুলিয়া মলিনার দিকে চাহিল, তখন তাহার মুখখানা একেবারেই বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে!

মলিনা ভয় পাইয়া কহিল, "ওকি, মুখের চেহারা অমন হয়ে গেল যে? কিছু মন্দ খবর নেই তো?" পর মুহূর্ত্তে চিঠিখানার উপর চোখ্ বুলাইয়া লইতে লইতে "কই, না, চিঠি তো ঠিক তেমনিই পড়ে রয়েচে,—খোলাও নাই তো শৈলেশদা;—তবে কি হ'ল?"—বলিয়াই উদ্বিগ্নমুখে একেবারে শৈলেশের কাছে সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল!

শৈলেশ বলিল, "ও কিছু নয়, মলিনা! দুনিয়ার এক একটা মানুষ ভয়ানক রকম অদ্ভুত থাকে, তারা তাদের জন্মের দিন থেকেই সোজাপথে কখনই চলে না। যে পথ বাঁকা, যে পথে কাঁটাবন, পা' ছড়ে গেলেও সেই পথেই যাবে; তাদের সঙ্গে দুনিয়ার কারু বনিবনাও তো হয়ই না, তাদের কাজই হচ্ছে শুধু ব্যথা দিয়ে যাওয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে হয় তো নিজেও ব্যথা পাওয়া। কিন্তু আবার এমনি মজা, সে যে ব্যথা পায় তা' কাউকে বল্‌তেও চায় না এবং কেউ তা বিশ্বাসও করে না। আমার মনে হয়, মলিনা, আমিও সেই দলের একজন; শুধু তাই নয়, আজ এই যার হাতের লেখা চিঠিটা দেখে এতটা চমকে গেছি, একেই এম্‌নি আঘাত দিয়েছি, যে, এর চিঠি পাবার কোনও অধিকারই রেখে আসিনি!—

শৈলেশ চুপ করিতেই মলিনা কহিল, "মানুষকে ব্যথা দেওয়াই

নাকি আবার মানুষের কাজ হ'তে পারে? ওসব কথা আমি মানিনে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু চিঠি না পড়েই এমন ভয় পেতে সত্যি আমি আর কাউকে দেখি নি।" বলিয়াই মলিনা হাসিতে লাগিল।

মলিনার হাসি তীক্ষ্ণ ছুরির মতই শৈলেশের বুকের মধ্যে চিরিয়া চিরিয়া যাইতে লাগিল।

চিঠিখানা হাতে তুলিয়া মুখ ফিরাইতে গিয়া দেওয়ালে টাঙ্গানো মলিনার বাবার ছবিখানার উপর চোখ পড়িতেই অত্যন্ত শিহরিয়া উঠিয়া, মলিন মুখে শৈলেশ কহিল, "না, শুধু তোমার নিজের মন দিয়ে ছনিয়াটাকে বিচার কর্‌লে তো চল্‌বে না ; বাইরের বিচিত্রতা তোমাদের কাছে এসে না পৌঁছিলেও তাকে মাঝে মাঝে চিন্‌তে হবে বই কি। ছনিয়ার মুখের উপর শুধু সোণালি রং দিয়েই যদি বিশ্বের ঠাকুরটী তাঁর তুলি গুটিয়ে নিতেন, মন্দ হ'ত না। কিন্তু তা' তো তিনি করেন নি'! এর উপর বিচিত্র রংই তিনি দিয়েছেন, এবং সে বিচিত্রতারও যে অন্ত নেই তাও অত্যন্ত ঠিক্! ভিতরে বাইরে মানুষ ঠিক্ এক নয়, এটা ছ'বার করে বল্‌বার দরকার হয় না, মলিনা! সে নিজেকেই অনেক সময়ে ঠিক্ করে চিন্‌তে পারে না, বাইরের আর একজন তাকে কেমন করে চিন্‌বে?"—বলিয়াই আর একবারও মলিনার মুখের দিকে না চাহিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

চলিয়া আসিতে আসিতে মনে মনে কহিল "অন্যায় তো যথেষ্টই করেচি, এর কাছে সব কথা গোপন রেখে বোঝা আর বাড়িয়ে তুল্‌ব না, এতে আমার অদৃষ্টে যা' থাকে হবে।"

মলিনা এ সব কথার অর্থ যে একেবারেই না বোঝে, এমন নহে, তবু সে আকাশ পাতাল ভাবিয়া স্থিরই করিতে পারিল না, যে তাহাকেই এ সব কথা বিশেষ করিয়া বলিবার উদ্দেশ্যই বা কি এবং ঐ

চিঠি খানার সঙ্গেই বা এ কথাগুলির কোথায় মিল থাকিতে পারে !

তবু একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কার উদ্বেগে তাহার বুকের মধ্যে একেবারে শুকাইয়া কাঠ হইয়া যাইতেছিল। কেন যে একটা কান্নার ঢেউ গলার কাছ পর্য্যন্ত ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, তাহার কারণ খুঁজিয়া না পাইলেও, এটা সে নিঃসন্দেহেই বুঝিল, কোথায় যেন এতটুকু মেঘ, বুকে করালীর অট্টহাসি ও প্রলয়ের ঝঞ্ঝা লইয়া, সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

মলিনা একবার তাহার বাবার ছবিখানার দিকে অশ্রুপূর্ণ চোখে চাহিল, তার পর ঘরের আলোটা নিভাইয়া দিয়া, অন্ধকারের মধ্যেই বিছানা খুঁজিয়া লইয়া শুইয়া পড়িল !

চিঠিখানা সতীশের।

মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা কাগজে লিখিয়া যদি বিচারক অপরাধীর হাতে দিয়া বলিয়া দেন, যে ঐ কাগজখানা তাহাকে পার্শ্বের ঘরে গিয়া পড়িতে হইবে, তাহা হইলে, আসামীর যে ভাবে চলিয়া যাওয়া সম্ভব, শৈলেশও ঠিক তেমনি ভাবে চিঠিখানা হাতে লইয়া তাহার ঘরে চলিয়া আসিল। কিন্তু চিঠিটা না পড়িয়াই টেবিলের উপর ফেলিয়া রাখিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িল।

বিদ্যুতের ঝলক চোখে লাগিবার পরই মানুষ ভিতরে ভিতরে দুর্দ্দিনের মেঘের গর্জ্জনটা শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিলেও যেমন তাহার বুকের মধ্যে কাঁপিতে থাকে, শৈলেশের অবস্থাটাও কতকটা তেমনি হইয়া উঠিয়াছিল।

আজ্‌কার এই অতর্কিত চিঠিটার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না; কিন্তু আশঙ্কায় বুক যতই কাঁপুক্ না কেন, এটা নিজের কাছেও অস্বীকার করিতে পারিল না যে, ঊষর ক্ষেত্রের উপর মেঘের স্নিগ্ধ বর্ষণের মতই, এই চিঠিখানার কয়েকটা ক্ষুদ্র অক্ষরের ভিতর দিয়াই একটি স্নেহের রসধারা তাহার দিকে বহিয়া আসিতেছে!

যে নিবিড় যোগকে সে একেবারেই উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছিল, তাহা এত দিন ফল্গুর অন্তঃসলিলা ধারাটীর মতই নিজের অস্তিত্বকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, এ খবরটা তাহার কাছে একটা বিপুল বিস্ময়ের মতই আসিয়া পৌঁছিল। এবং সব চেয়ে এই কথাটাই তাহার কাছে অত্যন্ত অদ্ভুত বলিয়া মনে হইল যে, তাহার নিজের মনটাও যেন ভিতরে ভিতরে

এমনি একটা কিছু যোগকে খুঁজিয়া পাইবার জন্য পূর্ব্ব হইতেই উন্মুখ হইয়া ছিল!

কিন্তু এমনি বিচিত্র এই মানুষের মন, যে এ কথাটা চিঠিখানা হাতের কাছে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বে তাহার নিজের কাছেও একবারটীও ধরা পড়ে নাই!

অথচ ঠিক্ এই মুহূর্ত্তেই চিঠিখানা খুলিয়া দেখিবার সাহসও তাহার হইল না।

প্রায় আধঘণ্টা পর্য্যন্ত চুপ করিয়া পড়িয়া রহিয়া হঠাৎ বিছানার উপর উঠিয়া বসিল এবং জ্বরের উত্তেজনায় রোগী যেমন জলের পাত্রটার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া পান করিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠে, ঠিক্ তেমনি ভাবে দুইহাতে খাম্‌টা তুলিয়া লইল!

চিঠিটা যখন পড়া শেষ হইয়া গেল, তখন শৈলেশের মুখের উপর দিয়া একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আসিয়া গিয়াছে। যেন কত দিনের রোগী বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে; রক্তহীন মুখের উপর দিয়া একটা বিশ্রী পাণ্ডুর ছায়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোনও দিকেই আর লক্ষ্য নাই; শুধু নির্ণিমেষ চোখে ঘরের দেওয়ালের দিকেই চাহিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। তার পর ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বারান্দার উপর দাঁড়াইল!

তখন কুয়াসায় ঘেরা দূরের ও নিকটের রাস্তার আলোকগুলি অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। সহরের কোলাহল প্রায় থামিয়া গিয়াছে! রাস্তার উপরকার জনস্রোত বিরল হইয়া আসিয়াছে, এবং সারা দিনের পরিশ্রমের পর সমস্ত সহরটা যেন ঘুমের চোখে ঢুলিয়া পড়িতেছিল। কিন্তু তখনও নিকটেরই একটা বাড়ী হইতে পিয়ানো থামিয়া যাইবার পূর্ব্বেকার মৃদু আওয়াজ ভাসিয়া আসিতেছিল, এবং মাঝে মাঝে

দূরের রাস্তার মোড়ের দিক্ হইতে কাহাদের হাসির শব্দ কাণে আসিতেছিল।

শৈলেশের মনে হইতেছিল, এর কিছুরই সঙ্গে যেমন তাহার অন্তরের যোগ নাই, তেমনি ছোট বড় নানা ব্যাপারের কোনওটার মধ্যে তাহার স্থানও নাই। সে যে এই বারান্দাটার উপর ঠিক্ এই মুহূর্ত্তে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, এও যেন নিতান্ত অনাবশ্যক রূপে!

সারা জীবনের ইতিহাসটাই একটা অদ্ভুত রকমের কিছু;—বুকের ভিতরে যে চাওয়ার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে, অদৃষ্টের এমনি উপহাস, সে যাহা পায়, তাহাতে সে খুসি হয় না। কিন্তু সে যাহা চাহে, তাহা তাহাকে দেওয়াও চলে না! ওরে, এর চাওয়াটাকে কেমন করিয়া নিষ্পেষিত করিয়া দেওয়া যায়? যাহা সে পাইবে না, তাহা সে নিশিদিন চাহেই বা কেন, আর যাহা সে পাইয়াছে, তাহার প্রতিই বা বিমুখ হইয়া উঠিবে কেন!

এর মীমাংসাও যেমন কিছু নাই, তেম্‌নি মনের কাছেও তো ফাঁকি দেওয়া চলে না! বুকের ভিতরকার এই কাঙ্গালপণার মুখ বন্ধ করিবার উপায়ই বা কি?

লুব্ধ, অন্ধ কাঙ্গাল পথের প্রান্তটীতে বসিয়া নিশিদিন চীৎকার করিতেছে বলিয়াই যে তাহাকে রাজার ঐশ্বর্য্য আনিয়া দিতে হইবে, এটা তো আর সম্ভব নহে!

শৈলেশ যখন চোখ তুলিয়া চাহিল তখন নক্ষত্র-বিরল ভোরের স্নিগ্ধ আকাশখানি অন্তহীনের চোখের মতই সুনীল হইয়া ফুটিয়া রহিয়াছে! নীচে, ধরণীর বুকের উপরকার লক্ষ বিচিত্রতা, সেই চোখের দৃষ্টির নিম্নে, লীলা-চঞ্চল শিশুর মতই একে একে জাগিয়া উঠিতেছে!

কোনও দিকেই আর না চাহিয়া শৈলেশ মাতালের মতই বারান্দার

উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিল এবং সাম্‌নের রাস্তা ধরিয়া বরাবর নদীর দিকে চলিয়া গেল।

সারা দিন পথে পথে ফিরিয়া সে যখন তাহার নির্জ্জন ঘরটার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে!

চিতাভস্মের ভিতরকার অগ্নিস্ফুলিঙ্গের শেষ দীপ্তিটুকুর মতই পশ্চিমের আকাশের রঙ্গিন রশ্মিটুকু কখন নিভিয়া গিয়াছে! শুক্ল-পক্ষের চতুর্থীর ক্ষীণ শশাঙ্কের অনুজ্জ্বল জ্যোৎস্না, বিধবার পাণ্ডুর মুখের উপরকার হাসিটুকুর মতই ম্লান হইয়া রহিয়াছে!

আলোক বিহীন ঘরটার রুদ্ধ দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াই শৈলেশের মনে হইল, এখানে আজ সে অনধিকার প্রবেশই করিতেছে। জোর তো কোনও দিনই ছিল না, অতিথি হিসাবে যে দাবীটুকু ছিল, সে মনের মধ্যে নিশ্চিতই জানিত, সে দাবীও আর তাহার নাই!

কিন্তু এই মনের অপরাধকে বাহিরে ধরাইয়া দিবার জন্য কোনও আয়োজনই সে যে নিজের পক্ষ হইতে এ পর্য্যন্ত করে নাই, এ জন্য কোনও ক্রমে নিজেকে ক্ষমাও তো করিতে পারে না!

চোখের সম্মুখ হইতে সমস্ত আনন্দের দীপ্তিই মুছিয়া গিয়াছে; আজ শুধু একটি স্নেহস্নিগ্ধ আশ্রয়ের বুকে কোনও মতে মাথাটা গুঁজিয়া থাকিতে পারিলেই বুঝি সব আকাঙ্ক্ষার শেষ হইয়া যাইত!

শ্রান্তিতে, অবসাদে দুই চোখ ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল; দুই হাতে দুয়ার ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে আসিতেই বাহিরের দিকে কাহার পায়ের শব্দ শুনিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তেই খোলা দুয়ারের কাছে আলো হাতে দাঁড়াইয়া ঝি কহিল, "দাদাবাবু সেই ভোরবেলায় বেরিয়ে গেছ, কিচ্ছুটি বলে যাও নি, এখানে বাসাশুদ্ধ সবাই যে ভেবে সারা হয়ে যাচ্ছে গো!" বলিতে বলিতে ঘরের মধ্যে আসিয়া টিপয়টার উপর

হাতের আলোটা রাখিয়া শৈলেশের মুখের দিকে চাহিয়াই একেবারে চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "মাগো, একি চেহারা, সারা দিন কিছু খাওয়া হয় নি তো নিশ্চয়ই ; কিন্তু শুধু তা'ই তো নয়, অসুখ করে নি তো ? এ যে একেবারে ছ'মাসের রোগীর চেহারা করে তুলেচ,—" তার পর নিজের মনেই "সৃষ্টি ছাড়া মানুষ সব বাপু ; এই এদের দুটীকে দেখে দেখে কি এত দিনেও চিন্‌তে পার্‌লাম ?—কারু পেটের কথা তো পাবার যো'টী নেইই ! যেমন আমার দিদিমণিটি, ভগবান্ আবার হাঁড়ি মেপে সরাটিও জুটিয়েচেন ঠিক্ তেমনিটি ! বাবু হাতে ধরে দিয়ে গেছেন, তুই বাপু বিয়ে-থাওয়া কর্, মিলে মিশে রাজারাণীর হালে থাক্,—দুঃখ কিসের তোদের ! তা' না, তুই থাক্‌লি যদি পশ্চিম মুখো হয়ে, ও থাক্‌লো একেবারে পূবমুখো হয়ে ! সেধে দুঃখ ডেকে আন্‌লে, দেবতাদেরও সাধ্যি নেই, তা' রোধ করেন ! ভদ্দর নোকের ঘরের রকম-সকমের সঙ্গে কি আমাদের কিছু মেলে ?"—বকিতে বকিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এই বৃদ্ধা ঝিটি এই সংসারেই তাহার জীবন কাটাইয়াছে ; তারাপদর মার সঙ্গে ছেলে বেলায় এ বাড়ীতে আসিয়াছিল। তারাপদকে কোলে পিঠে করিয়া মানুষ তো করিয়াছেই, তা' ছাড়া সুতিকা ঘর হইতেই মলিনার ভার লইয়া তাহার মাকে একেবারেই নিশ্চিন্ত করিয়া দিয়াছিল। মলিনার মা মৃত্যুর পূর্ব্বেও এর হাতেই মলিনাকে দিয়াছিলেন ; এবং সে সময়েও ঠিক্‌ই জানিতেন যে, তাহার কোনও অযত্ন হইবে না। মা-বাপ মরা মেয়েটা এখন তাহার কাছে পরম সম্পদের মতই হইয়া উঠিয়াছিল. এবং দারুণ কৃপণের মত ইহাকে আগ্‌লাইয়া রাখাই তাহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল।

তারাপদ শৈলেশের হাতেই মলিনাকে দিয়া গিয়াছেন, বিবাহের লৌকিক মন্ত্রগুলি ছাড়া সম্প্রদানের কিছুই আর বাকী নাই, এ সম্বন্ধে

বৃদ্ধা একেবারে নিঃসন্দেহ তো ছিলই, এখন এক শুভমুহূর্ত্তে দু'হাত এক করিতে পারিলেই যেন জীবনে তাহার আর কিছু করিবার থাকে না এবং নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারে।

কিন্তু এদের দুটীর ভাবগতিক দেখিয়া একটা দারুণ অস্বস্তি মনের মধ্যে রাতদিন পোষণ করিলেও, মুখে কিছু বলিত না।

ঝি চলিয়া যাইতেই শৈলেশ আলোটা নিভাইয়া দিয়া শুইয়া পড়িল। সেই মুহূর্ত্তে তাহার কাছে দুনিয়ার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, শুধু সেই আলোকহীন কক্ষের মধ্যে দুইটী কালো চোখের ম্লান দৃষ্টি ধ্রুব তারার মতই ফুটিয়া উঠিতেছিল।

শৈলেশ বালিশে মুখ গুঁজিয়া সে দৃষ্টিকে এড়াইতে চাহিল, কিন্তু তাহার মুদ্রিত দুই চোখের পাতা ভেদ করিয়া, রঞ্জন রশ্মির মতই, সেই কালো চোখের আলো রেখাপাত করিয়া যাইতেছিল!

এমন সময়ে ঝি ফিরিয়া আসিয়া ডাকিল, "দাদাবাবু!"

শৈলেশ কোনও সাড়া দিল না।

ঘরের দিকে চাহিয়া ঝি কহিল, "ওমা, এর মাঝে আলোটা নিভিয়ে বসে আছে! যেন হাতমুখ ধোওয়া, খাওয়া দাওয়া কিছুরই আর দরকার নেই!"

ঝি আলো আনিতে চলিয়া যাইতেছিল, শৈলেশ ডাকিয়া কহিল, "শরীরটা ভাল নেই ঝি! আজ আর কিছু খাব না।"

শৈলেশের গলার আওয়াজ শুনিয়া ঝি মুহূর্ত্তের জন্য থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া গেল। তার পরই অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া আলো লইয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "তোমার গলার আওয়াজ যে একেবারেই বসে গেছে, দাদাবাবু! তোমরা সবই বোঝ, শুধু এইটুকুই বোঝ না, যে, শরীরটাকে তুচ্ছ কর্ত্তে নেই। ওতে পাপও কম নয়, দুঃখ কষ্ট তো যথেষ্ট আছেই; আর

এমন করে শরীরের উপর অত্যাচার কর্‌লে শরীরেরই বা দোষ কি তা'—বল ?" বলিতে বলিতে শৈলেশের কপালের উপর হাত দিয়া চম্‌কিয়া উঠিয়া কহিল, "ওমা, জ্বরে গা' একেবারে পুড়ে যাচ্ছে যে ! এমন অসুখ করেচে, তা' কিচ্ছুটী বল্‌তে নেই ; আর এমন বিপদেও পড়েচি আমি তোমাদের দুটীকে নিয়ে !"

তার পর নিজের মনেই বকিয়া যাইতে লাগিল, "যারা সুখ কর্‌বে ; আহ্লাদ কর্‌বে, তারা সবাই চলে গেল, আমি পাপিষ্ঠি রয়েচি, এই সব দেখ্‌বার জন্মে ! দেবতা তো আমার মরণও লেখেন নি।"

ঝি একটু বেশী বকিত। কিন্তু তাহার বুকে মলিনার জন্য স্নেহেরও যেমন অন্ত ছিল না, তেমনি মলিনা দুই দিন বাদে যাহার হাতে পড়িবে, তাহার জন্য মমতারও সীমা ছিল না !

শৈলেশ কোনও কথা না বলিয়া চুপ করিয়াই পড়িয়া রহিল। এই একটা সামান্য ঝির মুখ দিয়াও যে দুচারটা মমতার কথা বাহির হইতেছিল, তাহাই আজ তাহার কাছে আর উপেক্ষা করিবার মত কিছু তো নহেই, বরং মনটা যেন এমনি দু'চারিটা কথা শুনিবার জন্য ভিতরে ভিতরে ক্ষুধিত, উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে ! অথচ কত স্নেহাশ্রুই তো সে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে, কত দিক্‌কার কত রকমের দাবীকেই পায়ে দলিয়া, অস্বীকার করিয়া আসিয়াছে !

মনের এই দুর্ব্বলতাকে সে এত কাল কখনই স্বীকার করে নাই ; কিন্তু ঠিক্ এই মুহূর্ত্তটীতে তাহার কেবলই মনে হইতেছিল, ওটা কাঙ্গালপণা বা দুর্ব্বলতা তো নহেই, ওটা মানবচিত্তের অন্তহীন বিচিত্রতারই একটা দিক্ এবং ওকে অস্বীকার করিতে গেলে মানুষ আর মানুষ থাকে না !

মানুষের চিত্ত তো কত প্রকারের দুঃখ কষ্টেই ক্ষত বিক্ষত হয় ; এর

সান্ত্বনা যেমন তাহার নিজের কাছেই রহিয়াছে, তেমনই অনেক পরিমাণে বাহিরের পাঁচজনের সহমর্ম্মিতার মধ্যেও রহিয়াছে।

এসব কথা তর্কের মুখেও কোনও দিন শৈলেশ স্বীকার করে নাই, নিজের মনেও না।

কিন্তু সত্যই মানুষের মনের কাছে যে এর কতখানি প্রয়োজন আছে, তাহা ঠিক্ করিয়া বুঝিতে আজ তাহার আর বিচার বিতর্কের মধ্যে যাইতে হইল না। একটা নিষ্ঠুর সত্যের মতই আগাগোড়া সুস্পষ্ট মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া তাহাকে বিস্মিত করিয়া দিয়া গেল।

মানুষ যেটা ঠিক্ তাহার মনের ভিতর হইতে বুঝিতে পারে, সেইটাই যে সব চেয়ে বড় পারা, এ বিষয়ে তাহার আর এতটুকুও সন্দেহ রহিল না।

কিন্তু আজ যে কত বড় অগ্নি-পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়া সে এ সব বুঝিতে বা জানিতে শিখিল, তাহা মনে করিয়া কেবলি শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। এই আগুনের ভিতর হইতে সে মোটেই বাহির হইয়া আসিতে পারিবে কি না, অথবা লুব্ধ, হীন পতঙ্গের মতই পুড়িয়া মরিবে, তাহা ভাবিয়া দেখিবার মত এতটুকু সাহসও আজ আর তাহার ছিল না!

ক্ষুদ্র একটী পক্ষিশাবক যেমন ঝড়ের রাত্রিতে গাছের তলাটীতে পড়িয়া তীব্র যাতনায় লুটাইতে থাকে, না পারে পাখা মেলিয়া উড়িয়া যাইতে, না পারে স্নেহ-কোমল আশ্রমের বুকে ফিরিয়া যাইয়া মাথা গুঁজিয়া লুকাইয়া থাকিতে: শৈলেশের চিত্তও ঠিক্ তেমনি করিয়া অদৃষ্টের এই দারুণ নিষ্ঠুর উপহাসের নিম্নে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া লুণ্ঠিত হইতেছিল। মুক্তিকে খুঁজিয়া লইবার শক্তিও যেমন তাহার ছিল না, তেমনি চিরন্তন স্নেহের নীড়টীতে ফিরিয়া যাওয়ার কল্পনা করিবার মত সাহসও ছিল না!

জ্বরের উত্তাপে প্রায় অচেতনের মতই পড়িয়া থাকিয়া শৈলেশ অনুভব করিতেছিল, সারা রাত ধরিয়াই তাহার ঘরটীতে এ বাড়ীটার সকলেরই আনাগোনা চলিতেছে এবং মলিনাও যে উৎকণ্ঠিত মুখে কতবার আসিয়া গিয়াছে, ইহাও তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না।

এত বড় দুর্ভোগের মধ্যেও, ওকথাটা তাহাকে ভিতরে ভিতরে পুলকিত করিয়া তুলিতেছে বুঝিয়া ইচ্ছা হইলেও চোখ মেলিয়া একবারও চাহিল না। কারণ শৈলেশ নিশ্চিতই জানিত, মলিনার অন্তরের দারুণ উদ্বেগ যে পথ ধরিয়া চলিয়াছে, তাহার সঙ্গে তাহার নিজের ভাবনা চিন্তার কোন খানে এতটুকু মিলও নাই, যোগও নাই।

অথচ এ কথাটা শুধু সেই জানে, মলিনা ইহার বিন্দুবিসর্গও জানে না, হয় তো সন্দেহও করে নাই।

প্রভাতের স্নিগ্ধ অরুণালোকের মধ্যে ক্ষুদ্র লতিকা যেমন নিজেকে একটী পুষ্পতরুর দিকে বাড়াইয়া ধরিতে চাহে, ঠিক্ তেমনি করিয়া মলিনা তাহার জীবনের উপরকার এই প্রথম প্রীতির আলোকপাতের মধ্যে অন্তরের সবখানি সুখ দুঃখের অনুভূতি, আনন্দ ও প্রীতির উচ্ছ্বাস শৈলেশের অভিমুখী করিয়া দিয়াছিল!

শৈলেশ ইহা ঠিকই বুঝিয়াছিল এবং বুঝিয়াছিল বলিয়াই নিজের জন্য মনে মনে যত বড় কঠিন শাস্তির ব্যবস্থাই করুক না কেন, মলিনার জন্য তাহার উদ্বেগেরও পরিসীমা ছিল না!

অদৃষ্টের সঙ্গে যোগ দিয়া সে যে কোনও দিক্ দিয়াই মলিনার উপায় রাখে নাই, এই কথা মনে করিয়া তাহার লজ্জার ও কুণ্ঠারও শেষ ছিল না। কিন্তু কেমন করিয়া সব দিক্ রক্ষা করা যায়, ইহা রাতদিন ভাবিয়াও তো কিছু স্থির করিতে পারিল না!

ভোরের দিকে হঠাৎ চোখ খুলিয়াই শৈলেশ দেখিল, ঝি শিয়রের

কাছে একটা ছোট টুলের উপর বসিয়া তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে ঝিমাইতেছে; আর বাহিরে বারান্দায় রেলিংএর উপর ভর রাখিয়া ঘরের দিকে নির্ণিমেষ চোখে চাহিয়া মলিনা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

শৈলেশ দেখিয়াই বুঝিল মলিনা সারা রাত ঐ বারান্দার উপরেই ছিল এবং একটু কালের জন্যও তুই চোখের পাতা এক করে নাই।

তাহার সুখ তুঃখের সঙ্গে ঐ নারীর সুখ তুঃখ যে এতই নিবিড় ভাবে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, এটা এই মুহূর্ত্তেই তাহার কাছে যেন বিশেষ করিয়াই ধরা পড়িয়া গেল। কিন্তু যে তাহার আজকার তুর্ভোগের অংশ লইবার জন্য অমন উদ্বিগ্ন মুখে সারা রাত খোলা বারান্দার উপরেই কাটাইয়া দিল, সেই মলিনারই সুখ তুঃখকে সমান ভাগ করিয়া লইবার অধিকার যে তাহার একটুও নাই, এ কথাটা বারংবার তীক্ষ্ণ কাঁটার মতই বিঁধিয়া শৈলেশকে মোটেই স্বস্তি দিতেছিল না।

শৈলেশ চোখ খুলিয়া চাহিতেই মলিনা নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাহার জাগরণ-পাণ্ডুর মুখের স্মৃতি, তাহার ক্লান্ত তুই চোখের উদ্বিগ্ন দৃষ্টি, ক্রমাগতই শৈলেশের মনের মধ্যে উঁকি মারিয়া যাইতে লাগিল।

রুক্ষ চূর্ণ কুন্তল ক্ষুদ্র ললাট খানির উপর প্রভাতের বায়ুর মৃতু স্পর্শে লুটাইতেছিল, চোখের কোলে সারা রাত্রির ক্লান্তির কালিমা অনুরাগ রেখার মতই ফুটিয়াছিল!

ওরে, এ সব যে নিজের চোখেই এই মাত্র সে দেখিয়াছে! এর কোনোটাই তো মিথ্যা নহে, কিছুই তো কল্পনা নহে!

শৈলেশ জোর করিয়া তুই চক্ষু মুদ্রিত করিল, পাশ ফিরিয়া শুইয়া শিয়রের বালিশে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল; মুষ্টিবদ্ধ তুই হাতে কপালের পাশটায় আঘাত করিয়া দেখিল; মাথার চুলগুলি টানিয়া টানিয়া

বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিল ; সহস্র প্রকারে চেষ্টা করিল ; কিন্তু কিছুতেই, জীবন-মরুর রসহীন প্রান্তর পথে চলিতে চলিতে এই যে স্বচ্ছসলিলা সরসীর সন্ধান মিলিয়াছে, ইহা তাহার কাছে যে মূর্ত্তিতেই দেখা দিক্ না কেন, এ যে শুধু নিষ্ঠুর মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই নহে, এ কথাটা কোনও ক্রমেই সে তাহার পিপাসু চিত্তকে বুঝাইতে পারিল না !

শৈলেশের অস্থিরতা দেখিয়া ঝি ভয় পাইয়াছিল ; সে টুল্‌টা সরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই শৈলেশ একবার চোখ খুলিয়া তাহার দিকে চাহিল ! জবাফুলের মতই লাল দুটা চোখের অর্থশূন্য দৃষ্টি মুখের উপর তুলিয়া ধরিতেই ঝি চেঁচাইয়া ডাকিল, "দিদিমণি !"—তার পর নিজের মনেই বকিতে লাগিল, "কি যে বুদ্ধিই হয়েচে এদের বুঝিও না ছাই ! ওমা, এম্‌নি করে সারাটা রাত বারান্দার উপর দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিলি, কতই তো বল্‌লাম, হয় এ ঘরে এসে বোস্‌, না হয় যা', নিজের ঘরে যা', তা' কি শুন্‌ল ! সবি সৃষ্টি ছাড়ারে বাপু ! আর এই সব দেখ্‌তেই কি আমি রাবণ রাজার মার পের্‌মাই নিয়ে বসে আছি !" বলিয়াই কপালে দুইটা আঙ্গুলের ঘা মারিয়া আবার ডাকিল, 'দিদিমণি !'

শৈলেশ উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, "না, না, ডেকো না তাকে ! আমি এখুনি ভাল হয়ে যাব।"—কিন্তু তাহার শেষ দিক্‌কার কথাগুলি আর্ত্তের চীৎকারের মতই শুনাইল !

দুয়ারের কাছে মলিনা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহার চিত্তের ভিতরকার যে সেবিকা নারী এই শৈলেশকে শুশ্রূষা করিয়া আরাম দিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাকে ঠেকাইয়া রাখা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রথমটা একটু দ্বিধা করিল ; বুকের মধ্যে শোণিত প্রবাহ উচ্ছল হইয়া উঠিতেছিল ; পা' দুটা অল্প কাঁপিতেছিল ; পরমুহূর্ত্তেই মলিনা

দৃঢ়পদে শৈলেশের বিছানার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল এবং ডান হাতখানা কপালের উপর রাখিয়া জ্বরের উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে দেখিতে একটু নীচু হইয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, "শৈলেশ দা!"—

শৈলেশ তাহার দুই রক্তবর্ণ চক্ষু মেলিয়া মলিনার মুখের দিকে মুহূর্তের জন্য দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিল, তার পর একটা ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া আবার চক্ষু বুজিল!

দুপুরের দিকে শৈলেশের জ্বর আরও বাড়িল।

এতখানি বেলার মধ্যে মলিনা একবারটিও উঠিয়া যায় নাই, এ জন্য শৈলেশ একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "এখন বোধ হয় অনেকটা ভাল আছি, আর তোমারও যে একটা বিশ্রামের দরকার আছে, সে কথাটা ভুল্‌লে তো চল্‌বে না।"

মলিনা কোনও কথা কহিল না, শুধু একটু হাসিয়া জানাইয়া দিল, তাহার বিশ্রাম করিবার সময় এখন নহে!

শৈলেশ কহিল, "না, ও হ'তে পারে না; শরীরটাকে নষ্ট করা ঠিক্ নয় তো। তুমি ওঠ এবং একটু বিশ্রাম করে যখন হয় ফিরে এসো; আর না হয় দরকার মনে কর্‌লে আমিই ডাক্‌ব, মলিন্!"

মলিনা জোর করিয়া মুখের উপর হাসি আনিয়া কহিল, "শরীর রক্ষার নিয়মগুলি বুঝি শুধু আমার বেলাই খাটাতে হবে, আর কারু বেলা নয়।" বলিয়াই মনে মনে কহিল, "শরীর পুড়ে ছাই হলেই যে জাতের গুণ গাইবার রীতি চলে আস্‌চে, তাদেরই আবার শরীর রক্ষা কর্‌বার জন্যে আয়োজন কর্‌তে হবে! পোড়া কপাল আর কি!" তার পর কিছু কাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "আচ্ছা, সে আমি সব ঠিক্ করে নেব! মাথায় এই অ-ডি-কলোনটা দিয়ে দিচ্ছি, একটু চোখ্ বুজে থাক্‌তে পার্‌লে ভাল হ'ত!"

সত্যই চোখ খুলিয়া চাহিবার শক্তিও আর শৈলেশের ছিল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিল; তার পর কপালের দুইটা পাশের শিরা একবার হাত তুলিয়া টিপিয়া ধরিল।

মলিনা কহিল, "মাথাটা খুব ধরেচে বুঝি, আচ্ছা, আমি টিপে দিচ্ছি,"—

ডান হাতের সূক্ষ্ম স্বর্ণচুড়ি কয়গাছি বাঁ হাত দিয়া উপরের দিকে টানিয়া তুলিয়া মলিনা শৈলেশের কপাল টিপিয়া দিতে লাগিল।

প্রায় আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। ঘরের ভিতরকার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া শুধু রোগীর দ্রুত নিশ্বাস পতন শব্দই কানে আসিতেছিল।

নীচের রাস্তা দিয়া দল বাঁধিয়া কতকগুলি নীচ শ্রেণীর বর্ম্মা চলিয়াছে; জল তরঙ্গের মতই এক প্রকার বাজনার সহিত তাল রাখিবার চেষ্টা করিয়া ছেলে বুড়া একত্রে দল বাঁধিয়া মৃগি রোগীর মতই হাত পা' ছুঁড়িয়া নাচিত নাচিতে চলিয়াছে! দু' একটা বর্ম্মানী ফেরিওয়ালী হাঁকিয়া যাইতেছে! রাস্তার ওধারে কতকগুলি মান্দ্রাজী কুলি একত্রে দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছে।

পশ্চিমের আকাশে ভাঙ্গাচোরা রঙিন্ মেঘের ভিতর দিয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। খানিকটা কোমল রশ্মি খোলা জানালার পথে ঘরের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া দেওয়ালের গায়ে আঁকা গোলাপ লতার রঙ্গিন্ ফুলগুলিকে সত্যকার ফুলের মতই বিচিত্র ও সজীব করিয়া তুলিয়াছে এবং মেঝের লাল মার্বেল পাথরের উপরকার প্রতিফলিত আলোক সমস্ত ঘরটা একটা কোমল গোলাপী আভায় ভরিয়া রাখিয়াছে!

শৈলেশ অনুভব করিতেছিল, এই নারীর স্পর্শ যতই পুষ্পপেলব হউক্ না কেন, তাহার মাথাটার ভিতরে এই যে দপ্ দপ্ করিতেছিল, ইহাকে শান্ত করিয়া দিবার শক্তি সে স্পর্শের একেবারেই নাই বরং বৈজ্ঞানিকের বৈদ্যুতিক শক্তি আবিষ্কারের কাহিনীর সঙ্গে এর আগাগোড়া মিলিয়া যায়; এবং মলিনার প্রত্যেক স্পর্শে তাহার মাথার

ভিতরে যে বিদ্যুতের তরঙ্গ তুলিয়া উঠিতেছিল, ইহা সে জ্বরের এই দারুণ দুর্ভোগের মধ্যেও অত্যন্ত ঠিক্ করিয়াই বুঝিতে পারিতেছিল।

হঠাৎ শৈলেশ চোখ খুলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, "না, এ হতেই পারে না! তোমার সেবা এমন করে নেবার অধিকার একেবারেই আছে কি না সে কথার বিচার যখন আমি নিজের মনে আজ পর্য্যন্তও করে উঠ্‌তে পারি নি, তখন,"—

খানিকটা অ-ডি-কোলন্ জলের সঙ্গে শৈলেশের মাথায় লাগাইয়া দিতে দিতে বাধা দিয়া "তুমি কি ক্ষেপ্‌লে শৈলেশ দা'! রোগের শুশ্রূষা কর্‌বার একটা সাধারণ অধিকার মেয়েমানুষ মাত্রেরই আছে, তা' সে রোগী যেই হোক্ না কেন! এ নিয়ে বিচার বিতর্কের ত কোনও প্রয়োজন নেই, অধিকার অনধিকারের কোনও কথা তো এর মধ্যে আস্‌তেই পারে না" বলিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল।

দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল; তাহার কেবলি মনে হইতেছিল, বাহিরে যাইয়া একবার কাঁদিয়া আসিতে পারিলে সে বাঁচিয়া যাইত! আশঙ্কায় উদ্বেগে যখন মলিনার বুকের ভিতরটা শুকাইয়া যাইতেছিল, এবং যখন সে ছোট বড় তেত্রিশকোটি দেবতার কাছে মনে মনে মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছিল, ঠিক্ তখনই এই রোগাতুর নিষ্ঠুর ব্যক্তিটি বিচার করিতে বসিয়া গেল যে, ঐ শঙ্কাব্যাকুল নারীর প্রাণপণ সেবা গ্রহণ করিবার অধিকারটা পর্য্যন্ত তাহার আছে কি না!

অথচ ইহারই হাতে তাহার বাবা মৃত্যুকালে তাহাকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন!!

মলিনার ইচ্ছা হইতেছিল চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠে, "ওরে মেয়ে মানুষের কি অধিকার আছে না আছে, তা' স্থির কর্‌বার জন্য সে কি পুরুষের বিচারের উপর নির্ভর করে থাকবে?—না, তার দেখিয়ে দেওয়া

অধিকারের পথটি ধরেই চল্‌বে! ভুল ভুল, তোমরা শক্তিমান্‌, তাই মনে কর যে তোমাদের দেওয়া অধিকার কুড়িয়ে নিয়ে কৃতার্থ হবার জন্যেই এই মেয়েমানুষগুলো তোমাদের মুখের দিকে চেয়ে বসে রয়েচে।”—

কিন্তু কতটুকু অধিকার আছে না আছে এটা তাহার নিজের ঠিক করিয়া লইবার ক্ষমতা থাকিলেও, মলিনা জানিত, মুখ ফুটিয়া কোনও কথা বলিবার শক্তি এই মেয়েমানুষ জাতটাকে ভগবান একেবারেই দেন নাই!

শৈলেশের সঙ্গে কথা বলিবার মত মনের অবস্থাও তাহার ছিল না। মলিনা ভাবিতেছিল, তাহার নিজের অদৃষ্টের কথা! তাহার জীবনের উপর দিয়া এই যে একটা অত্যন্ত অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিয়া যাইতেছে, এর জন্য সে যে কাহাকে দায়ী করিবে, তাহা খুঁজিয়া তো পাইলই না, এমন কি নিজের অদৃষ্টের উপর দোষারোপ করিতেও তাহার সাহসে কুলাইল না!

সবটা ভাবিতে মলিনার চোখে জল আসিতেছিল। এত বড় বিপদের দিনে কাহার মুখের দিকে চাহিবে, কে তাহাকে বলিয়া দিবে, ভিতরে ও বাহিরে এই যে দারুণ দুর্দ্দিনের মেঘ সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে, এর বুকে প্রলয়ের ঝঞ্ঝা ও বজ্র লুকাইয়া নাই; শুধু সর্ব্বতাপহরণ বর্ষণের জন্যই এই বিপুল আয়োজন!

এত দুঃখের মধ্যে বারবারই তাহার বাবার কথা মনে পড়িতেছিল। তাহার মুখ এতটুকু মলিন দেখিলে, তিনি কতই তো অস্থির হইয়া উঠিতেন; কিন্তু আজ যখন দুঃখে দুঃখে বুকের ভিতরটা নিষ্পেষিত হইয়া যাইতেছিল, তখন ক্ষুদ্র একটা সান্ত্বনার কথা বলিবার মত কেহও তো ছিল না! ওরে, দুরদৃষ্ট কি এমনি, যাহার হাতে

তাহার বাবা হাত ধরিয়া দিয়া গেলেন, তাহার কাছেই হয় তো নিজেকে এক দিন যাচাই করিতে হইবে।

কিন্তু মেয়েমানুষ বলিয়া ওকথাটা তাহার কাছে যত বড়ই লজ্জাকর হউক না কেন, সে অবসরও কি ভগবান তাহাকে দিবেন না ?

মলিনা মনে মনে অত্যন্ত শিহরিয়া উঠিয়া একবার চকিতের জন্য তাহার অশ্রুক্লিন্ন দৃষ্টি শৈলেশের মুখের উপর স্থাপিত করিল। দুইটি মুদ্রিত চোখের নীচে কেহ যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে ; সুগৌর মুখখানা জ্বরের প্রবল উত্তাপে লাল হইয়া উঠিয়াছে ; শুধু রোগের সবটা গ্লানিকে ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্যই যেন ললাটপেশী মাঝে মাঝে সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে !

হঠাৎ মলিনার কোলের উপর ডান হাতটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া শৈলেশ বলিয়া উঠিল, "শুন্‌লে মলিনা, তোমাকে যে আর চলে যেতে বল্‌তে চাইনে শুধু এই কথাটা ঠিক্ করতেই আমার এতক্ষণ কেটে গেছে ! জীবন মরণের মাঝখানকার কালো পর্দাটা আজ আমার চোখে কতবারই যে সত্যি হয়ে দুলে উঠচে, তা' আমি হিসেবই করে উঠ্‌তে পার্‌ব না তো ! কিন্তু কথাটা সহজে বিশ্বাস করতেও পারিনে যে ! আর এও কি হয়.—তুমিই বল না ! যে আশেপাশে সকলকেই শুধু ব্যথা দিয়ে এতখানি পথ এগিয়ে এসেচে, তাকে নাকি এ সব জমানো নিশ্বাসের হাত থেকে এত শীগ্‌গিরই মুক্ত করে দেবে ! দূর তা' কি হয়,—হয় না ত !" বলিয়াই পাশ ফিরিয়া শুইতে শুইতে চেঁচাইয়া কহিল, "তা' বলে তুমি কিন্তু চলে যেও না, মলিন্। তা' হ'লে আমি আর বাঁচব না,—কিছুতেই না !"

মলিনা শৈলেশের কপালের পাশ দুইটা জোরে জোরে টিপিয়া দিতে লাগিল ; বুকের ভিতরকার উদ্বেগ মুখে চোখে ফুটিয়া উঠিলেও কোনও কথা না বলিয়া চুপ করিয়াই রহিল।

শৈলেশ আপনার মনেই বলিতে লাগিল, "আঃ, জীবনের এত বড় দুর্ভোগগুলির শেষ যদি এবারে হয়ে যায়, বেঁচে যাই তা হলে,"— বলিয়াই হঠাৎ মলিনার হাতটা টানিয়া লইয়া বুকের ডান দিকটায় দুই হাতে জোরে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "বুকের এই পাশটায় সত্যিই ব্যথায় ভরে গেছে, মলিন্ ; কেন গেছে, তা' আমি তো বেশ করেই জানি ! এ খবরটা কাউকে যদি কোনো দিনই জানাবার দরকার না হয়, আঃ, বেঁচে যাই তা হলে,—বেঁচে যাই !"

বলিয়াই পাশ ফিরিয়া শুইল।

মলিনা বুঝিল, এ সব কথা বিশেষ করিয়া শৈলেশ যে তাহাকেই বলিতেছে, তাহা নহে ; এ শুধু জ্বরের উত্তেজনায় আগ্নেয়গিরির বুকের জ্বালার মতই, তাহার বুকের দুঃসহ জ্বালার খবরের একটা ঝলক বাহিরে আসিয়াছে ।

মলিনার বুক ভাঙ্গিয়া কান্না আসিতেছিল ; দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া মুখ ফিরাইয়া লইতেই তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল !

তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। আকাশের তারার মতই রাস্তার আলোগুলি ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং মোড়ের মাথার দিক হইতে মিশ্র জন-কোলাহল ভাসিয়া আসিতেছিল !

বাদুড় বাগানের ছোট একটা দোতালা বাড়ীর ঠিক্ সাম্‌নেই একটা ফাঁকা মাঠ। মাঠের পশ্চিম দিক্‌কার বাড়ীগুলির উপর সকাল বেলাকার রোদ আসিয়া পড়িয়াছে।

এ বাড়ীটার জানালার কাছে সরযূ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ওধারের একটা দোতালা বাড়ীর ঝুলবারান্দার রেলিংয়ের উপর কতকগুলি বিছানা গুছাইয়া রাখিয়া, এইমাত্র তাহারই সমবয়স্কা একটি মেয়ে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল।

সরযূর চোখের দৃষ্টি বিশেষ করিয়া সেদিকে না থাকিলেও, সে হঠাৎ কৌতূহলী হইয়া উঠিয়া মেয়েটীর দিকে বারবার চাহিয়া দেখিতে লাগিল। এবং অল্প সময়ের মধ্যেই মেয়েটীও বারান্দার উপর দুই তিনবার আসিয়া গেল।

কাল সন্ধ্যাবেলাও ঐ বাড়ীটার সদর দরজায় কুলুপ আঁটা ছিল; সুতরাং রাত্রেই যে ও বাড়ীতে লোক আসিয়াছে, ইহা সরযূ সহজেই বুঝিল। এবং উহারা যে জিনিষ-পত্রগুলি গুছানের কাজেই ব্যস্ত আছে তাহাও বুঝিতে সরযূর বাকী রহিল না।

দুই চোখের কৌতূহলী দৃষ্টি ঐ বারান্দাটার উপর ফেলিয়া রাখিয়া, সরযূ যে কতক্ষণ জানালার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহা তাহার নিজেরও ঠিক্ ছিল না। কিন্তু হঠাৎ উৎপলের ডাক কানে আসিতেই, সে যখন নীচে নামিয়া যাইবে মনে করিল, ঠিক্ তখনই ওবাড়ীর বারান্দার উপরকার মেয়েটীর পাশেই এমন একজনকে দেখিল, যাহাকে চিনিয়া ফেলিতে তাহার দুবার চাহিবারও দরকার হইল না!

কিন্তু ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে সরযুর মুখের উপর যদি কাহারও চোখ্ পড়িত, তাহা হইলে, সে নিশ্চয়ই মনে করিত যে, সরযূ এইমাত্র অত্যন্ত ভয় পাইয়া আসিয়াছে !

সেই শীতের সকাল বেলাতেও সরযুর কপালের উপর ঘাম দেখা দিল ; এবং তাহার দুইটা কানের কাছ দিয়া আগুন ছুটিতে লাগিল।

এমন সময়ে উৎপল উপরে উঠিয়া আসিয়া সরযুর গা ঠেলিয়া কহিল, "তুই বেশ্ কিন্তু ! একশো বারও কি ডাকি নি !"

সরযূ চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "আমি তো একটা বই ডাক শুনি নি, দিদি !'

"তবেই তুই পার্বি ! কিন্তু এ জানালায় দাঁড়িয়ে ওই খালি মাঠ্টার দিকেও তোর চেয়ে থাকৃতে ইচ্ছে করে রে বাপু ! চল্ নীচের ছেলেটাকে একটু নিবি ! কিছু কি পার্বার যো' আছে তার জ্বালায় !"

সরযূ হঠাৎ একবার বাহিরের দিকে চাহিতেই ও বাড়ীর বারান্দার উপর চোখ্ পড়িল। সেখানে কেহই ছিল না !

তখন ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে কহিল, "ঠিক্ কথা দিদি, কল্কাতার এঁই ইট্ পাথরের ভিতরে মাঠের ঐ সবুজ রংটাই আমাকে যখন তখন দেশের কথা মনে করিয়ে দেয় ! ঐ সবুজ রংয়ের সঙ্গেই মানুষের যেন একটা নাড়ীর টান রয়ে গেছে ! ইট্ পাথরের ভিতরে মানুষ ঠিক্ সত্যিকার আনন্দ পায় না বলেই, ঐ সবুজ রংটাকে বাঁচিয়ে রাখ্বার জন্য নানা আয়োজন করে তোলে।"

উৎপল হাসিয়া কহিল, "ওরে, থাম্, থাম্, ও সব তোর বোনাই এলে বলিস্। এখন চল্ নীচেয় যাবি. খোকনকে না রাখ্লে কোনো কাজই হবে না যে !"—বলিয়া ফিরিতেই দেখিল, সতীশ দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে !

"ওমা, এই যে বল্‌তে বল্‌তেই হাজির! কখন এলে! কিচ্ছুটী তো জান্‌তে পাই নি; পায়ের শব্দও কি হতে নেই।"

"স্মরণ কর্ত্তেই এসে পৌঁছে গেছি! জান ত, ঠাকুর দেবতারা ভক্তদের একবার দেখা দিতে সুরু কর্‌লে, সকাল নেই বিকেল নেই, মনে কর্‌তেই যখন তখন এসে হাজির হন!" বলিয়াই সতীশ হাসিতে হাসিতে সরযূর দিকে চাহিয়া কহিল, "সবুজের কথা কি বল্‌ছিলে, সরযূ?"

উৎপল প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, "দোহাই তোর সুরি, এখন ও সব সবুজ টবুজ্ থাক্! আমার হাতের কাজগুলি সেরে নি; তার পর তোরা সারা কল্‌কাতা সবুজে ভরে দিস্।"

সতীশ কহিল, "তুমি হাতের কাজ সার্‌বে তা'তে সুরির কাছ থেকে সবুজের খবরটা জেনে নেবার বাধা কোথায় রয়েচে বুঝ্‌লাম না ত!"

"ঠাকুর দেবতাদের আর কারু সঙ্গে তোমার মিল থাক্ আর নাই থাক, ঐ মেটে শিবঠাকুরটীর সঙ্গে কিন্তু যথেষ্ট মিল রয়েচে! আমি তো হাতের কাজ নিয়ে থাক্‌লাম, তোমার ধনুর্দ্ধরটীকে রাখে কে?" বলিয়াই উৎপল হাসিতে হাসিতে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

"মাগো, দিদির কথার যে শ্রী! তেত্রিশ কোটী দেব্‌তার মধ্যে খুঁজে পেল কি না ঐ ভাঙ্গোর শিব ঠাকুরটীকে! আর এদিকে সতীশ বাবুটী তো শালপাতার বিড়িটীরও ধার ধারেন না!"

সরযূকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া সতীশ কহিল, "বাঃ আমাকে বুঝি বনবাস দিয়ে তোমরা সব চল্‌লে?"

সরযূ নীচেয় নামিতে নামিতে কহিল, "বনবাস বুঝি দোতালার উপরেই, সতীশবাবু! কিন্তু আমি অভয় দিয়ে যাচ্ছি, সিঁড়ি কটা ভেঙ্গে নীচেয় নাম্‌লেই নরলোকের সন্ধান মিল্‌বে!"

পাঁচ মিনিট পরেই উৎপল ফিরিয়া আসিতেই সতীশ কহিল, "ওগো শুন্‌চ!"—

"শুন্‌ব না বল্‌তেই,—কি ?"—উৎপলের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "মাঠের ওধারের বাড়ীটায় কারা এসেচে জান ?" বলিয়াই আঙ্গুল দিয়া পশ্চিম দিক্‌কার বাড়ীটা দেখাইয়া দিল।

উৎপল সেই দিকে চাহিয়া কহিল, "কই, কাল সন্ধে বেলায়ও তো ও বাড়ী খালি ছিল।"

"কিন্তু তার পর ষোল সতের ঘণ্টা কেটে গেছে—" বলিয়াই গলার স্বর খাটো করিয়া কহিল, "কারা এলো, তা'তো বলি নি।"

উৎপল দুই চোখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি সতীশের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া রহিল, কোনও কথা কহিল না।

সতীশ কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই নীচেয় সদর দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল।

জানালার কাছে মুখ বাড়াইয়া সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, "কে ?"

"আমি অশ্রুময়, ও বাসায় একবার আস্‌বেন ? এ আনাড়িদের একটু ভরসা দিয়ে না গেলে তো নয় !"

সতীশ হাসিয়া কহিল, "যাচ্ছি আমি ; কিন্তু এ লোকটাও যে কত বড় আনাড়ি তা' ঘণ্টা খানেকের ভিতরেই জান্‌তে পার্‌বেন ! উপরে আস্‌বেন ?"

"তা' হলেই মিল্‌বে ভাল" বলিয়া হাসিতে হাসিতে অশ্রুময় কহিল, "না, শুধু আপনাকে খবর দিতেই এসেছিলাম। আপনি যাবেন একবার, এবং সেটা যত শীগ্‌গির হয়।"—ছোট মাঠখানা আড়াআড়ি পার হইয়া, অশ্রুময় দ্রুতপদে বাসার দিকে চলিয়া গেল।

কিন্তু ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে শুধু একটা ইটের দেওয়ালের ও পাশেই মাথা গুঁজিয়া বসিয়া এমন একজন তাহার প্রত্যেকটী কথা উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল, যাহার বুকও যেমন ক্রমাগতই কাঁপিতেছিল, তেমনি নিশ্বাসও প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

এ খবরটা অশ্রুময়ের কাছে একেবারেই অজানা রহিয়া গেল।

ঠিক্ তখন উপরের ঘরে উৎপল সতীশের মুখের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিল। সতীশ তাহার ক্ষুদ্র ললাটের উপরকার চুলগুলিকে ডান হাতে সরাইয়া দিতে দিতে মৃদুস্বরে কহিল, "কিন্তু এ কি একেবারেই অসম্ভব, রাণি ?"—

উৎপলের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, মুখ ফিরাইয়া লইতে লইতে বলিল, "তুমি তো জান, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শিখি নি, কিন্তু তবু কি পোড়া মনকে বুঝিয়ে ঠিক্ করতে পারলাম! অশ্রুকে তো আজই প্রথম দেখ্‌লাম্, কিন্তু একবার দেখেই মনের মধ্যে যার মুখের ছায়া জেগে উঠেচে, তাকে তো আমি কোনো দিনই ভুল্‌তে পারি নি! সুরিকে তার হাতে দিয়ে ঘরে এসেই বাবা আমাকে বল্‌লেন, "পলি', এ কিন্তু বেশ হ'ল," এ দুটী খেলার পুতুল নিয়ে জীবনের শেষ কটা দিন কাটিয়ে যাব! ছেলেবেলাকার প্রত্যেকটা খুটিনাটী এর পর এদের যে কতখানি আনন্দ দেবে, তাই মনে করে সত্যি আমার ভারি ভাল লাগ্‌চে; নির্ম্মল তোদের ছোট ভাইয়ের মত হ'ল, শৈলেশেরও যে কতখানি বল ভরসা বাড়্‌ল, এ সব যে আমি চোখেই দেখে যেতে পার্‌ব তা'তো একবারটীও মনে করি নি!" বাবার চোখের পাতা জলে ভিজে উঠ্‌ছিল, কিন্তু চোখের জলের ভেতরেও যে অতখানি সুখ থাক্‌তে পারে তা' সে দিন যেমন করে জেনেছিলাম, তেমন তো আর জানি নি। কিন্তু তখন তো ভাবি নি বাবার চোখের জল বছর না ফির্‌তেই

কোন্ মূর্ত্তিতে দেখা দেবে! কপাল পুড়ে গেল, তা' আট বছরের মেয়ে কি বুঝ্বে, সে তার খেলার ঘর নিয়ে, পুতুল নিয়ে রইল! বৌদিকে ঘরে এনে দিয়ে বাবা যে দিন চলে গেলেন, সে দিন ব্যথা কি শুধু এক দিক্ দিয়েই এলো? এ যে পাহাড় সমান জমে উঠ্তেই থাক্ল;—এর কি শেষ নাই, অন্ত নাই? বৌটার মুখের দিকে চাইতে পারি না; স্থরির উপর চোখ পড়্লে বুকের রক্ত শুকিয়ে ওঠে, আর মা আমার এই সব ব্যথা সইবার জন্য রহিলেন," বলিয়াই উৎপল দুই হাতে আঁচল তুলিয়া মুখ ঢাকিল।

সতীশ কহিল, "কত দিনই তো তোমাকে বলেছি, দুঃখকে বাঁচিয়ে রাখ্তে চাওয়াটাই একটা মস্ত অন্যায়! যা' এসে গেছে, শুধু তারই স্মৃতি নিয়ে থাক্তে চাইলে, বুকের ভিতরটা নিশিদিন ক্ষতবিক্ষত করেই রাখা হয়! লাভ কিচ্ছু নেই তো; শুধু ব্যথাই বাড়ে। দুনিয়ার মালিকের বিচারের উপর এতটুকু সন্দেহও না রাখ্লেই ঠিক্ কাজ করা হবে, উৎপল! সুখ দুঃখ, হাসি কান্না নিয়েই তো মানুষের জীবন। এর সুখকেও যেমন আলিঙ্গন করতে হবে, দুঃখকেও ঠিক তেমনি স্বীকার করে নিতে হবে!—এ না করেও তো বাঁচবার যো নেই; আর তার পথও কি ঠাকুর তৈরী ক'রে রাখেন নাই? আজ্কার দুঃখের তীব্রতা দুদিন বাদেই যদি কমে না যেত, মানুষ কি বাঁচ্ত? এ সব কথা তো কতবারই বলেচি,—আজ কি আর নূতন করে বল্তে হবে?" বলিয়াই দুই হাতে উৎপলকে বুকের কাছে টানিয়া একটু কাল চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "চোখের জল ফেলে যা' এসে গেছে, তাকে যখন ফেরানো যায়ই না, তখন বুকের ভিতর দুঃখকে পুঞ্জীভূত করে রেখে লাভ নেই তো কিছু!"

উৎপল সতীশের বুকের কাছে মুখ গুঁজিয়া রাখিয়াই কহিল, "কিন্তু

এ সব কি ভুল্‌বার কথা, এর প্রত্যেকটা খুটিনাটীই যে আমার কাছে আর তুচ্ছ কর্‌বার মত কিছু নয়! সবি যে বুকের মাঝে দাগ কেটে বসে গেছে! বাবার চোখের জল, নির্ম্মলের কচি মুখখানি,"—কিন্তু কথাটাকে শেষ করিয়া ফেলা উৎপলের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব হইয়া উঠিল।

সতীশ জানিত, শোক জিনিষটাকে জোর করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিতেই হয়; বাড়িতে দেওয়া কোনও ক্রমেই ঠিক নহে।

তাই একটু হাসিয়া কহিল, "কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা হ'ল তোমার মার চোখের জল! তাঁকে একটু শান্তি দেবার চেষ্টাই কি আমাদের কাছে সব চেয়ে বড় কাজ নয়, পলি?"

উৎপল কোনও কথা না বলিয়া মুখ তুলিয়া সতীশের মুখের উপর তাহার অশ্রুসজল দুই চোখের দৃষ্টি স্থাপিত করিল।

সতীশ কহিল, "ঠিক্ এই মুহূর্ত্তে নিঃশব্দে নীচেয় নেমে যাও, কিছু কর্‌তে হবে না; শুধু সরযূ না জান্‌তে পায়, এম্‌নি ভাবে তাকে দেখে ফিরে এস! দুনিয়ায় যে কিছুকে বিচার কর্‌তে চাইলে সর্ব্ব প্রথমে নিজেকে ভুলে যেতে হবে, তবেই না বিচার কর্‌বার ঠিক্ পথটী খুঁজে পাওয়া যাবে; মানুষ তা' পারে না বলেই তো যত গোল করে তোলে!"

সতীশ শুধু বলিয়াই ক্ষান্ত রহিল না; উৎপলকে সিঁড়ির কাছ পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিল; এবং সে নামিয়া গেলে, দুয়ারের কাছেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

একটু পরেই চোখের জল মুছিতে মুছিতে উৎপল উপরে উঠিয়া আসিতেই, সতীশ কহিল, "কি"—

উৎপল কহিল, "এতটুকু সময়ের মাঝে মানুষের মুখের চেহারা যে এমন করে বদ্‌লে যেতে পারে তা' আজ সুরিকে না দেখ্‌লে কোনো

দিনই বুঝ্‌তাম্‌ না," বলিয়াই অত্যন্ত মলিন মুখে জানালার লোহার শিক-গুলির উপর মাথাটা ঠেকাইয়া দুই চক্ষু বুজিল।

সতীশ কিছু কাল কোনও কথা না বলিয়া নিমেষহীন চোখে উৎপলের দিকে চাহিয়া রহিল, তার পর মৃদুস্বরে কহিল, "কিন্তু কেন এমন বদ্‌লে গেল?"—

"তা' বুঝ্‌তে কোনো মেয়ে মানুষেই কোনো দিন ভুল করে নি'!"—বলিয়াই উৎপল কাঁদিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

দুই দিন পরে সন্ধ্যার দিকে নিজের ঘরটার মধ্যে সরযূ চুপ করিয়া বসিয়া ছিল।

এটা দোতালার উপরকার পূব দিক্‌কার ঘর। জানালাগুলি খোলা ছিল, গলির উত্তরদিক্‌কার একটা বড় বাড়ীর বিজলীর আলো এই ঘরের মধ্যের একটা পাশে আস্তৃত শয্যার উপরেও আসিয়া পড়িয়াছে।

কোলের কাছে খোকা ঘুমাইয়া রহিয়াছে। সরযূ তাহাকে টানিয়া বিছানার যেখানটায় আলো পড়িয়া হাসিতেছিল, ঠিক্ সেইখানটায় সরাইয়া রাখিল; এবং নিজে অন্ধকারের মধ্যে থাকিয়া নির্ণিমেষ চোখে সেই দিকেই চাহিয়া বসিয়া রহিল।

তাহার চোখে এই আলোকস্নাত শিশুর পরম সুন্দর মুখখানি দেবশিশুর মুখের মতই মনে হইল, এবং এর যে ব্যথা হরণ করিয়া লইবার শক্তি কতখানি, তাহাই মনে করিয়া বিস্ময়েরও সীমা রহিল না!

আজ তাহার শিহরণক্লান্ত অবসন্ন মনটার উপরে ঐ শিশুটীই একটী প্রলেপের মতই লাগিয়া ছিল বলিয়াই সে যে কতখানি বাঁচিয়া গিয়াছে, তাহা সে বেশ করিয়াই জানিয়াছিল।

এই নিবিড় সন্ধ্যায় যখন কলিকাতার পথে, পথে, ফেরিওয়ালার দল বেলফুলের মালা যাচাই করিয়া ফিরিতেছিল; দূরের ও নিকটের দু একটা বাড়ী হইতে গানের ছিন্ন সুর ভাসিয়া আসিতেছিল এবং খোলা মাঠের দিক্ হইতে যুবকদলের উচ্চ হাসির রোলের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের কলরব মিশিয়া আকাশ বাতাস মুখর করিয়া তুলিতেছিল, ঠিক্ তখনই অত্যন্ত হাঁপাইয়া উঠিয়া সরযূও তাহার নির্জ্জন ঘরটার মধ্যে আসিয়া আশ্রয়

লইয়াছে ; ঐ নিদ্রিত ক্ষুদ্র শিশুটী ছাড়া তাহাকে আনন্দ দিবার মত কিছুই এই বিরাট সহরটার মধ্যে তো ছিলই না ; বরং তাহার মনে হইতেছিল, এর ইট্ পাথর ইমারৎ আলোকের মধ্যে, এর কর্ম্মব্যস্ত কোলাহলের মধ্যে, তাহার অন্তরের রসধারাটী পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে !

অন্তহীন বিচিত্র ব্যথার অনুভূতি মানুষের বুকের মধ্যে কেনই বা চির দিনের জন্য বাসা বাঁধে, আর কেনই বা দিন নাই, রাত নাই, অহরহঃএর অস্তিত্ব জানাইয়া জানাইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া তোলে, এতটুকুও স্বস্তি দেয় না, সত্যই এ সব কথার মীমাংসা কি কিছুই নাই ?

এ একটা নূতনতর ব্যথার ছন্দ বুকের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে ; এর সঙ্গে পরিচয় বহু পুরাতন, না একেবারেই নূতন ; এ বুকের ভিতরেই এত কাল কুম্ভকর্ণের নিদ্রা লইয়া মূৰ্চ্ছিত পড়িয়া ছিল, সবে মাত্র জাগিয়া উঠিয়া রাক্ষসী ক্ষুধা জানাইয়া দিল, না বাহির হইতে নিশ্বাসের সঙ্গে বহিয়া আসিয়া বুকের ভিতরে আশ্রয় লইয়াছে ?

কিন্তু এর অফুরন্ত দাবীর নীচে মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া থাকিতেও যে মানুষের অন্তর উন্মুখ হইয়া উঠিতে পারে, এই পরম অদ্ভুত ব্যাপারটা সরযূর কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর ঠেকিল !

কিন্তু ব্যথার মধ্যেও এই যে মৃদু পুলক শিহরণ, একে সে তো অস্বীকারও করিতে পারে না !

ঠিক্ যে মুহূর্ত্তে নিজের মনের সব চেয়ে বড় গোপন খবরটা তাহার কাছে ধরা পড়িয়া গেল, তখন এই মনে করিয়াই, সে বার বার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল যে, এ কথাটার লজ্জাও যেমন কম নহে, তেমনি ইহার দেওয়া অস্বস্তির পরিমাণটাও তুচ্ছ করিবার কিছু নহে।

কিন্তু তবু এই অত্যন্ত অবুঝ মনটাকে কি কোনো মতেই বুঝানো যায় ? না এর সঙ্গত, অসঙ্গত দাবীগুলিকে উপেক্ষা করা চলে !

সরযূ হঠাৎ উঠিয়া পড়িল ; এবং বিজলীর আলোকস্নাত নিদ্রিত শিশুর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া চাহিতেই তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল !

দুনিয়ার কত বড় নিবিড় প্রীতির চিহ্ন ঐ অবোধ মুখের উপর আঁকা রহিয়াছে, তাহা সে এই মুহূর্ত্তেই যেন ভাল করিয়া জানিল !

কিন্তু এ সব কথা মনে উঠিতে বুকের ভিতরটা এমন করিয়া কাঁটা দিয়াই বা উঠে কেন, আর নিজেরই একটা কাঙ্গাল, লুব্ধ মূর্ত্তি চোখের কাছে জাগিয়া উঠিয়া, এমন করিয়া মাথা খুঁড়িয়া মরে কেন ?

হঠাৎ মুখ তুলিয়া চাহিতেই, রাস্তার ওপাশের বড় বাড়ীর খোলা ঘরটার দিকে চোখ পড়িল। সেখানে উজ্জ্বল আলোকের মধ্যে দাঁড়াইয়া, একটী অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা তরুণী নিঃশব্দে হাসিতেছিল।

তাহার হাসির কারণ আর কিছুই নহে ; ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় প্রাণীটির আগমন সংবাদটা পর্য্যন্ত একেবারেই কাছে পৌঁছায় নাই, ঠিক্ এমনি ভাবে যে ব্যক্তিটী হাতের খোলা বইটার উপর অখণ্ড মনোযোগ দিয়া বসিয়া ছিল, তাহাকে জানাইয়া যাওয়া, যে, যে আসিয়াছে সে সহজে চলিয়া যাইতে তো আইসেই নাই ; বরং সেখানে থাকিয়া তাহাকে কিছু কাল জ্বালাতন করিতেই আসিয়াছে।

ও ঘরটার ভিতরকার নিঃশব্দ হাসির লহর আলোর পথ ধরিয়া এ ঘরের মধ্যেও ভাসিয়া আসিতেছিল। এই তরুণ তরুণীর ছন্দলোল গতি, নিবিড় আলিঙ্গন, বিহ্বল দৃষ্টি আগাগোড়াই বায়োস্কোপের ছবির মতই সরযূর বিস্ময়ম্লান দৃষ্টির সম্মুখে চঞ্চল হইয়া ফিরিতেছিল !

জ্যোতির্ব্বিদেরা বলেন, এমন নক্ষত্রও নাকি আছে, যাহার আলোক-লেখা সৃষ্টির আদিবেলা হইতে ছুটিয়াও মানুষের চোখের কাছে আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই। এবং যে দিন পৌঁছিবে ঠিক্ সেই দিনই সে

একটা নূতন নক্ষত্রের আকারে দেখা দিবে,—অথচ তাহার অস্তিত্বই হয় তো বহু যুগযুগান্তর পূর্ব্বে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে !

সরযূরও মনে হইতেছিল, তাহার বুকের মাঝখানে এই যে একটা নূতন আলোক রেখাপাত করিল, এই আলোকে যাহার ছবি মূর্ত্ত হইয়া উঠিবার কথা, তাহাকে সে তো কত খুঁজিয়াই দেখিল ;—কিছু পাইল কি ?

অথচ পাওয়ার মত যা' কিছু অপ্রাপ্য রহিয়া গেছে ; এবং দেওয়ার মত যা' কিছু সবই অটুট পড়িয়া রহিল !

এ একটা জীবনের প্রকাণ্ড বোঝা, একে টানিয়া টানিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও তাহা মুখ ফুটিয়া বলিবার যো' নাই !

লক্ষ্মণ ঠাকুরের ফল ধরিয়া থাকিবার মত, এই দুর্বহ বোঝাটাকে কত কালই যে ধরিয়া রাখিতে হইবে, তাহাও তো একেবারেই জানা নাই !

সরযূ একবার দুই হাতে ললাটলুণ্ঠিত চূর্ণকুন্তলগুলি সরাইয়া দিল ; হাতের সূক্ষ্ম স্বর্ণচূড়ি করগাছি টানিয়া টানিয়া উপরের দিকে তুলিল ; একবার কপালের পাশ দুইটা টিপিয়া ধরিল ; তার পর মুখ তুলিয়া ও বাড়ীর ঘরটার দিকে চকিত দৃষ্টিতে চাহিল। সেখানে তরুণ দুই হাতে তরুণীর পরম সুন্দর মুখখানিকে তুলিয়া ধরিয়া, তাহার গভীর কালো চোখের লজ্জাকুণ্ঠিত দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলাইতেছিল, এবং একটা বেল-ফুলের গোড়ের মালা কণ্ঠে দুলাইয়া দিতেছিল !

সরযূর মনে হইল, মানুষের বুকের ভিতর যে কিশোরকিশোরী চির দিনের জন্য বাসা বাঁধিয়া রহিয়াছে, তাহারাই এইমাত্র বাহিরে আসিয়া ঐ তরুণ-তরুণীর রূপে বিশ্বের চিরন্তন গোপন খেলাটী দেখাইয়া গেল !

সরযূ দুই হাতে নিদ্রিত শিশুকে টানিয়া বুকের কাছে তুলিয়া আনিল, পরমুহূর্ত্তেই ভীতা কুরঙ্গিণীর মতই ত্রস্তপদে নীচে যাইবার সিঁড়ির দিকে ছুটিয়া আসিল !

পাশের ঘর হইতে সতীশ ডাকিয়া কহিল, "আমার কথা না শুনে নীচে যেও না, সরযূ !"—

সতীশের বিছানার উপর খোকাকে শোয়াইয়া দিতে দিতে সরযূ কহিল, "আমি আস্‌ব এখনি, সতীশ বাবু ! দিদি কি কর্‌চে একবার খোঁজ নিয়ে আসি।" বলিয়াই উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু ঠিক্ তখনই একেবারে নীচে না যাইয়া, সিঁড়ির অন্ধকারের মধ্যেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

খানিকটা অন্ধকারের মধ্যে নিজেকে কিছুক্ষণের জন্য লুকাইয়া রাখিবারও যেন একটা প্রয়োজন ছিল ; তাহার কারণ শুধু এই যে, ঠিক্ এই মুহূর্ত্তে নিজের দিকে চাহিয়া দেখিতে তাহার নিজেরই লজ্জা করিতেছিল !

আলোকহীন ঘরটার মাঝে, যত রাজ্যের ভাবনা চিন্তার ওলটপালটের মধ্যে, এতক্ষণ যে সব কথা তাহার কাছে একটা মোহের সৃষ্টি করিয়া তুলিতেছিল, সতীশের ডাকে, এবং তাহার ঘরের উজ্জ্বল আলোকের মধ্যে, সেই সব কথারই যাদু খসিয়া পড়িয়া, ভোজবাজি খেলার শেষে বাজিকরের অত্যন্ত সাধারণ চেহারার মতই, সমস্ত বিস্ময়, পুলক, বেদনাকে অত্যন্ত বিশ্রী করিয়াই দেখাইয়া দিয়াছিল।

কিন্তু মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেই তাহার বুকের ভিতরে কি ওলটপালটই গিয়াছে !

ঝড়ের রাত্রিতে বিশ্বের সমস্ত প্রয়োজনকে ডুবাইয়া দিয়া, যখন প্রলয়ের বিকট ঝঞ্ঝা গর্জ্জিতে থাকে, তখন কেহই তো মনে করে না,

যে, প্রভাত অরুণ কালও আবার হাসিয়া এই আহত প্রকৃতিকেই নন্দিত করিবে ; এবং আবারও এর দিকে দিকে সুন্দরের খেলা চলিবে, উৎসব জাগিয়া উঠিবে !

নীচে হইতে উৎপলের গলা শুনা গেল, "সুরি !"—

সরযূ দ্রুতপদে নামিয়া যাইতেই কহিল, "ওঁদের আস্‌বার কথা ছিল, বোধ হয় এলেন। তুই যা' ত উপরে, এসে দোর খুলে দিতে বল্।"

সরযূর উপরে উঠিয়া যাইতে ও সতীশের নীচে নামিয়া আসিয়া দোর খুলিয়া দিতে যেটুকু সময় কাটিয়া গেল, সে সময়ের মধ্যে একটু কালের জন্যও সরযূর বুকের ভিতরকার কম্পন তো থামিলই না, বেশীর ভাগে তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, যে, তাহার মুখে চোখেও এ সবের ছাপ পড়িয়া যাইতেছে ; এবং যে কেহ মুখ দেখিয়াই তাহার মনের কথা জানিয়া ফেলিতে পারিবে !

পশ্চিম দিক্‌কার ঘরটায় চলিয়া আসিয়া জানালার কাছে দাঁড়াইয়া, নির্ণিমেষ চোখে খোলা মাঠটার দিকেই চাহিয়া রহিল ; কিন্তু এটা যে লুকানো মোটেই হইল না, শুধু অষ্ট্রিচ্ পাখীর মতই বালির মধ্যে মুখ গুঁজিয়া থাকিয়া বিপদকে ডাকিয়া আনা হইতেছে, ইহাও সে বেশ্ জানিত !

নীচের বসিবার ঘরে সতীশ যখন অশ্রুময়ের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল, তখন উৎপল, কল্যাণী ও মানদাসুন্দরীকে সঙ্গে লইয়া, উপরে উঠিয়া আসিল ; এবং সরযূকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া কহিল, "এটী আমার বোন্ সরযূ ;—ওঁকে প্রণাম কর্, সুরি !"

সরযূ প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই, মানদাসুন্দরী তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া, মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে "বেঁচে থাক মা, সুখে থাক" বলিয়াই মুখ ফিরাইয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন,

"মা লক্ষ্মীর নারায়ণটী বুঝি এখনও জুটিয়ে দাও নি, মা,—" বলিয়াই উৎপলের বিবর্ণ ম্লান মুখের উপর চোখ্ পড়িতেই চমকিয়া উঠিয়া চুপ করিয়া গেলেন ; এবং অজ্ঞাতে একটা অতর্কিত বেদনার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছেন বুঝিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন।

কথাটা একেবারেই চাপা দিয়া ফেলিবার জন্য কল্যাণীর দিকে মুখ ফিরাইয়া হাসিতে হাসিতে উৎপল বলিল, "সুরি, বোধ হয়, ওর এক বয়সীই হবে ! একলাটী প'ড়ে ও তো একেবারে হাঁপিয়েই উঠেছিল, এইবারে কল্যাণীর সঙ্গ পেয়ে বেঁচে যাবে।"

এর পর কথা অনেকই হইল, কিন্তু কোনও কথাই তেমন জমিয়া উঠিল না।

দুনিয়ার নিত্যকার কাজকর্ম্ম কোলাহলের মধ্যেও হঠাৎ এমন এক এক জনের সঙ্গে দেখা হইয়া বসে, প্রথম দৃষ্টিতেই যাহার দিকে বুকের অজস্র স্নেহ ও প্রীতি, পূর্ণিমার দিনকার সমুদ্রের মতই, উদ্বেলিত হইয়া উঠে !

আজ এই অত্যন্ত স্নেহশালিনী নারীর বুকের ভিতরকার স্নেহ প্রীতিও সরযূর জন্য নিবিড় হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাকে দেখিয়াই কল্যাণী এবং মানদাসুন্দরী উভয়ের মনের মধ্যে প্রথমেই এই কথাটা উঠিয়াছিল, যে, একে পাইলে বেশ্ হয় ;—লক্ষ্মীর মতই এর রূপ ; গৃহের শ্রী অটুট্ রাখিতে ঠিক্ এমনটীই চাই !

কিন্তু বিধাতাপুরুষটী এই মেয়েগুলির কপালে যখন এদের অদৃষ্টের কথা লিখিতে বসেন, তখন কি এদের মুখের দিকে একবারটীও চাহিয়া দেখেন না ?

চলিয়া যাইবার সময় সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া, উৎপলের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে মানদাসুন্দরী কহিলেন, "কি আর বল্‌ব মা,

যতখানি আনন্দ নিয়ে তোমার বাড়ীতে পা' দিয়েছিলাম, ফির্‌বার বেলা তা' নিয়ে যাওয়া অদৃষ্টে ছিল না! আজ ওকে দেখে আমার কেবলই মনে হচ্ছে, মা, এ কেন? এই সব কচি বাছারা হাস্‌বে, খেল্‌বে, সারা জীবন ভরে কত সুখ আহ্লাদ করবে, তা' নয়! এই বয়সেই এদের শুক্‌নো ফুলের মত মুখের চেহারা, দেখ্‌তে বুক ফেটে যায়! মনে সুখ নাই, বুকে ব্যথার অন্ত নাই! ওরে, এদের অপরাধই বা কি, আর অদৃষ্টে এমন দুঃখই বা লেখা কেন!"—গলাটা একেবারেই বুজিয়া আসিতেছিল, একটু কাল চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "ভেবেছি অনেক, কিন্তু এতখানি বয়সেও এ কথাটা ভাল বুঝ্‌তে পার্‌লাম না, যে, এদের মুখে হাসি ফিরিয়ে আন্‌বার উপায় করাই ঠিক্; অথবা এই চির দিনের ব্যবস্থার নীচে মাথা পেতে দেওয়াই ভাল! কিন্তু মা, স্বার্থ জিনিষটা একটা খাঁটি কষ্টিপাথরেরই কাজ করে;—মনের আসল কথাটার দাগ ঠিক্ তখনই ধরা পড়ে, যখন মানুষের স্বার্থে আঘাত লাগে। একটা বিশেষ মুহূর্ত্তে দেখাশুনার উপরে মানুষ চির দিনই জোর দিয়ে আস্‌চে! আজ তোমাদের দুটীকে দেখে, প্রথমেই আমার এই কথাটাই মনে হয়েছে, এরা আমার পেটের মেয়ের চেয়ে কোনও অংশেই কম নয়। এই দু'ঘণ্টা ধরে আমার কেবলি মনে হয়েছে, এরা আমার চির দিনের কেউ, এদের ভাল মন্দর সঙ্গে আমার ভাল মন্দও জড়ানো রয়েচে। আজ ওর সুখদুঃখের কথা বুকের কাছে যতটা দাগ কেটে বসে গেছে, এমন তো আর কিছু কোনো দিন যায় নি মা! তাই কেবলি মনে হচ্ছে, এ কেন! এই কচি মেয়ের মুখের হাসি এমন করে নিভে যাবে কেন?"

গলার স্বর গাঢ় হইয়া আসিতেছিল, দুই চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কথাগুলি যাহার কাছে বলিতেছিলেন, সেই

উৎপলের মুখের উপর দৃষ্টি পড়িতেই, একেবারেই চুপ করিয়া গেলেন। উৎপলের বুকের ভিতরকার গভীর দুঃখের পরিচয় তাহার অশ্রুক্লিন্ন দুই চোখে ফুটিয়া রহিয়াছে। চোখের জলে মাখামাখি পরম সুন্দর মুখখানি দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া মানদাসুন্দরী কহিলেন, "ওরা নেমে আস্‌চে, চোখের জল মুছে ফেল, মা!"

হাত ধরাধরি করিয়া কল্যাণী ও সরযু নীচে নামিয়া আসিতেছিল। উৎপল তাড়াতাড়ি কলের কাছে মুখ ধুইতে চলিয়া গেল!

মার মুখের দিকে চাহিয়া দুই হাতে সরযূর মুখ তুলিয়া ধরিয়া, কল্যাণী হাসিতে হাসিতে কহিল, "এমন মুখ তুমি দেখেচ, মা?"—

সরযূকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া, তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে একটা ছোট নিঃশ্বাস ফেলিয়া মা কহিলেন, "ও যে আমার মা, কল্যাণী, মায়ের আমার জগদ্ধাত্রীর রূপ তা কি আব আমি জানি না রে?" বলিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

নীচের কাজ-কর্ম্ম সারিয়া ঘরে আসিয়া উৎপল দেখিল, তখনও সতীশ টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি লিখিতেছে। উৎপল কাছে আসিয়া, মাথাটা ধরিয়া নাড়িয়া দিতেই সতীশ মুখ না তুলিয়াই একটু হাসিয়া কহিল, "কি?"—

উৎপল মলিন মুখে কহিল, "অশ্রুর মা বোন্ এসে গেলেন! নিত্যিকার ঘটনার মতই এর মাঝে বিশেষত্ব কিছুই নেই তো। কিন্তু আমি কিছুতেই স্থির থাক্‌তে পার্‌চিনে যে! ওগো, তুমি আমায় বলে দাও, কোন্ পথ ঠিক্ হবে! এই দুর্ব্বল মেয়ে-মানুষের মন জন্ম জন্মান্তরের সংস্কারের নীচে মাথা পেতে দিয়েই রয়েচে, একে আমি বুঝিয়ে ঠিক্ কর্‌তে পারব বলে মনে করিনে; কিন্তু তবু এই মনটার অশান্তিরও তো সীমা নেই। ওর বুকের ভিতরকার জমাট্ দুঃখের

বোঝাটা যে আমারও নিঃশ্বাস রোধ করে তুল্‌বার যোগাড় করেছে! সত্যি এই অবুঝ মনটাকে এখন থেকে আমি শক্ত করে তুল্‌বই; ওগো, তুমি যা' মনে কর, আমি আর কোনো আপত্তিই কর্‌ব না" বলিয়াই উৎপল আঁচল তুলিয়া, একবার চোখ দুইটা মুছিয়া লইল।

কলমটা ফেলিয়া রাখিয়া, দুই হাতে উৎপলকে কাছে টানিয়া আনিয়া, এবং কিছুক্ষণ গভীর স্নেহে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, সতীশ ধীরে ধীরে কহিল, "কঠিন পাথরের বুকে আছ্‌ড়ে পড়্‌লে নিষ্ঠুর আঘাত লাগবেই পলি; কিন্তু সে আঘাতটা যতই প্রবল হোক্ তার উপর যেমন প্রলেপও দিতে হবে, তেমনি তাকে "নেই" বলে ঝেড়ে ফেল্‌তেও হবে। নইলে দুনিয়ায় দুঃখ-কষ্টের অন্ত তো নেই, যেগুলি সাম্‌নে এসে পড়েছে, তাদের মিটিয়ে ফেলে যারা আস্‌চে, তাদের জন্য প্রস্তুত থাক্‌তে হবে! কোনো দুঃখই অতর্কিতে এসে পড়ে যেন মুস্‌ড়ে দিয়ে না যেতে পারে! আর এ সব দুঃখ-কষ্ট যাঁর হাত থেকে আস্‌চে, তিনি তোমার আমার বুকের ভিতরকার খবরও তো রাখেন, উৎপল।"

উৎপল একটী কথাও বলিল না। মুখ উঁচু করিয়া সতীশের মুখের দিকে পলকহীন চোখে চাহিয়া রহিল। তাহার দুই কপোল বাহিয়া অশ্রুবিন্দু নামিতেছিল।

টেবিলের উপরকার চিঠির কাগজখানার দিকে চাহিয়া সতীশ কহিল, "মা বৌদিদিকে নিয়ে এখানে এসে, যদি ক'টা দিন কাটিয়ে যান্, বেশ—হয় না? আমি তো তোমায় না জিজ্ঞাসা করেই চিঠি লিখে ফেলেছি। কি বল?"—

কেন এই আয়োজন, উৎপল তাহা মনে মনে নিঃসন্দেহ বুঝিয়া কহিল, "তোমার ইচ্ছাকে ছাপিয়ে আমার ইচ্ছা কোনো দিনই উঠ্‌বে না, তুমি যা' কর্‌বে, তা'তে আর আমার কোনো প্রশ্নও নেই,

'সন্দেহও নেই ! যদিই কথায় কাজে দুর্ব্বলতা এসে পড়ে, তুমি ক্ষমা করে নিতে পার্‌বে, তাও আমি জানি ; কিন্তু বাঙ্গালার এই মেয়েমানুষগুলো যে কত বড় দুর্ব্বল, তা' তুমিও বুঝি ভাল করে জান না"—বলিয়াই উৎপল মুখ ফিরাইয়া লইল।

একটু হাসিয়া সতীশ কহিল, "শুধু ঐ একটা যায়গাতেই 'দ্বিধা রয়ে গেছে পলি' ! বাঙ্গালার মেয়েগুলির এই দুর্ব্বলতার মূল্য যে কতখানি তা' জানি বলেই মনে হয়, সব চেষ্টাই আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে। তোমার চেয়েও ভয় আমার বেশী করে ঐ সরযূকে নিয়েই। বাঙ্গালার মেয়ের চির দিনের এই সংস্কারটীকে ধুয়ে মুছে ফেল্‌তে যে কতখানি আয়োজন কর্‌তে হবে, তা' ঠিক্ বুঝেচি কি না জানি না, কিন্তু অনেক সময়েই মনে হয়, মন্দাকিনীর ধারার মতই বাঙ্গালার মেয়েদের বুকের ভিতরকার নিষ্ঠ প্রীতির ধারাটী এই যে একই পথ ধরে চির দিন চলে এসেছে,—একে ফিরিয়ে অন্য পথে নেওয়া কোনো দিনই হয় তো সম্ভব হবে না ; এবং যাকে নিয়ে এ পরীক্ষার আরম্ভ হবে, হয়তো তার কাছ থেকেই সব চেয়ে বড় বাধা আস্‌বে ! বুকের ভিতরে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার মত এতটুকু স্মৃতিও যদি খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, আমার মনে হয় পলি', ভারতের আর যেখানেই চলুক্, বাঙ্গালার মেয়েদের মধ্যে এ চল্‌বে না ! এ যে কলঙ্ক ঢাক্‌বার আয়োজন নয়, এ কথাটা তো দুবার করে বল্‌তে হবে না ! যারা কলঙ্কের ছাপের নীচে মাথা পেতে দিয়েছে, তাদের বাঁচাবার এবং সমাজে একটা স্থান দেবার চেষ্টা এই যে চারিদিকে চলেছে, তা' নিয়ে তর্ক তুলে লাভ নেই ; কিন্তু শুধু এই কথাটাই আমার সব সময়ে মনে হয় যে, সত্যিই স্বামীকে যে জানে নি এবং যার মনের ভিতরে কোনো দাগই পড়ে নি, তাকে সমাজের চির দিনের ব্যবস্থার নীচে চেপে রেখে, দুনিয়ার সকল সুখ থেকে বঞ্চিত করাটা ঠিক কি ? তাদের অপরাধ তো

কিছুই নেই পলি'! কিন্তু সুখ-দুঃখের খবরের বাইরেও তো কাউকে নিয়ে যাওয়া চলে না।

ঐ সরযূ,—অতটুকু মেয়ে,—ওকে কত দিক্ দিয়েই পরীক্ষা করে দেখেচি! দুঃখ জিনিষটাকে হাসিমুখে গ্রহণ কর্‌বে বলে ও যে নিজের অন্তরটাকে কতখানি ক্ষতবিক্ষত করে তুলেচে, তা' আর কারু কাছে ধরা না পড়ুক্ আমার চোখ্ এড়ায় নি ত! মানুষের বুকের ভিতরকার দাবীকে অস্বীকার কর্‌বার উপায়ও যে কিছু আছে, তাও তো ঠিক্ জানিনে"—

সতীশ হঠাৎ চুপ করিয়া গেল। তার পর চেয়ারটা ছাড়িয়া উঠিতে উঠিতে কহিল, "কথা বাড়িয়ে এ সবের মীমাংসা কোনো দিনই হয় নি পলি'! কতই তো ভেবে দেখ্‌লাম। সন্দেহ সংশয়কে একটু জোর করেই ঝেড়ে ফেল্‌লে দূর করা সম্ভব হবে।"

উৎপল কোনও কথা না বলিয়া, খোলা জানালার কাছে যাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাঠটার ওপারেই অশ্রুদের বাড়ী দেখা যাইতেছিল। অনুজ্জ্বল আলোকে উপরের ঘর দুইটীর ভিতরকার কিছুই সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না। তবু উৎপল একদৃষ্টিতে সেই দিকেই চাহিয়া রহিল।

সতীশ কাছে আসিয়া, পরমস্নেহে উৎপলের কাঁধের উপর হাত রাখিয়া দাঁড়াইল।

উৎপল একটু জোর করিয়া হাসিয়া কহিল, "কল্‌কাতার এ দিক্‌কার এই যায়গাটুকু ইট্ পাথরে ভরে না দিয়ে ফাঁকা রেখেছে কেন বল্‌তে পার?"—

সতীশ কহিল, "এই ফাঁকা যায়গাটুকুর আলো বাতাসের মূল্য অনেক বেশী। মাঝে মাঝে অম্‌নি ফাঁকা যায়গা রেখেই কল্‌কাতার লোকগুলার বাঁচ্‌বার পথ করা হয়েচে।"

"তা' হলে এত ইট্-পাথরের আয়োজনের মধ্যে ও ফাঁকা যায়গার দরকার রয়েচে ?"

"তা' রয়েচে বই কি" বলিয়াই সতীশ উৎপলের মুখের দিকে চাহিল।

"কিন্তু মানুষের বুকের ভিতর ভগবান্ কি একটুও ফাঁকা রাখ্তে পারে নাই ? কেবলি দুঃখ-কষ্টে ভরে রাখ্লেন !" বলিয়াই উৎপল মুখ ফিরাইয়া লইল।

সতীশ কোনও কথা কহিল না। নীরবে উৎপলের পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

নীচের রাস্তার উপরকার গ্যাসের আলোটার চারিপাশের কাঁচ ঘিরিয়া আলোকলুব্ধ পতঙ্গের দল জুটিয়াছে ; উৎপলের মনে হইল, দুঃখ উহাদেরও কম নহে এবং দুঃখটা যে মানুষেরই একচেটিয়া নহে, ইহা মনে করিয়া একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

২২

সপ্তাহখানেক পরে এক দিন সন্ধ্যার পর নীচের ছোট একটা ঘরে পূজার আসনের উপর বসিয়া ক্ষমাসুন্দরী মালা ফিরাইতেছিলেন।

প্রতিমা আসিয়া পায়ের কাছে বসিয়া পড়িয়া কহিল, "শরীরটা আজ বুঝি মোটেই ভাল নেই, মা!"

প্রথমটা কোনও উত্তর দিলেন না, একটু পরেই হাতের মালা কপালে ছোঁয়াইয়া কহিলেন, "ঘণ্টায় ঘণ্টায় এ পোড়া শরীরের খবর দিয়ে তো আর আমি পারিনে, মা! আর তোমারও তো বাছা. একটু বিরক্তি নেই! কি হবে এই হাড় কয়খানার অত খবর নিয়ে? দু'দণ্ড আমার কাছে বস্‌বে, তা' তো তোমায় দিয়ে হবার যো' নেই! আর এত কাজও তুমি জুটিয়ে নিতে পার বাপু!"

প্রতিমা পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে মনে মনে কহিল, "ও হাড় কয়খানার খবর যে আমার নিজের হাড়ের খবরের চেয়েও কত বেশী করে জান্‌বার দরকার রয়েচে, সে শুধু আমিই জানি!"

"কল্‌কাতা এসে কাজ তো আর করিই নে মা! ঠাকুরঝি কি কিচ্ছুটী কর্‌তে দেয়," বলিয়া প্রতিমা একটু হাসিবার চেষ্টা করিতেই, চোখে জল আসিতেছে বুঝিয়া মুখ নত করিয়া লইল।

মনের মধ্যে একটা দুঃখের বোঝা চাপিয়া বসিয়া ছিল। এই মাত্র উৎপলের নিকট হইতে সে আসিতেছে, তাহার চোখের জলে মাখামাখি মুখখানি দেখিয়া আসিয়াছে, তাই চেষ্টা করিয়াও হাসিবার শক্তি তাহার আর ছিল না।

প্রতিমা কহিল, "তোমার নাড়ীর টান যে আমার উপরেই সব চেয়ে

বেশী করে রয়েচে, এ খবরটা কিন্তু কারুই জান্‌তে বাকী নেই মা। তাই যা' আর কেউ তোমাকে জানাতে সাহস পায় না, তা' জানাবার ভার তোমার এই অপদার্থ মেয়েটার উপরেই দিয়ে রাখে। আমার সব অপরাধই যে তুমি ক্ষমা করে নেবে, এইবা কেমন কথা,—কিন্তু মা আমারও যে সাহস কতখানি বেড়ে গেছে, তা' মনে করে আমি নিজেই অবাক্ হয়ে যাই। তোমার পায়ে আমার কত নালিশই তো জানিয়েছি,—আজও আবার যে কথা কেউ জানাতে সাহস কর্‌ল না তাই জানাতে এসেছি মা,"—বলিয়াই চোখ্‌ তুলিয়া ক্ষমাসুন্দরীর মুখের দিকে চাহিল।

বেশী কথা বলা প্রতিমার স্বভাব নহে; আসল কথাটা তুলিবার জন্য এতগুলি কথা অনর্গল বকিয়া সে নিজেই একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল।

একটা অজানিত আশঙ্কায় ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেও, কিছু করিবার নাই বলিয়া মানুষ যেমন নিরুপায় হইয়া বসিয়া থাকে, ঠিক তেমনি ভাবে আসনটার উপর বসিয়া রহিয়াছেন; দুই চোখের ম্লান দৃষ্টিতে মনের উদ্বেগ প্রকাশ পাইতেছিল। মজ্জমান ব্যক্তির শেষ আশ্রয়ের মতই মালাগাছটী দুই হাতের মুঠার মধ্যে চাপিয়া ধরিয়াছেন।

প্রতিমা হাসিয়া কহিল, "নিত্যিকার মতই একটা সোজা কথা জানাতে এসেছি, একেবারেই ভয় পেয়ে গেলে যে, মা!"—

প্রতিমার হাসি দেখিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "আমি কি আর মানুষ আছি, মা! কাউকে কাছে এসে বস্‌তে দেখ্‌লেও ভয় হয়, ভাবি কি খবর নিয়ে এল; দূরে নিকটে কে কোথায় কেমন আছে। উপরের ঘরে তোমরা রয়েছ, জোরে কথাটা শুন্‌লেও চম্‌কে উঠি, কার কি হ'ল,"—

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, একটা নিঃশ্বাস একটু জোরে ফেলিয়া কহিলেন, "বুকের ভিতরটা কি পাথর চাপা হয়েই রইল? মাঝে মাঝে একটা একটা নিশ্বাস জোর করে টেনে না ফেল্‌লে যেন দম আট্‌কে আসে মনে হয়! কিন্তু এমন শক্ত করেই এ সব কলকারখানা বিধাতাপুরুষ তৈরী করেছিলেন, যে, বিগ্‌ড়ে যাওয়ার লক্ষণও তো কিছু দেখা যায় না, মা!" বলিয়াই একটু হাসিলেন।

হাসি দেখিয়া প্রতিমার চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল।

ক্ষমাসুন্দরী কহিলেন, "এমন অদৃষ্টই করে এসেছিলাম, মা, একটু মন ঠিক্ করে ঠাকুর দেবতার নাম নেব, তাও কি পারি?"

প্রতিমা অভিমান স্বরে কহিল, "এত জপতপ কর, মা, কিন্তু ঐ ছাই ভস্ম কথাগুলো মুখে না এনে কি পারই না? তুমি মর্‌তে চাইলেই কি আমরা তোমাকে যেতে দিচ্ছি! এই ঠাকুরঝিদের মুখের দিকে চাইলে তোমার কি সত্যিই ও সব মনে কর্‌তে দুঃখ হয় না?"

কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মতই প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তার পর নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "দুঃখ কিসে হয়, আর কিসে যে হয় না, তা' যদি মানুষ হিসেব করে বুঝা'তে পার্‌ত, মা!"

এর পর কিছুক্ষণ আর কোনো কথাই হইল না।

সংসারে আঘাত পাইয়া পাইয়া যাহাদের জীবন একেবারেই তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা মনের মধ্যে মরণের তাপ হরণ ক্ষমতাটার খবর বেশী করিয়াই রাখে! প্রতিমা জোর করিয়া যতই আপত্তি জানাক্, ঐটাই যে সর্ব্বদহন হরণ করিবার একমাত্র পথ, তাহা নিজের মনের মধ্যে কোনও দিনই অস্বীকার করে নাই।

আজ এখনও, কথা যতই বলুক্, তাহার ভিতরকার বিদ্রোহী মনটা তাহাকে অবিরাম জানাইয়া দিতেছিল, যে, ও ছাড়া এ দুর্ভোগের

আর শেষও নাই, তেমনি সকল দুর্ভোগের চরম হইলেও, মৃত্যুটাকে লাভ করারও কোনও উপায় নাই !

প্রতিমা নিজের মনকে এই বলিয়াই প্রবোধ দিত, যে, দুনিয়ার সব ব্যথাকে সহ্য করিতে পারাই ঠিক্ ; কারণ, জীবনকে স্বীকার করিতে গেলে, তাহার সুখকেও যেমন বরণ করিতে হইবে, তেমনি তাহার দুঃখকেও গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই জীবনটার সঙ্গে ঠিক পূর্ণ পরিচয় করা হইল !

ক্ষমাসুন্দরী কহিলেন, "তোমার কথা কি, তা' তো বল্‌লে না, মা ?"—

"অনেক দিনের পুরাণো কথাটা ঠাকুরঝি আজ আবার তুলেছে, জামাইবাবু বল্‌লেন মা, তোমাকে জানাতে।"—

এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিয়াই প্রতিমা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

মাথার উপরে একটা দুরন্ত বোঝা টানিয়া টানিয়া দীর্ঘ পথ অতি-বাহনের পর ক্লান্ত যাত্রী যেমন তীর্থের এপারের খেয়াঘাটে বোঝাটা নামাইয়া ফেলিয়া ওপারের দেউলের দিকে রুদ্ধ নিশ্বাসে চাহিয়া বসিয়া থাকে, প্রতিমাও তেমনি করিয়া ক্ষমাসুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ কোনও কথা কহিলেন না ; মালাগাছটী নিঃশব্দে হাতের মাঝে ঘুরিয়া আসিতেছিল ; হাতের আঙ্গুলগুলি কাঁপিতেছিল। শীর্ণ ঠোঁট দুইখানাও অল্প স্ফুরিত হইতেছিল। একটু পরে ছোট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ক্ষমাসুন্দরী কহিলেন, "যাও, মা, ওদের ডেকে নিয়ে এস,—সতীশকেও আস্‌তে বল।"—

প্রতিমা উঠিয়া গেল।

ঠিক্ তখনই কি কাজে সরযূ ঘরের মাঝে আসিয়া মার দিকে

চাহিয়া চমকিয়া উঠিল। কাছে আসিয়া কহিল, "তোমার মুখ যে কেমন হয়ে গেছে মা, বুকের ব্যথাটা বেড়েছে বুঝি?"

—"কই, না ত!"—বলিয়াই দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া নিতে নিতে মা কহিলেন, "তুই যা' তো, সরযূ, ওপরের ঘরে আমার বিছানাটা ঠিক্ আছে কি না, দেখে আয় তো!"

সরযূ চলিয়া গেল।

যাইবার পূর্ব্বে মুখ ফিরাইয়া আর একবার মার দিকে চাহিল, তার পর মনে মনে কহিল, "বারে, কি অদৃষ্ট নিয়েই তুনিয়ায় এসেছি! যার মুখের দিকে চাই, চোখের জল ছাড়া আর কিছু দেখিনে!"—

সতীশ নামিয়া আসিতেছিল, সিঁড়ির পাশেই সরযূর সঙ্গে দেখা হইল।

সরযূ কহিল, "বেরিয়ে যাচ্ছেন বুঝি?"

"এই স্থকিয়া ষ্ট্রীটের মোড়ের কাছ থেকেই ফিরে আস্‌ব,—দোরটা বন্ধ করে যাও তো লক্ষ্মী! এখুনি আবার খুলে দিতে হবে কিন্তু"—বলিতে বলিতে সতীশ রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

সরযূ তুয়ার বন্ধ করিতে করিতে ফাঁক দিয়া একবার মাঠটার দিকে চাহিয়া দেখিল।

নিস্তব্ধ মাঠটার উপরে চারিদিক্‌কার রাস্তার গ্যাসের আলোক আসিয়া পড়িয়াছে। দিনের কর্ম্ম কোলাহলের পর রাত্রির নিস্তব্ধতা মায়ের শুভ কামনার মতই নামিয়া আসিয়াছে।

সারা কলিকাতার পথে পথে, বিপণিতে বিপণিতে, প্রাসাদে প্রসাদে, যে আলোকমালা জ্বলিয়াছে, তাহারই একটা তুঃসহ আভা আকাশের গায়ের বহুদূর পর্য্যন্ত উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে!

মাঠের ওপারের বাড়ীটার দিকে চকিত দৃষ্টিতে একবার চাহিয়া

দেখিয়াই, সরযূ দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল ; এবং অন্ধকারের মধ্যেই উপরে যাইবার সিঁড়ির গোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল !

মার ঘরে প্রতিমা ও উৎপল কথা বলিতেছিল ; দু' একটা কথা কানে আসিতেই, সরযূ যখন বুঝিল, বিশেষভাবে তাহাকে লইয়াই কথাগুলি চলিতেছে, তখন সে আর না দাঁড়াইয়া সিঁড়ি দিয়া নিঃশব্দে উপরে উঠিতে লাগিল।

এমন সময়ে বাহিরের দুয়ারে কড়া নড়িয়া উঠিল !

সরযূ নামিয়া আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিতে দিতে হাসিমুখে কহিল, "এরি মাঝে ফিরে এলেন, সতীশবাবু !"

খোলা দুয়ারের কাছে এই তরুণী আসিয়া দাঁড়াইতেই নিকটের রাস্তার আলোকটার একটা ঝলক তাহার সর্ব্বাঙ্গে আসিয়া পড়িল।

যে কড়া নাড়িয়াছিল, সে স্তম্ভিতের মতই মুহূর্ত্তমাত্র এই অপরূপ মূর্ত্তির দিকে তাহার বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া ধরিল, তার পরই দুই পা' পিছাইয়া গিয়া কুণ্ঠিতস্বরে, "ভারি অন্যায় হয়ে গেছে ত !—আমি অশ্রু, সতীশবাবুর কাছে এসেছিলাম,"—বলিয়াই তাড়াতাড়ি ছোট মাঠখানা দ্রুতপদে পার হইয়া একেবারে বাসার দুয়ারের কাছে আসিয়া পড়িল।

সরযূ বুঝিতেই পারিল না, যে, সে সেই খোলা দুয়ারের কাঠ্‌টা কখন দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়াছে ; এবং তাহার মাথাটা সেই কাঠের উপরেই একবার চকিতের জন্য লুটাইয়া পড়িয়াছে।

পর মুহূর্ত্তেই সে চক্ষু তুলিয়া সম্মুখের দিকে চাহিল।

নিস্তব্ধ মাঠ পড়িয়া রহিয়াছে ; শুধু দূরের কোন্ একটা বড় রাস্তা কাঁপাইয়া ফায়ার ব্রিগেডের মোটর এঞ্জিন ছুটিতেছিল,

তাহারই ঝন্‌ঝনা প্রলয়ের নির্ম্মম ঝঞ্ঝার মতই কানে ভাসিয়া আসিতেছিল !

দুয়ার খোলা ফেলিয়া রাখিয়া সরযূ উপরের ঘরে চলিয়া আসিল এবং নিজের ছোট বিছানাখানির উপর মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া রহিল।

দারুণ লজ্জায় তাহার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিতেছিল !

এইমাত্র যাঁহার সহিত চোখের দৃষ্টি মিলিয়াছিল, তিনি তাহাকে কত বড় লজ্জাহীনা মনে করিয়া গেলেন ! তাহার সর্ব্বাঙ্গে উজ্জ্বল আলোক আসিয়া পড়িয়াছিল ; সে মুখ তুলিয়া হাসিয়া কথা বলিয়াছিল ; তার পর দোরের কাঠের উপর চকিতের জন্যও তাহার মাথাটা ঠেকিয়াছিল !

মেয়ে মানুষের পক্ষে ইহার কোনোটাই তো কম লজ্জাকর নহে !

বিগত কয়েকটা মুহূর্ত্তকে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে পারিলে, সে যেন বাঁচিয়া যাইত !

ঘরের ভিতরকার এত বড় অন্ধকারও আজ আর তাহার এই লজ্জাকে ঢাকিয়া রাখিতে পারিতেছিল না।

তাহার বুকের ভিতরটা সত্যই টন্‌টন্ করিতেছিল, কিন্তু এ সুখের অনুভূতির চাঞ্চল্যে বা দুঃখের বেদনায়, তাহা বুঝিবার জন্য কোনও চেষ্টা না করিয়া নিঃশব্দে সরযূ বিছানার উপর পড়িয়া রহিল !

সতীশ কখন ফিরিয়া আসিল, জানিল না। নীচের ঘরে কতক্ষণ কি কথা হইল, কিছুই তাহার কানে আসিল না !

তন্দ্রাভিভূত সরযূর কানের কাছে শুধু একটী অপ্রতিভ কণ্ঠস্বর ফিরিয়া ফিরিয়া বাজিতেছিল,—

"আমি অশ্রু, সতীশবাবুর কাছে এসেছিলাম।"

বুকের মধ্যে অজ্ঞাতে, স্বপ্নের মায়ালোকের ঐন্দ্রজালিক সৃষ্টি চলিতে-ছিল ; এবং সেই বিচিত্রলোকের বাতাস মধু গন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছিল ; আকাশ বিপুল নেশায় রঙ্গিণ হইয়াছিল ; চারিদিক্‌কার প্রকৃতির উপরকার সবুজের ছাপ নিবিড় হইয়া উঠিয়া বারবার তাহাকে নন্দিত করিয়াছিল !

সতীশের এই ক্ষুদ্রা শিষ্যাটীকে সকলেই যথেষ্ট এড়াইয়া চলিত ; এবং হিসাব করিয়া কথা বলিত।

সুখ দুঃখের কথা উঠিলেই, এই মেয়েটী যে ভাবে বিচার করিতে বসিয়া যাইত, তাহাতে দার্শনিকের কূটতর্ক না থাকিলেও, সাংসারিক হিসাবে হাসি-কান্নার অবসরও থাকিত না। সুতরাং ইহার মুখের দিকে চাহিয়া ও সব আলোচনা করিতে গেলে, বুকের ভিতরকার অস্বস্তির ভাগটাই বাড়িয়া উঠিত! তখন হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিবার জন্য পলাইয়া যাওয়া ছাড়া গত্যন্তরও থাকিত না!

দুঃখের সঙ্গে এর পরিচয় যে কত বড় নিবিড় ; সুখের সঙ্গে অপরিচয়ও যে এর পক্ষে একটা কত বড় নির্ম্মম নিষ্ঠুর সত্য, তাহা তো কাহারই অগোচর ছিল না!

তাই সুখ-দুঃখের অস্তিত্বকে অস্বীকার করিয়া এ যখন বিচার করিতে বসিয়া যাইত, তখন প্রতিপক্ষের বুকের মধ্যে কান্নার ঢেউটাই প্রবল হইয়া উঠিত ; অথচ এই অদ্ভুত প্রকৃতির মেয়েটীর মুখের উপরে যেমন হাসিও ফুটিত না, তেমন দুঃখের রেখাপাতও হইত না!

বাড়ীতে একটা বিশেষ আলোচনা ভিতরে ভিতরে সরযূর অজ্ঞাতে বহুদিন চলিয়াছে। এখন তাহা প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য তেমন চেষ্টাও ছিল না।

সরযূর সঙ্গে কথার আলোচনায়, তর্কে বিতর্কে সতীশ বহুবার এমন সব প্রশ্ন তুলিয়া বসিয়াছে, যাহার সিদ্ধান্ত শুধু একটি মাত্রই হইতে পারে, এবং যাহাকে ভুল করিয়া চিনিবারও কোনও কারণ থাকিতে পারে না!

তবু স্পষ্ট কিছুই হয় তো কোনও দিন হয় নাই।

সরযূ যেটুকু বুঝিয়াছে, তাহাতেই তাহার বুক কাঁপিয়াছে; শোণিত প্রবাহ প্রায় রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে; এ সবের দারুণ লজ্জা তাহাকে কতবার পরিমূঢ় করিয়া তুলিয়াছে! এবং এই আশঙ্কাই দিনের পর দিন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, যে, তাহার বুকের ভিতরকার গোপনতম খবরটী শুধু ঐ তীক্ষ্ণদৃষ্টি সতীশের কাছেই হয় তো ধরা পড়িয়া গিয়াছে!

কিন্তু এত দিন যাহা অস্পষ্ট ছিল, আজ তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল।

বিকালের দিকে সরযূর ঘরটার মধ্যে ঢুকিয়া "সতীশ বাবুর তলব ঠাকুরঝি,—জল্‌দি," বলিয়াই প্রতিমা বাহিরে চলিয়া গেল; যাইবার সময় আর একবার ফিরিয়া বলিয়া গেল, "দেরী করিস্‌নে যেন"—

সরযূ খোকনের জামাগুলি ভাঁজ করিয়া রাখিতে রাখিতে একবার মুখ তুলিয়া একটু চাহিল, তার পর কতকটা যেন মনে মনেই কহিল, "ইঃ, ভারি তাড়া যে!—যাচ্ছিনে আমি."—

কিন্তু পরক্ষণেই নীচ হইতে উৎপলের গলা শুনা গেল, "ওরে সুরি, খোকন্‌কে নিয়ে যা',—এর সঙ্গে পারা যায় না ত!"—

ঝন্ ঝন্ করিয়া থালা বাসন পড়িবার শব্দ শুনা গেল; সঙ্গে সঙ্গে খোকনের কান্নার রোল উঠিতেই সরযূ উঠিয়া পড়িল; কিন্তু কয়টা সিঁড়ি নামিয়া যাইতেই দেখিল, উৎপল ছেলেকে দুই বাহু ধরিয়া ঝুলাইতে ঝুলাইতে উপরে লইয়া আসিতেছে!

এ ভাবে বন্দী হইয়া উপরে আসাটা খোকনের মোটেই বোধ হয়, মনঃপূত হইতেছিল না; তাই সে ক্রমাগত হাত পা ছুঁড়িয়া আপত্তি জানাইতেছিল!

কিন্তু বন্দীর প্রতি সুবিচার দুনিয়ায় বড় একটা কেউ করে, শুনা যায় না। উৎপলও এই ক্ষুদ্র বন্দীটীর দুই হাত ধরিয়া ঝাঁকিয়া দিয়া

কহিল, "যা' তোর মাসির কাছে ;—দস্যি ছেলে ! এক মুহূর্ত্ত স্বস্তি থাক্‌তে দেয় না ।"—

সরযূ হাত বাড়াইয়া ছেলে টানিয়া লইয়া বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিল ; পিঠের উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "আমার সোণা,—ও আমার যাদু !"—

বন্দী শিশু উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহ তো ছাড়িয়া দিলই, বেশীর ভাগে সরযূর কাঁধের উপর মাথাটী রাখিয়া একেবারেই নিঃশব্দ হইয়া রহিল !

এই দুর্দ্দান্ত শিশুটী যে একেবারেই চুপ করিয়া গেল, ধীরে ধীরে একটী নিঃশ্বাস ফেলিয়া, শুধু মাত্র সরযূর চুলের গুচ্ছের পাশে মুখ লুকাইল, মায়ের প্রাণ কিন্তু ইহাতেই বেদনাতুর হইয়া উঠিল !

হায় রে মায়ের প্রাণ !

উৎপল খোকনের পিঠে সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিয়া কহিল, "ওর দুষ্টুমিও সহ্য হয় না, দুষ্টুমি না ক'রে চুপ করে থাক্‌লেও বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে !"—বলিয়াই একটু ম্লান হাসির মাঝে বুকের নিঃশ্বাসটা সন্তর্পণে বাহির করিয়া দিয়া নীচেয় নামিতে লাগিল ।

এমন সময়ে সতীশের ঘরের দোর গোড়ায় দাঁড়াইয়া প্রতিমা কহিল, "বারে, এই একশো বার উপর নীচ করে ডাকাডাকি করা আমার কাজ নয় ;—তোমরা এ ঘরে আস্‌বে কি না বলে যাও !"

উৎপল ফিরিল, উপরে উঠিয়া আসিয়া স্মিতমুখে কহিল, "কি ?"

চোখের ইঙ্গিতে সতীশের ঘর দেখাইয়া দিয়া প্রতিমা কহিল, "তলব, আর কি !"—

সরযূ খোকন্‌কে বুকের সঙ্গে জড়াইয়া ধরিয়া নিজের ঘরের দিকে যাইতেছিল ।

প্রতিমা কহিল, "এদিকে, এদিকে,"—

সরযূ হাসিয়া কহিল, "বেত্রবতি, পথ দেখাও।"—

প্রতিমা দুই হাতের অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে সতীশের ঘরের পথ দেখাইয়া কহিল, "আসুন, এদিকে, এদিকে,"—

উৎপল হাসিল; ঘরের মধ্যে সতীশও হাসিয়া উঠিল; হাসিল না শুধু প্রতিমা;—

বেয়াদবি না হয়!

সরযূ প্রতিমার বাম কপোলে তর্জ্জনীর আঘাত করিয়া কহিল, "রাক্ষসি!"—

ঘরের মধ্যে সকলেই যখন পৌঁছিয়া গেল, তখন সতীশ কহিল,

"বৌদি, এই সাড়ী ক'খানা নিয়ে এলাম,"—

সাড়ীর প্রত্যেক খানির উপরে কাগজ আঁটিয়া নাম লেখা ছিল! আস্‌মানীরংএর জমীর উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জরীর ফুলগুলি বৈকালের সূর্য্যের কোমল রশ্মিতে ঝক্ ঝক্ করিতেছিল।

সরযূ অগ্রসর হইয়া একখানি সাড়ী তুলিয়া লইতেই দেখিল, ঠিক নীচের খানির উপরে মোটা অক্ষরে লেখা রহিয়াছে "সরযূর জন্য"!

ভুল করিবার কিছু ছিল না; বুকের ভিতরকার গুরু কম্পন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল, তবু সরযূ আর একটীবার চাহিয়া দেখিল।

সরযূর পিঠের উপর হাতখানি রাখিয়া সতীশ সস্নেহে কহিল, "লক্ষ্মী দিদিটী আমার, এই বাড়ীটার মধ্যে তোমার যে কয়টী আপনার জন রয়েছে, তোমার উপর তাদের সবারই দাবী দাওয়া আজ তোমাকে জানিয়ে দিলাম। ঐ অশ্রুকে চিন্‌তে আমি একটুও ভুল করি নি বলে ওকে পাওয়ার সৌভাগ্যও আমি আর কোনো মেয়েকেই ছেড়ে দিতে রাজি নই!" একটু হাসিয়া প্রতিমার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কিন্তু আমার এই শিষ্যাটীকে পাওয়াও তো কম সৌভাগ্য নয়, বৌদি!"—

স্মিতমুখে প্রতিমা কহিল, "নয়ই তো,"—

সতীশ কহিল, "দুটো বছর যে কথাটা দিনরাত মনের মধ্যে চেপে রয়েছে, আজ তা' তোমাকে আমার আশীর্ব্বাদের সঙ্গে জানিয়ে দিচ্ছি, সরযূ।"

ড্রয়ারের মধ্যে দুই গাছি বহুমূল্যবান্ বালা ছিল, সরযূর হাত দুইখানি টানিয়া আনিয়া সতীশ নিজেই তাহা পরাইয়া দিল, তার পর সরযূর উচ্ছৃঙ্খল চুলের রাশি গুছাইয়া দিয়া, সতীশ ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল!

সতীশের স্বর গাঢ় হইয়া আসিতেছিল; একটু চুপ করিয়া থাকিয়া, প্রতিমার দিকে ফিরিয়া কহিল, "নীচের ঘরে মা রয়েছেন বৌদি, তাঁকে সব জানিয়ে আসুন। তিন দিন পরে শুভদিন আছে, ওঁরা সেই দিন আশীর্ব্বাদ করে যাবেন জানিয়েছেন। সন্ধ্যার পরই অশ্রুর মার কাছে একবার যাব মনে করেছি।"—

উৎপলের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছিল। সে জানালার পথে ও বাড়ীর নির্জ্জন খোলা বারান্দাটীর উপর দৃষ্টি ফেলিয়া, দাঁড়াইয়া রহিল।

ইতিমধ্যে খোকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল; সরযূ কম্পিত পদে এ ঘর হইতে বাহির হইয়া, নিজের ঘরে চলিয়া গেল। সেখানে খাটের উপর বসিয়া পড়িয়া, নির্ণিমেষ চোখে দেওয়ালের দিকে চাহিয়া রহিল।

খোকাকেও বিছানায় শোয়াইতে ভুলিয়া গেল!

২৪

দুয়ারের কাছে সান্ধ্য প্রদীপ ও আরতির আয়োজন করিয়া রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই কল্যাণী,-ভিতরের সিঁড়ির দিকে পায়ের শব্দ শুনিতে পাইল।

অশ্রুর ফিরিবার কথা ছিল ; মা ডাকিয়া বলিলেন, "অশ্রু এসেছে বুঝি, কাল', সিঁড়িতে আলো নাই, যা'ত আলোটা নিয়ে।"—

কল্যাণী আলো লইয়া নীচে নামিয়া আসিল। সিঁড়ির কাছে কাহাকেও দেখা গেল না। বসিবার ঘরের দোর গোড়ায় কেহ দাঁড়াইয়া ছিল। আলো উঁচু করিয়া ধরিয়াই কল্যাণী বিস্ময়-চকিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি!—কখন এলে, নরেশ দা'?"

কিন্তু নরেশের মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়াই, তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

কাছে সরিয়া আসিয়া মুখ তুলিয়া উদ্বিগ্নস্বরে কহিল, "কি চেহারাই হয়েছে, মাগো!' অসুখ বুঝি? কই কোনো খবরই তো দাও নি!"—

এই খবর পাওয়ার অধিকারটা যেন কল্যাণীর চির দিনেরই এবং সংবাদ দেওয়াও নরেশের একান্ত কর্ত্তব্য ছিল!

নরেশ একটু হাসিয়া কহিল, "কই অসুখ কিছু নয় তো!—কিন্তু সে যাক্! আজ আমি তোমার কাছেই এসেছি, কিছু বল্‌ব!"—

নরেশের কথা শুনিয়া কল্যাণী ভয় পাইয়া নিঃশব্দে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

এই বিশেষ করিয়া তাহার কাছেই আসার হেতু না বুঝিতে পারিলেও,

নরেশের মুখ চোখের চেহারা দেখিয়া কল্যাণী ইহা নিশ্চিত বুঝিল, যে, ব্যাপারটা সহজ নহে।

যে কথাটা তাহার মনের কাছে বহু দিন পূর্ব্বেই ধরা পড়িয়া গিয়াছে; এবং যাহাকে অস্বীকার করিতে চাহিয়া সে নিজেকে দিনের পর দিন ক্ষতবিক্ষতই করিয়া তুলিয়াছে, মনে হইতেছিল, এ সবের সঙ্গে কোথায় তাহার যোগ রহিয়াছে।

কিন্তু এমন কথা মনে হইবারই বা কি কারণ থাকিতে পারে, তাহাও সুস্পষ্ট কিছু বুঝিতে পারিল না!

কল্যাণী দেখিল, নরেশের দুই চোখের ব্যথিত দৃষ্টি তাহার মুখের উপরই নিবদ্ধ রহিয়াছে; মুখ নত করিয়া কহিল, "দাঁড়িয়ে রইলে, নরেশদা'! মাকে প্রণাম কর্‌বে না?"

বলিয়াই একটু হাসিয়া কহিল, "এই দেখ, তোমার মুখের চেহারা দেখে এম্‌নি ভয় পেয়েছি, যে, প্রণামটা কর্‌তেও ভুলে গেছি?"—

গলায় কাপড় জড়াইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিতেই, কল্যাণী দেখিল, নরেশের মুখ একেবারে কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছে!

নরেশ কহিল, "সব ঠিক্ করে গুছিয়ে বল্‌বার মত মনের অবস্থা আমার নয়, কল্যাণী, কিন্তু আমি জানি, আমি তোমার কাছে অপরাধ করেছি! এ পর্য্যন্ত জীবনে ছোটখাটো এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, যা' ছাপ রেখে গেছে; এবং মনের ভিতরকার দুচারটা অস্পষ্ট কথাকে হয় তো সুস্পষ্ট করে জানিয়েও গেছে! কিন্তু একে আর বাড়্‌তে দেওয়া নয়, কল্যাণী! আজ সমস্ত অপরাধের বোঝা আমাকেই বইতে দাও, মনের ভিতর থেকে ক্ষমা যদিই না কর্‌তে পার।"—

নরেশ যতক্ষণ কথা বলিতেছিল, কল্যাণী নিমেষশূন্য চোখে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, ঠোঁট দুইখানি স্ফুরিত হইতেছিল, দু'টা

চোখের অস্বাভাবিক জ্বালা নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছিল; এবং সমস্ত মুখখানা ধীরে ধীরে বর্ণহীন হইয়া একেবারে মৃতের মুখের মতই পাণ্ডুর হইয়া গেল!

চক্ষুর সম্মুখেই কল্যাণী ইহা দেখিতেছিল। অথচ কিছু দিন পূর্ব্বেও এই নরেশের ম্লানমুখ দেখিলে, তাপ হরণ করিবার জন্য কত আয়োজনই না সে করিয়াছে!

আজও উদ্বেগের অন্ত ছিল না। কিন্তু তাহার বুকের ভিতরকার আহতা নারী তাহাকে এক পা'ও অগ্রসর হইতে দিল না।

বুকের মধ্যে কান্নার ঢেউ ফেনাইয়া উঠিতেছিল; দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া কল্যাণী মুহূর্ত্তকাল দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর মৃদুস্বরে "তোমার কথা, বোধ হয়, হ'য়ে গেছে, নরেশদা',—উপরে মাকে প্রণাম করে যেও," বলিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য ফিরিল।

"কল্যাণী, শোন,"—নরেশ প্রায় চেঁচাইয়া বলিয়া উঠিল; কল্যাণী ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিষ্ঠ নরেশের কণ্ঠে এমন আর্ত্তস্বর সে আর কোনও দিন শুনে নাই!

কিন্তু ইহার কিছুকেই তো আর বাড়িতে দেওয়া নয়!

কল্যাণী স্থির কণ্ঠে কহিল, "এ গর্ব্ব তুমি রাখ নরেশদা', যে আমাকে চিন্‌তে কিছু ভুল কর নি; অথচ, এমনি অদৃষ্ট, সেই দেশ থেকে ছুটে বল্‌তে এসেছ, যদি দাগ কিছু কেটে থাকে তা' মুছে ফেল,—ভুলে যাও!—কেন? দুর্ব্বল বলে কি এ জাতটার মনের স্বাধীনতাও নেই? এই অধম মেয়ে-মানুষগুলোর মনের গতিপথ নির্ণয় করে দেবার ভারটাও কেউ পুরুষজাতের উপর দিয়ে রেখেছে বলে ত জানিনে,"—বলিয়াই দ্রুত পদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া যাইতে যাইতে দুই হাতে বারংবার কণ্ঠনালীটা টিপিয়া ধরিতে লাগিল।

এ সব কথার পর নরেশের কাছে কিছুই গোপন রহিল না, এই লজ্জা ও ক্ষোভ তাহাকে ক্রমাগতই পীড়ন করিতে লাগিল।

নরেশ স্তব্ধের মতই কয়েক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইয়া রহিল। কত বড় আঘাতে এই চির দিনের মৌন কল্যাণীর মুখে কথা ফুটিয়াছে, তাহা মনে করিয়া যেমন তাহার ক্ষোভের অবধি রহিল না, তেমনি কল্যাণীর জন্য উদ্বেগে তাহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

কিন্তু তাহার সকল উদ্বেগ শান্ত করিবার ও জ্বালা জুড়াইবার একটা স্থান এই বাড়ীটারই ঠিক্ উপর তলাতেই ছিল। যেখানে সে চির দিন শিশুটীর মতই আশ্রয় পাইয়া বাঁচিয়া যাইতে পারে!

মনে হইতেই নরেশ দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল।

এই মাত্র মালা শেষ করিয়া মানদাসুন্দরী উঠিতেছিলেন; নরেশ ঘরে ঢুকিয়া "আমি নরেশ, কাকীমা," বলিয়াই প্রণাম করিতে যাইয়া, তাঁহার দুই পায়ের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া রহিল।

তাড়াতাড়ি নরেশের মুখটা টানিয়া কোলের উপর তুলিয়া, ব্যস্তভাবে কহিলেন, "ও নরেশ, তুই কি ক্ষেপ্‌লি? কি হয়েছে, বাড়ীর সব ভাল ত রে!"

বলিয়াই তাহার মাথায় ও পিঠে পরমস্নেহে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

নরেশ কোনও কথা বলিলেন না। এই একান্ত আশ্রয়টী পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল।

নরেশ তীব্র বেদনা পাইয়া তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছে, ইহা মানদাসুন্দরী নিশ্চয় বুঝিলেন। সে যখন ছোটটী ছিল, দুঃখ বা

অভিমান হইলেই, কত দিন এমনি করিয়া তাঁহার কোলে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। এই মাতৃহীন ছেলেটীর জন্য চির দিন তাঁহার উদ্বেগের অন্ত ছিল না।

আজ সে এত বড়টী হইয়াও যে তাঁহার কাছে সেই ছেলেবেলাকার মতই ছুটিয়া আসিয়াছে, এ জন্য তিনি বিশেষ করিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। অথচ কি যে তাহার ব্যথা তাহাও তিনি ঠিক বুঝিতে পারিলেন না।

একটা কথা কাঁটার মত মনের মধ্যে বিঁধিতেছিল, কিন্তু তাহা মুখে বলিবার উপায়ও ছিল না, তাই নরেশের কথা বলিবার অপেক্ষায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া ক্রমাগত তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন।

এই অদ্ভুত স্নেহ-স্পর্শ নরেশের জ্বালা অনেকখানি হ্রাস করিয়া দিল।

একটুকাল পরে মাথা তুলিয়া নরেশ কহিল, "তোমার মুখে আমার মার কথা শুন্‌তে এলাম, কাকীমা,"—

নরেশের কথা শুনিয়া মানদাসুন্দরীর চোখের পাতা অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

পিতা বিষয়ী লোক ছিলেন; এই মাতৃহীন বালকের ছোটখাটো মান অভিমানের খবর তিনি কোনো দিনই রাখেন নাই। অক্রুর মার কাছে ইহার স্নেহের দাবীর পরিপূরণ অনেক পরিমাণেই হইয়া থাকে, ইহা জানিয়াও তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। তার পর ছেলে বড় হইয়া যখন জীবনের পথে সফলতা লাভ করিতেছিল, এবং কৃতিত্বে ছোট বড় সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছিল, তখন এই সূক্ষ্ম বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন লোকটীর চোখে এটা কোনও দিনই ধরা পড়ে নাই, যে,

সেই কৃতী ছেলেটীরও এমন সব ছোটখাটো অভাব অভিযোগ থাকিতে পারে, যাহা শুধু জননীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই ধরা পড়ে!

মানদাসুন্দরী স্থির বুঝিয়াছিলেন, নরেশ আজ যে বেদনায় ক্ষুব্ধ হইয়া তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছে, ইহা শুধু ঘরের মধ্যে মা না থাকার অভাবটা হঠাৎ কোনও কারণে তীব্রভাবে অনুভব করিয়াছে বলিয়াই।

তাই তিনি নরেশের কথার কোনও উত্তর না দিয়া কহিলেন, "কেন, নরেশ, তোর কথা কি আমায় বল্‌তে পার্‌বিনে ?"

স্বরের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, যাহা নরেশকে অভ্রান্তভাবে মনে করাইয়া দিল যে, তাহার মা না থাকিলেও, কাকীমা তো রহিয়াছেন, এবং এই কাকীমাই তাহাকে আবাল্য মাতার স্নেহপুটে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন!

এক মুহূর্ত্তে তাহার দ্বিধা, সংশয় সবই যেন কাটিয়া গেল; এবং সে মনে মনে এই বলিয়া প্রস্তুত হইল যে, ব্যথা বেদনা, মান অভিমান জানাইবার যখন এইমাত্র একটী স্থানই আছে, তখন তাহার যাহা কিছু বলিবার আছে, সবই আজ এখানে অসঙ্কোচে জানাইয়া যাইবে।

"কিন্তু সে কথা এখন থাক্, অশ্রুর আস্‌তে বিলম্ব হবে; হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে নে, নরু, তারপর কথা হবে"—

দুয়ারের দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাকিয়া কহিলেন, "ওরে কলি, তোর নরেশদা'কে এই বারান্দায়ই হাত মুখ ধোবার জল দিয়ে যা', আমি কিছু খাবার নিয়ে আসি" বলিয়া উঠিতে যাইতেছিলেন।

নরেশ তাড়াতাড়ি কহিল, "থাক্ না, কাকীমা, অশ্রু এলেই এক সঙ্গে খাওয়া যাবে।"

"তা'ও কি হয় রে পাগল! তোর তো আজ সমস্ত দিনে কিছুই খাওয়া হয়নি, নরেশ।"—

নরেশ বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, "কি করে বুঝলে, কাকীমা ?"—

"শুধু কি তাই নরেশ ?—তুই কত দিন নিয়ম মত খাওয়া দাওয়ার পাট তুলে দিয়েছিস্, তাই আমাকে বল্ ? মার কথা শুন্তে এত পথ ছুটে এসেছিস্ কাকীমার কাছে, কিন্তু তোর কাকীমা তোর মুখের চেহারা দেখে কি আর এটুকুও বোঝে না রে ? কই মুখের চেহারা দেখে তোদের পেটের ক্ষিদে বুঝ্তে কোনও দিন ভুল করেছি বলে মনে হয় না ত' নরেশ।"

দুই কানের ভিতর দিয়া অমৃতধারা প্রবেশ করিয়া নরেশের তাপ-দিগ্ধ মনটার সমস্ত তাপ একমুহূর্ত্তে হরণ করিয়া লইল।

নরেশ কোনও কথা না বলিয়া বিস্মিত-দৃষ্টিতে কাকীমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

"তোকে একটা কথা বলে রাখি নরেশ, নিজের মনটাকে কোনো দিন ভুল বোঝাতে যেয়ে পীড়ন করিস্ নে ! যেটা মনের সহজ গতি, সেইটেই ঠিক পথ ; তাকে অস্বীকার কর্তে যেয়ে ব্যথাই কেবল বাড়ে, শ্রেয়ও যেমন পাওয়া যায় না, লাভও কিছু হয় না। মানুষের দুঃখ কষ্টের তো শেষ নাই, তার উপর যদি আবার কতকগুলি মনগড়া দুঃখ কষ্ট এসে জোটে, তবে তো আর রক্ষাই নাই। তোর বাবা বাইরের পাঁচটা কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন, তোর ব্যথা ঠিক কোথায়, হয় তো তাঁর চোখে পড়ে না, যেমনটা তোর মা থাক্লে তার চোখে পড়্‌ত। কিন্তু তা' বলে তোর উপর তাঁর স্নেহ তো আর কম কিছু নয় !—তুই এখনো সেই ছেলে বেলাকার মতই মন গুম্‌রে থাকিস্, না খেয়ে দেয়ে দেহটাকেও কষ্ট দিস্,—এ সব তো বাবা, তোমার শোভা পায় না !"— বলিয়াই মানদাসুন্দরী উঠিয়া পড়িলেন।

বারান্দায় তোয়ালে, জল প্রভৃতি গুছাইয়া রাখিয়া এতক্ষণ দুয়ারের

পাশে দাঁড়াইয়া কল্যাণী তাহার বেদনা ম্লান দুই চোখের দৃষ্টি বাহিরের নক্ষত্র-বিরল আকাশের দিকে স্থাপিত করিয়া রাখিয়াছিল। ঘরের ভিতরকার কথাবার্ত্তার দিকে তাহার কান ছিল না।

শুধু একটা দুঃসহ বেদনাই তাহার কাছে সত্য হইয়া উঠিয়াছিল; এই বেদনাটা তাহার সম্পূর্ণ নিজস্ব; মুখ ফুটিয়া কাহাকে বলিবারও নহে, এমন কি, নিজের মনের মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আলোচনা করিবার মতও নহে!

এমন সময়ে হাত মুখ ধুইবার জন্য বারান্দায় আসিতেই, নরেশ কল্যাণীকে অন্ধকারের মধ্যে দেখিতে পাইয়া, থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

কল্যাণী নিঃশব্দে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। একটা কোমল মিষ্টগন্ধ নরেশের চারিপাশের বাতাসটাকে আকুল করিয়া রাখিয়াছিল!

হঠাৎ নরেশের মনে হইল, "নিজেকে ফাঁকি দেওয়াও আর নয়, পীড়ন করাও নয়। কাকীমা ঠিকই বলেছেন, মনটাকে ভুল বোঝাতে গিয়ে যথেষ্ট পীড়ন করেছি; লাভ কিছু হয় নি, ব্যথাই বেড়েছে। ওকে না হ'লে আমার চল্‌বে না, এটা আজকার মত আর কোনো দিনই মনে হয় নি। আজ আমি ঠিক্‌ই বুঝেছি ওকে আমার চাইই"—

নরেশ হাত মুখ ধুইল না; ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া মানদাসুন্দরীকে প্রণাম করিয়া, "আমি এখনি যাচ্ছি কাকীমা, এর পর গেলে গাড়ী ধরতে পার্‌ব না, দেশে চল্‌লুম, কাকীমা;" বলিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

"যাবি, সে কিরে," নরেশ ততক্ষণ সিঁড়িগুলি অতিক্রম করিয়া নীচে নামিয়া পড়িয়াছে।

মানদাসুন্দরী ব্যস্তভাবে একবার ডাকিলেন,—"কলি', কোনও

সাড়া না পাইয়া এদিক্‌কার বারান্দায় সরিয়া আসিয়া উদ্বেগপূর্ণ স্বরে ডাকিয়া কহিলেন, "ওরে কিছু মুখে দিয়ে যা', নরেশ !"—

বাড়ীর সম্মুখের খোলা যায়গাটায় পড়িতে পড়িতে বারান্দার দিকে মুখ তুলিয়া নরেশ চেঁচাইয়া কহিল, "আজ আর নয়, কাকীমা, আর এক দিন।"—

কল্যাণী ভিতরের বারান্দায় সেই অন্ধকার যায়গায়টায় ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

নরেশ আসিয়াছিল ; চলিয়া গেল ! কিন্তু কেন আসিয়াছিল ?

শুধু তাহাকে ঐ কথাটী জানাইয়া দিবার জন্য ?

কেন ?

তাহাকে জানাইয়া, ঘটা করিয়া নিজের মুক্তির প্রয়োজন করিবার কি প্রয়োজন ছিল ?

দুঃসহ বেদনায় কল্যাণীর দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। মানদাসুন্দরী কখন নিঃশব্দে আসিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন।

সস্নেহে পিঠের উপর হাতখানি রাখিয়া কহিলেন,—"কলি,"—

কল্যাণী চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—"কি, মা"—

"ঘরে চল্, অন্ধকারে থাকিস্ নে।"

কল্যাণী কথা বলিল না, মুখ ফিরাইয়া চোখ দুটা মুছিয়া ফেলিয়া পাশের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

মানদাসুন্দরী কোনও কথা বলিলেন না ; নিঃশব্দে পূর্ব্বের যায়গাটীতে ফিরিয়া মালাগাছটী তুলিয়া লইলেন ; এবং একটী ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া আসনখানির উপর বসিয়া পড়িলেন।

২৫

ভোরের দিকে উৎকণ্ঠিত মুখে সুস্নাতা খোলা বারান্দার উপর দাঁড়াইয়া ছিল।

ভোরের আলো তখনও ফুটে নাই।

মায়ের স্নেহ-প্রশান্ত চোখের দৃষ্টির নীচে সুপ্ত শিশুটী যেমন করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া উঠে, নীল নির্ম্মল আকাশের নীচে ঘুমন্ত প্রকৃতিও তেমনি জাগিয়া উঠিতেছিল। তখনও পূবের আকাশের শুকতারাটী জল্ জল্ করিতেছিল ; এবং নীচের শিউলী গাছটীর একটা ডালের উপর এইমাত্র জাগিয়া উঠিয়া, একটা দোয়েল প্রতিদিনের মতই শিষ্ দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

কিন্তু ইহার কোনো দিকেই আজ আর সুস্নাতার মন ছিল না।

ভোরের শীতল বায়ু মুখে চোখে আসিয়া লাগিতেছিল ; চূর্ণ কুন্তল ক্ষুদ্র ললাটের উপর উড়িতেছিল। পূর্ব্বাকাশে যে বিচিত্র বর্ণের উন্মেষ সবে মাত্র সূচিত হইয়াছে, তাহারই ঈষৎ আভা দোদুল্যমান কর্ণভূষার উপর প্রতিফলিত হইতেছিল !

সদর গেটের দিকে চাহিয়া চাহিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলেও, সুস্নাতার আগ্রহ ও উদ্বেগের অন্ত ছিল না। কাহাকেও কিছু না বলিয়া সেই যে দুই দিন পূর্ব্বে নরেশ বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছে, আজও ফিরিল না, ইহাতে সুস্নাতার মনে কত কথাই উঠিতেছিল। কিন্তু ইহা সে নিশ্চিত জানিত, যে, নরেশ আসিবেই। কয়টা দিন পরেই বিবাহের তারিখ স্থির হইবার কথা ছিল। সুস্নাতা এ দিনটাকে পিছাইয়া দিবার জন্য শ্বশুরকে বলিবে মনে করিয়াছিল। এত দিন সাহসে কুলায় নাই,

কিন্তু একটা কিছু না বলিলে আর চলে না দেখিয়া, গতরাত্রে শ্বশুর যখন দেওয়ানের সঙ্গে কথা শেষ করিয়া ভিতর বাড়ীতে আসিলেন, তখন সুস্নাতা কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিল।

শ্বশুর গৌরীশঙ্কর এই তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী মেয়েটীকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

একটু হাসিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মা ?"

সুস্নাতা উদ্বিগ্ন মুখে কহিল, "ঠাকুরপো আজও ফির্‌লেন না ত !"

চস্‌মাটা তুলিয়া ধরিয়া বধূর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "নরেশ ? কোথায় গেছে সে ?"

"কল্‌কাতায়।—পরদিনই ফিরবেন বল্‌লেন, আজ দু'দিন হ'য়ে গেল।"

চস্‌মাটা যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া কহিলেন, "ও ত এখন যাওয়া আসা করেই, এতে ব্যস্ত হবার কি আছে মা ?—

ব্যস্ত হওয়ার কি যে আছে, তাহা বলিবার সাহস সুস্নাতার ছিল না। কিন্তু তাহার উৎকণ্ঠা আজ আর 'গোপনও করিতে পারিতেছিল না।

হঠাৎ কাপড়ের খুঁট্‌টা নিয়া সে ব্যস্ত হইয়া উঠিল ; খুঁট্‌টা আঙ্গুলে জড়াইয়া, খুলিয়া, আবার জড়াইয়া, আবার খুলিয়া সে হাঁপাইয়া উঠিল।

এ সব কিছুই গৌরীশঙ্কর বাবুর চোখ্ এড়াইল না, সন্দিগ্ধ স্বরে কহিলেন, "ব্যাপারটা কি বল ত, মা"—

সুস্নাতা মৃদুস্বরে কহিল, "এ বিয়েটা কি বন্ধ করে দেওয়া যায় না, বাবা ?"

একটা কালো পরদা এতক্ষণ চোখের কাছে দুলিতেছিল, তাহা

যেন খসিয়া পড়িল। বিস্মিত কণ্ঠে কহিলেন, "কেন মা, নরেশ কি কিছু বলেছে—?"

একটু সাহস পাইয়া সুস্নাতা কহিল, "কিছু বলেন নি, তবে মন বড় একটা আছে, বোধ হয় না।—"

"ও কিছু নয়,"—বলিয়াই একটা নূতন খরিদা সম্পত্তির কাগজ-পত্র দেখিবার জন্য ড্রয়ারের কাছে চেয়ারের উপর বসিলেন।

সুস্নাতা মৃদুস্বরে কহিল, "এই শরীরে আবার কাগজ-পত্র নিয়ে বস্‌লেন।"—

কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়াই, গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "এখুনি সেরে ফেল্‌ব ;—এই নূতন সম্পত্তিটা আমার এই ছোট্ট মা লক্ষ্মীটীর নামেই খরিদ করেছি, নূতন বন্দোবস্তে পঁচিশ হাজার টাকার উপর আয় বেড়ে যাবে!"

এই প্রৌঢ় বিষয়ী ভদ্রলোকটীর মনের মধ্যে সবখানিই রুক্ষ ও কঠিন নহে, খানিকটা যায়গা যে কোমল ও সরস রহিয়াছে, ইহা ধরা পড়িত সুস্নাতার কাছে।

সুস্নাতা মশারিটা ফেলিয়া দিয়া আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিল ; এবং যাইবার পূর্ব্বে প্রতিদিনকার মতই দুই হাতে শ্বশুরের পায়ের ধুলা মাথায় লইল।

হঠাৎ কি ভাবিয়া গৌরীশঙ্কর কহিলেন, "কন্যাপক্ষকে আমি কথা দিয়েছি, তারা আমায় মুক্তি না দিলে, নড়চড় তো আর হতে পারে না, মা।"—বলিয়াই পুনরায় কাগজপত্র দেখিতে লাগিলেন।

সুস্নাতা প্রমাদ গণিল। কম্পিতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এ যে কত বড় প্রমাদ, তাহা সুস্নাতা যেমন জানিত, এমন আর, বোধ হয়, কেহই জানিত না।

জীবনে যাঁহার কথার কোনও দিনই নড়চড় হয় নাই, এ ব্যাপারেও হইবে না, সুস্নাতা তাহা নিশ্চিত বুঝিয়াছিল।

সারা রাত্রির মধ্যে সে একবারটীও দুই চোখের পাতা এক করিতে পারিল না। ভোরের দিকে নরেশের অপেক্ষায় বারান্দার দিকে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রভাতের নির্ম্মল আলোকে দিক্‌বিদিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; কিন্তু নরেশের কোনও সাড়া শব্দ নাই। সুস্নাতা তাহার নিজের ঘরটীর মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া, খোলা জানালার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অন্তঃপুরের এই দিক্‌টা হইতে খানিকদূরে একটা খোলা মাঠ চোখে পড়িত। মাঠটার ওধারের গাছগুলির শীর্ষে শীর্ষে পূর্ব্বাকাশের ভাঙ্গাচোরা মেঘের ভিতর দিয়া বালসূর্য্যের রঞ্জিতরশ্মি আসিয়া লাগিয়াছে। ছোট একটা ডোবার কাছে বাঁশঝাড়ের উপর বায়সের দল জটলা বাধাইয়াছে; ইহা নিঃসন্দেহ, যে, তাহারা একটা কোনও আশ্চর্য্য জিনিষের সন্ধান পাইয়াই, এই সকাল বেলাটাতেই কোলাহল জুড়িয়া দিয়াছিল!

চক্রবালরেখাটীর কাছে, যেখানে, খণ্ড—মেঘের নিঃশব্দ সঞ্চরণ চলিতেছিল, সেই দিকেই সুস্নাতা তাহার দুইটী চোখের নির্ণিমেষ দৃষ্টি ফেলিয়া রাখিয়াছিল।

এমন সময়ে ঘরে ঢুকিয়া ঝি কহিল, "বৌ ঠাক্‌রুণ, ছোট দাদাবাবু এসেছেন,—মাগো, কি চেহারা, তুমি যদি একবারটী দেখ্‌তে গো!"

সুস্নাতা মুখ ফিরাইয়া উদ্বিগ্নকণ্ঠে "কখন এলেন?"—বলিয়াই ঘর হইতে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

নরেশ সোজা তাহার ঘরে ঢুকিয়া ঈজি চেয়ারটার উপর হাত পা'

মেলিয়া দিয়া পড়িয়া ছিল। সুস্নাতা আসিতেই, একটু হাসিয়া, খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিল।

দুই দিনের মধ্যে এই লোকটার চেহারা, বেশভূষা প্রভৃতির মধ্যে এমন একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আসিয়া গিয়াছিল, যে, এই হাসিটুকুও তাহাকে একেবারেই মানাইল না।

"কি ভূত দেখ্‌লে নাকি?" বলিয়া নরেশ পুনরায় হাসিতে চেষ্টা করিল!

"ঠাট্টা নয়, ঠাকুর পো! তোমার মুখ চোখ দেখে ভয় পাওয়ারই কথা," তার পর কাছে আসিয়া কহিল, "ও কোনো কাজের কথা নয়, তুমি ওঠ, স্নানটা সেরে এস, আমি ততক্ষণ কিছু খাবার তৈরী' করে নিয়ে আস্‌চি,—ওঠ, যাও,"—

সুস্নাতা অপেক্ষা না করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এক প্রকৃতির মানুষ আছে, যাহাদের আদেশ বা অনুরোধ কোনো-টাকেই উপেক্ষা করা সহজ নহে। এই বাড়ীতে সুস্নাতা যে দিন প্রথম আসিয়াছিল, সেই দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহার কোনও কথাই নরেশ উপেক্ষা করিতে পারে নাই।

এই নবাগতা বধূটী প্রথম দিনেই, সংসার লক্ষ্মীর যে বিশেষ স্থানটী তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাহা নিঃশব্দে অধিকার করিয়া লইয়াছিল। ছোট বড় সকল কাজেই তাহাকে দরকার, ইহা, ঝি চাকরের দল হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ীর কর্ত্তা ও দেওয়ানটী পর্য্যন্ত বুঝিয়াছিলেন।

নরেশ স্নানান্তে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, খাবারের থালা সাজাইয়া রাখিয়া, সুস্নাতা চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে।

নরেশ ঘরে ঢুকিতেই কহিল, "কিছু খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও তো, ঠাকুর পো! তার পর কথা হবে।—"

নরেশ আসনের উপর পা’ দিতেই, সুস্নাতা পুনরায় কহিল, “আচ্ছা ঠাকুর পো, এ দুদিনের মধ্যে তোমার তো খাওয়া দাওয়া কিছুই হয় নি ?—”

মুহূর্ত্তের মধ্যে নরেশের মুখের উপর একটা ব্যথার ছায়া পড়িল। ম্লান মুখে কহিল, “আচ্ছা বৌদি’, এই খবরটা তোমরা এমন অভ্রান্তভাবে জান্‌তে পাও কি করে ? কাল রাত্রে কাকীমাও মুখের দিকে চেয়েই বলে উঠ্‌লেন “তোর ক’দিন খাওয়া হয় নি রে নরেশ !—”

“ও সবাই বুঝ্‌তে পারে” বলিয়া একটু হাসিয়া কহিল, “খাওয়া শেষ না হ’লে, আমি আর কোনো কথা বল্‌ব না জেনে রাখ।”

সেই রাত্রে শুইতে যাইবার পূর্ব্বে শ্বশুরকে প্রণাম করিতে আসিয়া, সুস্নাতা দেখিল, তিনি তখনও টেবিলের কাছে বসিয়া কাগজপত্র দেখিতেছেন।

সুস্নাতা ঘরের মধ্যে—এটা ওটা গুছাইতে লাগিল।

গৌরীশঙ্কর চক্ষু তুলিয়া কহিলেন, “মা,”—

কাছে আসিয়া, মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া, সুস্নাতা নিঃশব্দে শ্বশুরের আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

“নরুর শরীরটা ভাল দেখ্‌লাম না, মা ! ওকে ক’টা দিন কোথায়ও যেতে দিয়ো না।”

কথা কয়টার মধ্যে স্নেহের অফুরন্ত ঝঙ্কার ছিল, যাহার রেশ অনেক-ক্ষণ পর্য্যন্ত সুস্নাতার দুইকানে লাগিয়া রহিল।

সুস্নাতা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

এবং ইতিমধ্যে ছোট বড় যতগুলি দেবতার নাম তাহার জানা ছিল, কাহাকেও অসন্তুষ্ট না করিয়া, মনে মনে সকলকেই স্মরণ করিল, তার পর সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিল, “ঠাকুরপোর বিয়ের তাঁর মতামত জানার কি প্রয়োজন নেই, বাবা ?”

স্থির দৃষ্টিতে পুত্রবধূর মুখের দিকে কিছু কাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "প্রয়োজন আছে কি না, কোনও দিনই মনে হয় নি, মা! আমার মত বুড়োদের ঐ কেমন একটা সংস্কার রয়ে গেছে যে, বাপ যা' করবেন, ছেলের তা'তে অমত হবে না এবং হতেও নেই। বুড়ারা পাকা চোখ্ দিয়ে দশটা দেখে শুনে বিচার করে, কোনও কিছু স্থির কর্‌লে তা' সব ছেলেই তো এত কাল মেনে নিয়েছে, মা!"

চোখ্ না তুলিয়া সুস্নাতা নিঃশব্দে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

"কিন্তু মা, এই বুড়োকে তুমি কিছু বল্‌বে, এটা আমি কয় দিন থেকে লক্ষ্য কর্‌চি। বেশ তো, বল না। এ সংসারের ভালমন্দ সবই এখন তোমার, আমি আর ক'দিন,"—বলিয়া গৌরীশঙ্কর স্নেহস্রাবী দৃষ্টিতে সুস্নাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সুস্নাতা নতমুখে কহিল, "আমি কি বুঝি বাবা? তবে আজকাল ছেলেদের মত অনেকেই নাকি জান্‌তে চায়, তাই বল্‌ছিলাম" বলিয়াই চুপ করিল।

"তোমাকে যখন আনি, তখনও তো ছেলের মত জান্‌তে চাই নি। সেও তো বেশী দিনের কথা নয়, মা!"

বলিয়াই স্মিতমুখে সুস্নাতার মুখের দিকে চাহিলেন; সুস্নাতা অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিল।

গৌরীশঙ্কর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমার অন্নপূর্ণা মাটীকে বেছে আন্‌তে এই বুড়ো কিছু ভুল করেছে বলেও তো, কেউ কোনো দিন বলে নি।"

সুস্নাতা দুই হাতে শ্বশুরের পায়ের ধূলা মাথায় লইল। সস্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া সন্দিগ্ধস্বরে কহিলেন—"কিন্তু কেন? এ কথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাকে জানাচ্ছ, মা? আমি যা' স্থির করব, তা'তে

নরেশের অমঙ্গল হবে না ;—আর এ শিক্ষাও তো সে পায় নি যে, আমার ইচ্ছাকে ছাড়িয়ে তার ইচ্ছা উঠ্‌বে ! নরেশ তো সে ছেলে নয়, মা !”—

সুস্নাতা মৃদুস্বরে কহিল, “তা’ কি আর আমি জানি না,—কিন্তু”—

“কি, মা ?”—

“আচ্ছা বাবা, কল্যাণী ঠাকুরঝির সঙ্গে ওঁর বিয়ে কি হ’তে পারে না।”—

একটী ছোট আদরিণী মেয়ে তাহার স্নেহময় পিতার কাছে এক-জোড়া তুচ্ছ রাঙ্গাচুড়ির জন্য যেমন করিয়া আব্‌দার জানায়, সুস্নাতা তেমনি করিয়া তাহার কথাটা জানাইল।

গৌরীশঙ্কর মুহূর্ত্তের জন্য ভুলিয়া গেলেন, যে, তিনি প্রবল ক্ষমতাশালী জমীদার, তাঁহার প্রতাপে বাঘ মহিষ একঘাটে জল খায় ! শুধু তাঁহার মনে হইতে লাগিল, তিনি পিতা, আর এইটী তাঁহার একমাত্র স্নেহলালিতা দুলালী ; ইহার দুইটী কোমল বাহুর স্নেহ-বন্ধনের মধ্যে তিনি জন্মজন্মান্তর ধরা দিয়া আসিয়াছেন ! এই চিরমধুর সম্পর্কের মধ্যে জমিদারী নাই, ধন ঐশ্বর্য্য নাই, তীক্ষ্ণ ছুরিকার মত বুদ্ধির পরমাশ্চর্য্য খেলা নাই ; শুধু আছে, রাঙ্গাচুড়ির জন্য, পুতুলের জন্য পুতুলের জামার লালশালু, ছিন্ন সাটীন্ মখ্‌মলের জন্য, সহস্র খুটী নাটীর জন্য সেই চিরন্তন কোমল চোখের একান্ত মিনতি, আর পিতার স্নেহোদ্বেল বিশাল হৃদয় !

কিছুক্ষণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে সুস্নাতার দিকে চাহিয়া থাকিয়া মনে মনে কহিলেন, “বেটী মহামায়ার অংশ। এই বুড়োটার কোথায় দুর্ব্বলতা তা’ ঠিক্ জেনে নিয়েছে।”—

প্রকাশ্যে কহিলেন, “কল্যাণী, কে মা ?”

সাহস বাড়িয়া গিয়াছিল,—সুস্নাতা বলিল, “অশ্রু ঠাকুরপোর বোন্, বেশ মেয়েটী বাবা !”

মেয়েটী যে বেশ, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। মনের মধ্যে কি ছিল, মুখের দিকে চাহিয়া সুস্নাতা কিছুই অনুমান করিতে পারিল না। প্রায় পনের মিনিট চুপ করিয়া রহিলেন, তার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "সবই বুঝ্‌লাম, কিন্তু—আমি যে কথা দিয়ে ফেলেছি, মা!"

ইহার পর অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিঃশব্দে হাতের কাগজপত্রগুলি উল্‌টাইতে লাগিলেন। দেখিয়া মনে হইল না যে, কাগজের লেখাগুলির মধ্যে কোথাও বিশেষভাবে তাঁহার দৃষ্টি ছিল।

হঠাৎ হাতের কাগজপত্র বন্ধ করিয়া, সুস্নাতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি নরেশকে বলো, আমার ব্যবস্থায় তার ইষ্টই হবে। আমার আদেশ সে চির দিন মাথা পেতে নিয়েছে, এবারও নিক্। মঙ্গলই হবে, মা! যাও মা, রাত বেশী হয়ে গেল,—শুতে যাও।"—

সুস্নাতার মনে হইল, ইহাঁর কণ্ঠস্বর একটু কাঁপিতেছে এবং এই দীর্ঘদেহী বলিষ্ঠ প্রকৃতির মানুষটীরও দুই চক্ষু অশ্রুর আভাষে মুহূর্ত্তের জন্য দীপালোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

পর মুহূর্ত্তেই টেবিলের কাগজপত্রের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

সুস্নাতা রোজকার মতই মশারিটা ফেলিয়া শ্বশুরকে প্রণাম করিয়া কম্পিতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পর দিন কর্ত্তা দেওয়ানকে সঙ্গে লইয়া দেহাতে যাইতেছেন, এই খবরটা বাড়ীর ছোটবড় সকলেই যখন জানিল, তখন বেলা প্রায় আট্‌টা।

সুস্নাতা নরেশের ঘরে আসিয়া দেখিল, সে তখনও বিছানায় পড়িয়া কড়িগুলির দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে।

"ঠাকুর দেহাতে যাচ্ছেন, এ কথা কাল রাত্রেও তো বলেন নি!"

নরেশ কোনও কথা বলিল না। একটা ম্লান হাসির রেখা তাহার মুখের উপর দেখা গেল।

সুস্নাতা উদ্বিগ্নমুখে কহিল, "একবার ওঁর কাছে যাও, কবে ফির্‌বেন তাও তো জানি নে, ছাই!"

নরেশ হাসিয়া কহিল, "তা' কি আর তোমায় না বলে যাবেন, বৌদি'! না ডাক্‌লে ওঁর সাম্‌নে যেতে ভরসা পাই নে, ওটা আমার কোষ্ঠীতে নেই, বৌদি'!"

এই দিক্‌পাল ছেলেটীর কথা শুনিয়া সুস্নাতা হাসিতে হাসিতে কহিল, "পরিবর্ত্তন দুনিয়ায় অনেক দেখ্‌লাম; কিন্তু গোঁসাই ঠিক্ একই রকম রয়ে গেলেন;—আচ্ছা, না যাও, ওঠ তো! হাতমুখ ধুয়ে এস, আমি খাবার নিয়ে আস্‌ছি," বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে দিন রাত্রে সরযূকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিবার কথা ছিল।

বিকালের দিকে নীচের ঘরে উৎপল খাবার তৈয়ারী করিতে ব্যস্ত ছিল।

সরযূ আসিয়া কহিল, "সতীশ বাবু বাইরে যাচ্ছেন, টাকা চাই, দিয়ে এসো, দিদি।"—

চাবির গোছাটা ফেলিয়া দিয়া উৎপল কহিল, "আমার হাত যোড়া, লক্ষ্মীটী, যা ত, ট্রাঙ্কের ভিতর টাকা রয়েছে বের করে দিবি।"—

সরযূ চাবি লইয়া চলিয়া যাইতেছিল। উৎপল ভাবিয়া কহিল, "ট্রাঙ্কের বাঁ দিকে দু'তিন খানা কাপড়ের নীচে ব্যাগটা রয়েছে।"

"আচ্ছা", বলিয়া সরযূ চলিয়া গেল।

এ ঘরে আসিয়া ট্রাঙ্ক্ খুলিয়া দু'তিন খানা কাপড়ের নীচে ব্যাগ্ না পাইয়া, সরযূ বাঁদিক্‌কার সবগুলি কাপড় নামাইয়া পাশের বিছানার উপর রাখিল।

সতীশ আসিয়া দোর গোড়ায় দাঁড়াইয়াছিল, কাপড়গুলি নাড়িতেই ব্যাগ্‌টা পাওয়া গেল। সতীশ কিছু টাকা বাহির করিয়া লইয়া ব্যাগ্‌টা সরযূর হাতে দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল।

কাপড়গুলি তুলিয়া গুছাইয়া রাখিতে গিয়া একখানি ক্ষুদ্র ছবি চোখে পড়িয়া গেল। সরযূ হাত বাড়াইয়া ছবিখানি তুলিয়া লইল।

তুচ্ছ কৌতূহল মিটাইতে গিয়া তড়িৎপ্রবাহবাহী ইস্পাতের তারটী স্পর্শ করিবার স্পর্দ্ধা যদি কাহারও হয়, একটা প্রবল আঘাত, এই অনধিকার চর্চ্চার ফলটা তাহাকে হাতে হাতেই জানাইয়া দিয়া থাকে!

ছবিখানির উপর একটীবার চোখ বুলাইয়া লইতেই, একটা তীব্র তড়িৎ ঝঞ্ঝা, তাহার সর্ব্বাঙ্গের উপর দিয়া খেলিয়া গেল। চোখের

সম্মুখে অন্ধকার কালো পর্দ্দার মতই তুলিয়া উঠিয়া দিনের আলো নিভাইয়া দিল।

একটা অস্ফুট আর্ত্ত চীৎকার করিয়া সরযূ খোলা বাক্সটার উপরই ঝুঁকিয়া পড়িল।

আঘাতের তীব্রতায় হরিণ শিশুটী যেমন প্রথমটা মাটীতেই লুটাইয়া পড়ে, তারপর তাহার চঞ্চল দৃষ্টি তুলিয়া একবার এদিকে ওদিকে চাহিয়াই অনির্দ্দিষ্ট আশ্রয়ের জন্য প্রাণপণে ছুটিয়া পলায়ন করে, তেমনি সরযূ, কোনও মতে কাপড়গুলি বাক্সের ভিতরে তুলিয়া ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল!

অঙ্গ-বিদ্ধ বাণটী হরিণ-শিশু বহন করিয়াই লইয়া যায়; এই অতর্কিত গুরু আঘাতের হেতু ছবিখানিও সরযূ লইয়া আসিল।

নিজের ঘরের মধ্যে পৌঁছিয়া, সে যখন মরণাহতের মতই কঠিন মেজের উপর লুটাইয়া পড়িল, তখন তাহার এই বিপুল বেদনার ইতিহাসের সাক্ষী রহিলেন, শুধু অদৃশ্য দেবতা, আর সেই নির্ব্বাক্ প্রশান্তদৃষ্টি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতিখানি!

বিশ্বের পুঞ্জীভূত বেদনা আজ এই অসহায়া বালিকার বুকের মধ্যে রুদ্র হইয়া উঠিয়া তাহাকে দলিয়া, পিষিয়া একেবারে চূর্ণ করিয়া দিয়া গেল।

ঝড়ের রাত্রির পর দিনকার সকাল বেলাটায় প্রকৃতির ছিন্ন ভিন্ন, বিদলিত মূর্ত্তিটীর দিকে চাহিয়া দিকে দিকে যখন মর্ম্মান্তিক হাহাকার জাগিয়া উঠে, তখনও আহত প্রকৃতি স্তব্ধ, অভিভূতই থাকিয়া যায়! সে যে সারা রাত্রি কান পাতিয়া রুদ্রের বিষাদ ধ্বনি শুনিয়াছে, তাণ্ডব-নৃত্যদোদুল ছন্দের মধ্যে মরণের চিরসুন্দর ছায়া দেখিয়াছে; এ তথ্য বিক্ষত বক্ষ-পঞ্জরের মধ্যে জমাট্ করিয়া রাখিয়া দেয়;—বাহিরে

জানায় না, মুখ ফুটিয়া বলে না! এ যে মরণ বেদনার মধ্যে পাওয়া অমৃতের ধারাটী; বিষাণের ধ্বনির মাঝখানে চিরন্তনের বাঁশীর সুরটী জানাইয়া দিয়া গিয়াছে!

ওরে চপল, ওরে উচ্ছৃঙ্খল, ওরে অশান্ত, তুই পাণির অঞ্জলি ভরিয়া এ অমৃত পান কর! তুই কান ভরিয়া এই সুরের মূর্চ্ছনা শুনিয়া শুনিয়া ঘুমাইয়া পড়্।

ভোরের দিকে দুয়ার খোলা পাইয়া প্রতিমা যখন এ ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সরযূ চুপ করিয়া মেজের উপর বসিয়া ছিল।

ঘরের ভিতর তখনও ভাল করিয়া আলো ফুটে নাই। জানালা খুলিয়া দিতে দিতে প্রতিমা কহিল, "সারা রাত দোর খুল্‌লি নে, বাড়ীশুদ্ধ লোক তোর জন্য চোখের পাতা এক করে নি,—কি রে ঠাকুরঝি?"

কিন্তু সরযূর উপর চোখ্ পড়িতেই, অত্যন্ত আতঙ্কে সে একেবারে চীৎকার করিয়া উঠিল!

কেহ একটা মৃতদেহকে জোর করিয়া টানিয়া তুলিয়া বসাইয়া দিয়াছে; তাহার পাণ্ডুর মুখ, জ্যোতিঃহীন দুই চোখ শ্লথবিন্যস্ত দুই বাহু, সর্ব্বোপরি তাহার মুখের উপরকার ম্লান হাসিটুকু!—সুনিপুণ ভাস্কর কল্পনার মর্ম্মর প্রতিমাখানি চিরবেদনার রহস্য কাহিনীটির মতই অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে!

সরযূ তাহার আগুলফলম্বিত চুলের রাশি কাটিয়া ফেলিয়াছে! দুই হাতের সূক্ষ্ম স্বর্ণ-চুড়ি কয়গাছি টানিয়া টানিয়া খুলিয়াছে; সাড়ীর পা'ড় ছিঁড়িয়া চিহ্নহীন করিয়াছে।

এই সদ্যো বিধবার সর্ব্বরিক্ত সন্ন্যাসিনী-বেশ চোখে পড়িতেই, প্রতিমা কাঁদিয়া আকুল হইয়া কহিল, "ওরে এ তুই কি করেছিস্, রাক্ষসি!"

সরযূ হাসি মুখে উঠিয়া আসিয়া প্রতিমাকে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইয়া কহিল, "এই-ই তো আমার সত্যিকার বেশ;—এত দিন

মিথ্যাকে বাড়্‌তে দিয়েছ, বাড়ীশুদ্ধ সকলে একটা বিরাট ফাঁকি চালিয়েছ! দিনের পর দিন অপমান বেড়ে চলেছিল, আজ আসল সত্যটা যতই রুদ্র হোক্‌, তা'কে দেখে চম্‌কালে চল্‌বে কেন, বৌদি' ? তুমি আমাকে ছুঁয়ে আশীর্ব্বাদ কর, বৌদি', সাধ্বীর আশীর্ব্বাদে আমার জীবন-পথ নিষ্কণ্টক হবে ; ধূলা ময়লা যা' কিছু লেগেছে ধুয়ে মুছে নির্ম্মল হ'য়ে যাবে ।"—

প্রতিমা দুই হাত বাড়াইয়া সরযূকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইল। এই দুইটী চিরদুঃখিনী নারীর চোখের জল জাহ্নবীর পবিত্র ধারার মতই নামিয়া আসিয়া যুগসঞ্চিত চিতাভস্ম ধুইয়া মুছিয়া দিয়া গেল !

"কিন্তু তোর এ ভাব দেখ্‌লে মা তো এক মুহূর্ত্তও বাঁচবেন না"—

"না বৌদি', তিনি ঠিক সহ্য করে যাবেন! মিথ্যাটাই নিষ্ঠুর হয়ে উঠে ভিতরে ভিতরে এত দিন তাঁকে পীড়ন করেছে ; এবার তিনি সত্যের আসল মূর্ত্তি দেখে বেঁচে যাবেন ! সংসারে অনেক মেয়েই তাদের মা'দের এই বেশ দেখিয়েছে, কিন্তু তাঁরা মরেন নি, তার কারণ ঐ একই ; সত্যটাকে তাঁরা গোপন করেন নি, চেপে দেন নি বলেই !"—

মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে উৎপল আসিয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইতেই, এই দৃশ্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। ছুটিয়া নিজের ঘরে আসিয়া মাটীতে লুঠাইয়া পড়িল।

সতীশ কাছে আসিয়া, তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া তুলিয়া কহিল "কি ?"—

"কাল তুমি টাকা চাইলে, ওকে চাবি দিলাম, বাক্‌স থেকে টাকা বের করে দিতে! কিন্তু এমনি ছাই মন, নির্ম্মলের ছবিখানা যে কাপড়ের ভাঁজের মধ্যে ছিল, তা' আমি হতভাগী একেবারেই ভুলে

গেলাম। ও সেই ছবি বের করে নিয়েছে নিশ্চয় ;—আজ ওর কাণ্ড দেখে এস ; মাথার চুল কেটে, চুড়ি ফেলে দিয়ে, কাপড়ের পা'ড় ছিঁড়ে, কি পোড়া মূর্ত্তিই করে বসে আছে! একটা রাতের মধ্যে মানুষের চেহারা এমন বদলে যেতে পারে, তা' না দেখ্‌লে কেউ বুঝ্‌বে না।"

সতীশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল ; তার পর উৎপলের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে ধীরে ধীরে কহিল, "এ আমি জান্‌তাম পলি' ! আঁকড়ে ধর্‌বার মত একটা কিছু পেলে ও যে এ সব কর্‌বে, তা' আর কেউ না বুঝুক্‌, আমি ঠিক্‌ই বুঝেছিলাম, এত আয়োজনের মধ্যে কেবল এই আশঙ্কাই আমার মনে জেগেছে!"

উৎপল দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "একটু হিসাবের ভুলে সব মাটী করে দিলাম! মরণেও এ দুঃখ যে আমার যাবে না,"—বলিয়াই আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সতীশ ম্লানমুখে একটু হাসিয়া কহিল, "হিসাব কারু ভুল হয় নি ; যিনি দুনিয়ার সকল হিসাবই রাখেন, ঠিক্‌ তাঁর হিসাব মতই কাজ হয়ে যাচ্ছে, উৎপল! এ কয়টা বছর যতই ওকে দেখেছি, মনে হয়েছে, ওর ভিতরকার সন্ন্যাসিনী মূর্ত্তিটীকে কোনো আয়োজনেই চাপা দিতে পারি নি, কোনো শিক্ষাতেই তাকে অন্ধ করে ভুলিয়ে রাখা যায় নি! সে জোর করে বের হয়ে আস্‌তে চেয়েছে। আজ তার নগ্নমূর্ত্তি দেখে, আশা ভঙ্গের মনস্তাপ কোনো মতেই পাওয়া অন্ততঃ আমার পক্ষে ঠিক্‌ হবে না।"

একটু কাল চুপ করিয়া থাকিয়া, তাহার সজল চক্ষু দুইটীর নির্ণিমেষ দৃষ্টি উপরের দিকে স্থির করিয়া, মৃদুস্বরে নিজের মনেই কহিল, "প্রাণপণ চেষ্টা করেছি ; কিন্তু আমি পারলুম না! এ সমস্যা মীমাংসার শক্তি আমি রাখি নে ; যিনি রাখেন, সকল ব্যবস্থার মালিক তাঁকে দিয়েই

করাবেন। এ বহু শতাব্দীর সংস্কার রক্ত-মাংসের সঙ্গে জড়িয়ে মিশে গেছে ; একে ধুয়ে মুছে চিহ্নহীন করা যাবে কি না, জানি নে ; এই নিষ্ঠা, এই প্রীতির ধ্বংস-সাধন করে দিয়ে এ জাতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়া হবে না, একে সুস্থ, সবল করে তোলা হবে, তাও আজ আমার কাছে সমস্যাই রয়ে গেল।"

সতীশ উঠিয়া এ ঘরের দুয়ারের কাছে আসিতেই, দেখিল, সরযূ!

ছিন্নপা'ড় সাড়ীর আঁচলটা গলায় জড়াইয়া, একটু হাসিয়া, সতীশের পায়ের উপর মাথা রাখিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—

"আমি সরযূ, আশীর্ব্বাদ করুন্, সতীশবাবু।"—

সরযূকে দুই হাতে টানিয়া তুলিয়া, গভীর স্নেহে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কোমল কণ্ঠে সতীশ কহিল, "তোমার এই বেশ দেখে এ বাড়ীর সবাই আজ ভয় পেয়ে গেছে, সরযূ!—কিন্তু আমি পাইনি! তুমি বাঙ্গালার মেয়ে, পিতৃপিতামহীদের কাছে থেকে আগুনে পুড়ে মর্‌বার শক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছ ; এ পুড়ে পুড়ে খাঁটি সোণা হ'তে তুমিই পার! তোমার নিষ্ঠ প্রেম, বাঙ্গালার মেয়েদের নিজস্ব সম্পত্তি! এ ধ্রুব সত্যের মত তোমাকে রক্ষা করুক্!"—

গভীর শ্রদ্ধায় সরযূ সতীশের বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া কথা কয়টী দৈববাণীর মতই শুনিতে লাগিল।

প্রতিমা অশ্রু-জল ছল ছল চোখে দুয়ারের কাঠ্‌টার উপর মাথা রাখিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া ছিল। উৎপল কখন উঠিয়া আসিয়া চোখের জলে ধোয়া প্রস্ফুটিত পদ্মের মত মুখখানি তুলিয়া, স্বামীর মুখের দিকে নির্ণিমেষ চোখে চাহিয়া ছিল।

গৌরীশঙ্কর চলিয়া যাওয়ার পর দিন সন্ধ্যার দিকে নরেশ তাহার পড়িবার ঘরটীতে চুপ করিয়া বসিয়াছিল।

কয় দিন পর্য্যন্ত মনের মধ্যে একটা বিপুল সংগ্রাম চলিতেছিল। দুইটী পথ তাহার সম্মুখে খোলা রহিয়াছে। একটীতে পা' বাড়াইতে গেলেই, আজন্মের সংস্কারের বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে হইবে। জীবনে যাঁহাকে কেহ সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই, সেই পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিতে হইবে।

অন্য পথে একটী মুগ্ধা নারীর বুকের উপর দিয়া উদ্দামগতিতে চলিয়া যাইতে হইবে। সে মরিল কি বাঁচিল, ফিরিয়া চাহিয়া দেখিবার অধিকারও আর তাহার থাকিবে না!

নরেশ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া টেবিলের উপর মাথাটী নীচু করিয়া রাখিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

এই মুহূর্ত্তে অতীত জীবনের ছোট বড় কত ঘটনাই, বায়োস্কোপের ছবির মত, তাহার চোখের সম্মুখ দিয়া নাচিয়া নাচিয়া যাইতে লাগিল; ইহার কোনটাকেই সে তুচ্ছ করিতে পারিল না!

সে বহু দিনের কথা, নরেশ তখন এতটুকুটী; পিতা জননীর কাছে বলিয়াছিলেন, "এই নরেশ এক দিন বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।"—

তার পর কত দীর্ঘ কাল চলিয়া গিয়াছে; জীবনের উপর দিয়া কত রঙ্গিণ স্বপ্নের আনাগোনা গিয়াছে; কত ব্যথা-বেদনার কাহিনী নীরবে জমিয়া উঠিয়াছে, মিলাইয়া গিয়াছে! কিন্তু এই স্বল্পভাষী পিতা সহস্র কার্য্যের এতটুকু অবসরের মধ্যে কবে তাহাকে কোন্ কথাটী বলিয়াছিলেন, কবে

নিঃশব্দে তাহার মাথার উপরে হাতখানি রাখিয়াছিলেন ; নরেশ তাহার বালকের কল্পনায় হয় তো মনে করিয়াছে, যে বলিষ্ঠ হাতখানি একটু কাঁপিয়াছিল, চোখের কোণে হয় তো একটু অশ্রুর আভাষ দেখা গিয়াছিল। হয়তো, এগুলি নরেশ ভুল করিয়াছে, না হয় ঠিকই দেখিয়াছে !

কিন্তু এইসব ছোট খাটো কাহিনী তাহার বুকের মধ্যে চির দিনের জন্য বাসা বাঁধিয়াই রহিয়া গেল !

আজ বুকের মধ্যে ইহারা রক্তবীজের মতই বিনাশহীন হইয়া উঠিয়া, মাথা তুলিয়া সাড়া দিতে লাগিল !

অতীত দিনে পিতার সামান্য এতটুকু কথাটীও আজ তাহার কানে কানে অফুরন্ত স্নেহভাণ্ডারের সংবাদ জানাইয়া গেল। পিতার সেই কবেকার এতটুকু অপূর্ব্ব স্পর্শ অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিয়া, তাহার সর্ব্বাঙ্গে মঙ্গল হস্ত বুলাইতে লাগিল ! চোখের সেই অশ্রুর আভাষটুকু উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়া পরমাশ্চর্য্যরূপে তাহার বুকের ভিতরকার দাবদাহ শীতল করিয়া দিতে চাহিল !

ওরে, কে বলিয়াছিল, "আমার মায়ের চোখের এক ফোঁটা জল এক দিকে, আর অর্দ্ধপৃথিবী-ব্যাপী সাম্রাজ্য এক দিকে ?"—

নরেশ উঠিয়া ঘরের বাহিরে খোলা বারান্দার উপর আসিয়া দাঁড়াইল।

উপরে নক্ষত্রখচিত অনন্ত নীলাকাশ ; শুক্ল-পক্ষের তৃতীয়ার বাঁকা-চাঁদ দূরের একটা ঝাউ গাছের আড়াল হইতে এই বারান্দার উপর ম্লান আলোক ফেলিতেছিল। সুরসুন্দরীগণের সেই চির দিনের আনাগোনার ছায়া-পথটী আকাশের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত জুড়িয়া রহিয়াছে !

সেই অন্তহীন নীল আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া নরেশের মনে

হইতে লাগিল, এই বিচিত্র দুনিয়ার লক্ষকোটী রহস্যের মাঝখানে ক্ষুদ্র মানুষ তাহার সুখ দুঃখের ভাঙ্গাগড়া লইয়া ব্যস্ত! কিন্তু কি তুচ্ছ এই মানুষ! ইহার আবার হাসিকান্না; ইহার আবার মনে অভিমান।

বারান্দার রেলিংএর উপর দুই হাতে ভার রাখিয়া নরেশ তাহার মাথাটী নীচু করিয়া চক্ষু বুজিয়া রহিল।

একখানি চূর্ণকুন্তল বেষ্টিত পরম সুন্দর মুখ মনের মধ্যে অতিসন্তর্পণে জাগিয়া উঠিয়া, দুই চোখের অশ্রু সজল দৃষ্টিতে বলিয়া গেল,—

"নিষ্ঠুর, ওরে নিষ্ঠুর মানুষের হাসিকান্না মিথ্যা নয়! এর প্রত্যেকটী নিশ্বাস জমিয়া জমিয়া প্রলয়ের ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করে; প্রতি অশ্রুবিন্দুটী সঞ্চিত হইয়া বিশ্ববিধ্বংসী প্লাবন জাগায়।"—

নরেশের দুই কপোল বাহিয়া বিন্দুর পর বিন্দু অশ্রু নামিতে লাগিল।

সুস্নাতা আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, "ঠাকুরপো!"—

নরেশ মুখ তুলিতেই, সুস্নাতা কহিল, "ছিঃ, চোখের জল মুছে ফেল!"

নরেশ জানিত, এই মেয়েটীর কাছে তাহার কোন লুকোচুরিই কোনো দিন খাটে নাই। এত বড় বাড়ীটার মধ্যে কোনও ব্যাপারই ইহার চক্ষু এড়াইতে পারে না, ইহা সকলেই জানিত।

ম্লান মুখের উপর জোর করিয়া হাসি আনিয়া নরেশ কহিল, "কেন, আমি তো তোমাকে বলেছি, বৌদি; শুধু এই ক'টা দিন আমার উপর চোখ রেখো না! আমি যে তোমাদের ব্যথা দিতে পারি নে, এ আর কেউ না জানুক, তুমি তো জান! সে সুখের কল্পনা যেন আমার মনে স্থান পায় না, যার জন্য তোমাদের মনে, আমার বাবার মনে, এতটুকু আঘাতও লাগ্‌তে পারে! স্বার্থ জিনিষটাকে বড় করে দেখ্‌বার শিক্ষা, তোমাদের জীবন দিয়ে তো তোমরা কেউই আমাকে দাও নি,"—

প্রায় পাঁচ মিনিট কাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল "নিজের মনের

সঙ্গে বোঝাপড়া কোনো দিন শেষ কর্‌তে পার্‌ব কি না জানি না, কিন্তু কি আমি বৌদি. যে আমার জন্য বাবার মনে ব্যথা লাগ্‌বে? কে ঐ কল্যাণী, যার জন্য আমাদের এই সুখের সংসারে এক মুহূর্ত্তের জন্য বিদ্রোহের পতাকা উড়্‌বে, একটী দিনের জন্যও অশান্তির সৃষ্টি হবে?"

নরেশের কথা শুনিয়া সুস্নাতার চোখে জল আসিতেছিল, তবু সে স্থিরকণ্ঠে কহিল, "আচ্ছা ঠাকুরপো, ক'টা জীবন তুমি মিলনান্ত দেখেছ? আমার তো বিয়োগান্ত ছাড়া চোখেই পড়ে নি! আমাদের এই গৃহস্থ ঘরের সাদাসিধে জীবনগুলি নাটকও নয়, নভেলও নয়, কিন্তু তবু এর বিচিত্রতারও তো অন্ত নেই! এমনি মজা, এর আকাঙ্ক্ষার সীমারেখাটী পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করে দেওয়া রয়েছে, অথচ প্রতিমুহূর্ত্তে এই দুর্বার মানব-চিত্তের কতদিক্‌কার খেলা কতদিক্ দিয়েই প্রকাশ হয়ে পড়্‌চে!"—

নরেশ নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে সুস্নাতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুস্নাতা কহিল, "তোমার ব্যথা কি আমি বুঝিনি, ঠাকুরপো? তবু চির দিনের সংস্কার তো ছাড়্‌তে পারি নে! শুধু এই কথাটাই বারবার মনে হয়, আমাদের এতটুকু কাজের দ্বারা কোনও দিন ঠাকুর যেন ব্যথা না পান! সংসারে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক্, এইই যেন আমাদের জীবনের মূলমন্ত্র হয়। তিনি যখন বল্‌লেন, "নরেশকে ব'লো আমার ব্যবস্থায় তার ইষ্টই হবে, আমার আদেশ সে চির দিন মাথা পেতে নিয়েছে, এবারও নিক্, মঙ্গলই হবে, মা!"—তখন তাঁর চোখেও আমি জল দেখ্‌লাম মনে হ'ল; গলার স্বরের মধ্যে স্নেহের সে যে কি প্লাবনই লুকানো ছিল, তা' সে দিন তো আমি নিজেই জেনেছিলাম।"

সুস্নাতার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, চোখের জল গোপন

করিবার কোনও চেষ্টাই না করিয়া কাঁদিয়া কহিল, "তুমি ঠিকই বলেছ, ঠাকুরপো, কি আমরা যে তাঁকে ব্যথা দেব? একটা কথা আমার সব সময়েই মনে হয়, এবং তা' তোমাকে আমিও জানিয়ে রাখি! তাঁর কথা কোনো দিন মিথ্যা হ'তে দেখি নি, তিনি বলেছেন, মঙ্গল হবে, আমারও মন ভিতরে ভিতরে ডেকে বল্‌ছে, মঙ্গল হবেই! কিন্তু কেমন করে কোন্ পথ দিয়ে যে হ'বে, তা' জানিনে।"—

তৃতীয়ার ক্ষীণ চন্দ্র কখন অস্ত গিয়াছে। আকাশের তারাগুলি পৃথিবীর এই ছেলে-মেয়ে দুইটীর মুখের দিকে চাহিয়া ফুটিয়া রহিয়াছে!

দূরের ও নিকটের বনান্তরালে অন্ধকার গাঢ় হইয়া রহিয়াছে। পল্লী সুপ্তিমগ্ন; কেবল অদূরের নদীটীর জলের উপর দিয়া উঠিয়া মাঝিদের সারিগান কাঁপিয়া কাঁপিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল; এবং শব্দপূর্ণ রাত্রির গভীরতার মধ্যে নৌকাগুলির দাঁড়ের শব্দ তালে তালে উঠিতেছিল, পড়িতেছিল!

সপ্তাহ পরে এক দিন মহাসমারোহে এ বাড়ী হইতে বিবাহের শোভাযাত্রা বাহির হইয়া গেল। কিন্তু যাহাকে লইয়া সমারোহ তাহার মুখের উপর এ বাড়ীর দুইটী প্রাণীর স্নেহস্রাবী দৃষ্টি সর্ব্বক্ষণ পড়িয়া ছিল। একজন গৌরীশঙ্কর স্বয়ং, অন্যজন এই গৃহেরই মঙ্গললক্ষ্মী, পরম স্নেহশালিনী সুস্নাতা!

সুস্নাতার দৃষ্টি উদ্বেগ ও ব্যথায় পরিপূর্ণ; গৌরীশঙ্করের মুখের উপর একটা তৃপ্ত আনন্দের অনাবিল উচ্ছ্বাস! শুধু নরেশের স্বর্গীয়া জননীকে মনে পড়িয়া, জ্যোৎস্নার উপরে চলন্ত মেঘের ক্ষণিক ছায়াপাতের মতই, মাঝে মাঝে চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু তাহা এতই ক্ষণিক, যে, সুস্নাতার চোখে ছাড়া আর কাহারই চোখে ধরা পড়ে নাই!

যাত্রা করিয়া বাহির হইবার সময় সুস্নাতা আসিয়া, নরেশের কানে কানে কহিল, "তুমি সাধারণ পাঁচজনের মত নও, আমার এই গর্ব্ব তুমি অটুট্ রেখো, ঠাকুরপো !"

নরেশ নীচু হইয়া সুস্নাতাকে প্রণাম করিতে গেল, সে সরিয়া গেল ! জোর করিয়া দুই হাতে তাহার পায়ের ধূলা লইয়া নরেশ কহিল, "আজ মা নেই, আমি কার পায়ের ধূলা নিয়ে যাত্রা ক'রে বেরুব, বৌদি' ? আজ তোমার পায়ের ধূলাই আমার রক্ষাকবচ হবে !"—

সুস্নাতার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেই, সে তাড়াতাড়ি নীচু হইয়া রেকাবী হইতে ধানদূর্ব্বা তুলিয়া লইল ; এবং নরেশের মাথার উপর হাতখানা ছোঁয়াইয়াই, দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

এ কয় দিন সরযূ মায়ের সম্মুখে মোটেই বাহির হয় নাই। আজ হঠাৎ নীচের ঘরে আসিয়া, মার পূজার আয়োজন করিতে লাগিয়া গেল।

মা তখন আসনের উপর বসিয়া মালা ফিরাইতেছিলেন। সরযূর এই মূর্ত্তি আজই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার চোখে পড়িতেই, তিনি একেবারে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন; হাতের মালা মুঠির মধ্যে ঘুরিয়া আসা বন্ধ হইয়া গেল।

হঠাৎ এদিকে ফিরিয়া সরযূ কহিল, "মা, আমি শিবপূজা নেব। মন্ত্রগুলি সব এ কয় দিনে মুখস্থ করে ফেলেছি, তুমি শুধু পূজাপদ্ধতিটা,"—

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই মায়ের মুখের উপর চোখ পড়িতেই, সে চেঁচাইয়া ডাকিল, "মা—মা,"—

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না; রক্তহীন মুখখানার উপর একটা তীব্র বেদনার চিহ্ন দেখা গেল।

"ও দিদি," বলিয়া একটা ডাক দিয়াই, সে দুই হাতে মাকে জড়াইয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে আসনের উপরেই শোয়াইয়া দিল।

উৎপল ও প্রতিমা এই সময়ে এ ঘরে দৌড়াইয়া আসিল, গোল শুনিয়া উপর হইতে সতীশ নামিয়া আসিল।

প্রায় পনের মিনিট পরে মার জ্ঞান সঞ্চারের লক্ষণ দেখিয়া, সরযূ ধীরে ধীরে তাহার উপরের ঘরটীতে চলিয়া গেল।

ইহার পর সরযূ উপরের ঘর হইতে বড় একটা নীচের ঘরে আসিত না। পূজাপদ্ধতির একরাশ বই বাজার হইতে আনাইয়া সেই আলোচনাতেই দিনরাতের বেশীর ভাগ কাটাইয়া দিতে লাগিল।

কিন্তু ইহার কিছুতেই তাহার মনের ভিতরকার অস্বস্তির পরিমাণ কমিয়া গেল না।

গভীর রাত্রিতে যখন সকলেই ঘুমাইয়া পড়িত, তখন সে নির্ম্মলের ছবিখানির দিকে পলকহীন চোখে চাহিয়া বসিয়া থাকিত!

জীবনের যত কিছু ভুল ভ্রান্তি, ত্রুটী বিচ্যুতি একে একে নিবেদন করিয়া দিয়া সে যখন মাটীতে লুটাইয়া পড়িত, তখন তাহার বুক ফাটিয়া হাহাকার উঠিত!

"নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর কিছু রেখে যাও নি তোমার স্মৃতি! কোন্ সাগরের অতল তলে তোমাকে খুঁজে পাব? তোমার সঙ্গে যোগ কেমন করে প্রত্যক্ষ কর্‌ব, ওগো, জানিয়ে দাও আমায়,—জানিয়ে দাও!"—

কাঁদিয়া কাঁদিয়া সরযুর মনে হইত, ছবির চোখের দৃষ্টিতে অমৃত ক্ষরিত হইতেছে,—ঠোঁট দুইখানি কাঁপিয়া কাঁপিয়া নড়িয়া উঠিতেছে!

সরযু নিশ্বাস বন্ধ করিয়া, চোখ বুজিয়া বসিয়া বসিয়া অনুভব করিত, সেই রুদ্ধ কক্ষের মধ্যে কাহার নিঃশব্দ পদসঞ্চারণ মধুগন্ধ আনিয়া দিয়াছে; তাহার রুক্ষ কপোলের আশেপাশে কাহার নিঃশ্বাসের অতি মৃদু স্পর্শ আসিয়া লাগিতেছে!

সরযু তাহার দুই যুক্ত পাণি-পদ্ম বাড়াইয়া দিত, "ওগো দয়াল, ওগো দয়িত! ওরে কাঙ্গাল চিত্তের হীরা জহরৎ, এস, তুমি, এস! বুকের রক্তের তালে তালে তোমায় অনুভব কর্‌তে দাও! মরণের তাপহরণ স্পর্শে তোমার আলিঙ্গন জানিয়ে যাও!—ওগো জানিয়ে যাও!"—

সে দিন কালীঘাটে মায়ের বাড়ীতে কি একটা বিশেষ তিথিতে পুণ্যপিপাসুদলের ভিড় লাগিয়াছিল! এ দিন সরযুর অনুরোধে সতীশ বাড়ীর মেয়েদের গাড়ী করিয়া লইয়া আসিয়াছিল। প্রতিমা দর্শন শেষ

হইয়া গেলে, এই ক্ষুদ্র দলটী মন্দির প্রবেশের সঙ্কীর্ণ পথটী অতিবাহন করিয়া গাড়ীর কাছে ফিরিয়া আসিতেছিল।

দুই কাতারে দোকানের সারি ; ডালির দোকান ; খাবারের দোকান, চিনিবাতাসার দোকান, বিচিত্র খেলনার দোকান ! কোনও মতে পথ করিয়া সতীশ অগ্রসর হইয়া যাইতেছিল ; পশ্চাতে উৎপল ও সরযূ।

সতীশ গাড়ীর কাছে প্রায় পৌঁছিয়া গিয়াছে ; হঠাৎ একটা গোল উঠিল। সতীশ ফিরিতেই দেখিল, উৎপল ঠিক তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ; কিন্তু সরযূকে দেখা গেল না। সতীশ উদ্বিগ্নমুখে দুই পা হটিয়া আসিয়া দেখিল, একটা দোকানের পাশ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া সরযূ কাঁপিতেছে।

একটু দূরে একটী ক্ষীণকায় যুবক একটা বলিষ্ঠ লোকের চোখে মুখে ঘুষির পর ঘুষি চালাইতেছে।

সতীশ সরযূকে রক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া আসিল ; "ব্যাপার কি সরযূ ?"—

সরযূ উদ্বিগ্নস্বরে কহিল, "ঐ লোকটা আমার কাপড় ধরে টেনেছিল, ছেলেটী পিছনে পিছনে ছিল, একেবারে বাঘের মত এসে পড়ে এই কাণ্ড বাধিয়েছে।"—

সতীশ মুহূর্ত্তের মধ্যে সবটা বুঝিয়া লইল ; সরযূকে একপ্রকার টানিয়া আনিয়া গাড়ীতে উৎপলের পাশে তুলিয়া দিল। ফিরিয়া দাঁড়াইতেই সরযূ চেঁচাইয়া কহিল, "ছেলেটীকে তিন চারজনে ঘিরে ধরেছে, ওকে যে মেরে ফেল্‌ল, কি হবে, সতীশবাবু ?"

"ভয় নেই সরযূ, কলেজ লাইফে যত মুগুর ভেঁজেছি, লাঠি খেলেছি, সে শুধু সখ মেটাতে নয় ! তোমাদের শিবঠাকুরটী কেবল মাটীর তৈরীই নয়,"—মুহূর্ত্তের মধ্যে তুমুল ব্যাপার বাধিয়া গেল।

সতীশ আস্তিন গুটাইয়া রঙ্গমঞ্চে পৌঁছিয়াই, চীৎকার করিয়া কহিল, "খবরদার, মা বোনের ইজ্জৎ যে বাঁচায়, তার গায়ে হাত দেওয়ার স্পর্দ্ধা যে কুক্কুরের হবে, তার মাথাটা গুঁড়িয়ে দেব !"

কিন্তু কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ছেলেটীকে ছাড়িয়া একটা লোক সতীশকে আক্রমণ করিল। তাহার উদ্যত মুষ্টি সতীশের উপর নামিয়া আসিল। সতীশ প্রস্তুত ছিল, বাঁহাতে হাতখানা ধরিয়া ফেলিল ; কিন্তু সতীশ ঋণ রাখিল না, সুদ সমেত ফিরাইয়া দিল ; ঘুষি খাইয়া লোকটা উল্‌টিয়া পড়িয়া গেল।

তখন কয়েক মিনিট পর্য্যন্ত সতীশের অজস্র মুষ্টিপ্রহারে আক্রমণকারী লোক কয়টা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল।

কিন্তু সতীশ জানিত, এ ভাবে বেশীক্ষণ চলে না, তাই সুশিক্ষিত যোদ্ধার মতই ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া পিছনে হটিয়া গাড়ীর কাছে পৌঁছিয়া গেল।

এবং চক্ষের পলকের মধ্যে এক লম্ফে গাড়ীতে উঠিয়া ছেলেটীকে টানিয়া তুলিল।

ট্যাক্‌সির শফারটী পাঞ্জাবী শিখ্‌ ; মুগ্ধ দৃষ্টিতে সতীশের এই অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখিতেছিল।

এখন প্রশংসায় তাহার দুই চোখ্‌ জ্বলিয়া উঠিল।

"বহুৎ খুব, বাবুসাহেব !" বলিয়াই সে হর্‌ন্‌ চাপিয়া গাড়ী ছুটাইয়া দিল ; এক নিমেষে গাড়ী দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়া গেল।

সতীশ ছেলেটীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "খুব লেগেছে ?"—

ছেলেটী একটু হাসিয়া কহিল, "কি আর করা বলুন ; গায়ে জোর না থাকলে, মান ইজ্জৎ নিয়ে চলাই দুষ্কর,—দু' ঘা খেতেই হবে ! কিন্তু আপনাকে আমার হিংসা হচ্ছে, আপনার তখনকার

মূর্ত্তি দেখে মনে হচ্ছিল, এ জাতটার মরবার এখনও দেরী আছে !”—

“ইঃ, কপালটা বড্ড ফুলে গেছে যে ! চলুন বাসায়, বেশ সুস্থ না হ’লে ছেড়ে দিচ্ছি নে !”—

ছেলেটী হাসিয়া কহিল, “ও কিছু নয়, ঠিক্ হয়ে যাবে এখুনি ! আপনার বাসাটা কোথায় ?”—

“বাদুড়বাগানে,”—

“ভালই হয়েছে, সুকিয়া ষ্ট্রীটের মোড়ে আমাকে নামিয়ে দিয়ে যাবেন, কাছেই আমাদের মেস্”—

“ও রে বাস্ রে, সে কি হয় !” বলিয়াই সতীশ মাথা নাড়িতে নাড়িতে কহিল, “অকৃতজ্ঞ নামটা নিতে মোটেই রাজি নই, আর এই সঙ্গে যাঁদের দেখ্‌চেন, এঁদের কাছে বাঁচ্‌বার কোনো পথই তা’ হলে আর রাখ্‌বেন না ! মানুষকে বিপদগ্রস্ত কর্‌বার মত চেহারা তো আপনার মোটেই নয় !”

বলিয়াই সতীশ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। উৎপল ও সরযূ উভয়েই অর্দ্ধাবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া ছেলেটীর মুখের দিকে এতক্ষণ চাহিয়া ছিল।

ইহার বয়স আঠারো উনিশ বছর হইতে পারে ; ছিপ্‌ছিপে দোহারা চেহারা ; মুখখানি অত্যন্ত কমনীয় ; চোখের দৃষ্টির মধ্যে একটা বিশেষত্ব ছিল, যাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে পরকে আপন করিতে পারে।

উৎপল ইশারায় সতীশকে কাছে ডাকিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, “ছেলেটীর নামটী জান ত, ও অমল কি ? নয় দশ বছর আগে এতটুকুটী দেখেছি, ভুল হতেও পারে। কিন্তু ওর চোখের মাঝের ঐ তিলটী তো আমি ভুলি নি !”—

কথা কয়টী অন্যদিকে উপবিষ্ট ছেলেটীর কানে গেল। সে অত্যন্ত বিস্ময়ে উৎপলের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "হাঁ, আমি অমল, কিন্তু আপনি আমাকে চিন্‌লেন কি করে?"—

উৎপল কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই গাড়ী আসিয়া বাসার দুয়ারে দাঁড়াইল।

সরযূর কাছে সমস্ত ব্যাপারটা একটা বিপুল রহস্যের মত মনে হইতেছিল।

কিন্তু এই ছেলেটীর ঠোঁটের অপূর্ব্ব ভঙ্গিটি, চোখের অসাধারণ বিস্তারটুকু, প্রশস্ত ললাটের কাছে চুলগুলির উচ্ছৃঙ্খল বিন্যাস সরযূর চোখে একটা প্রহেলিকার সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল।

তাহার মনের মধ্যে প্রথমেই এই একটা প্রশ্ন জাগিয়া উঠিল, "কে এ? মানুষে আর ছবিতে এমন সাদৃশ্য কেমন করিয়া হয়?"

সরযূর বুকের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল; তাহার কণ্ঠনালীটা কে যেন সবলে মুঠা করিয়া টিপিয়া ধরিল।

সারাপথের কর্ম্মকোলাহল, অশ্রান্ত ঘর্ঘর ধ্বনি, তাহার কানে আসিল না; লক্ষ জনের আনাগোনা, রাজপথের বহু বিচিত্রতা কিছুই তাহার চোখে পড়িল না! সে অবগুণ্ঠনের আড়াল হইতে এই ছেলেটীর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়াই রহিল।

উপরে আসিয়া সতীশ যখন জানিল, এ নির্ম্মলের কনিষ্ঠ অমল, তখন তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না।

অমলকে ধরিয়া আনিয়া সরযূর কাছে পৌছাইয়া দিয়া সতীশ কহিল, "এ অমল, তোমার শ্বশুরকুলের এই প্রদীপটীই মাত্র জ্বালা আছে; একে পাওয়ার প্রয়োজন আজ, বোধ হয়, তোমার সব চেয়ে বেশী ছিল, তাই ঠাকুর একে অদ্ভুত উপায়ে এনে দিলেন! জান

অমল, তোমার হাত দিয়ে আজকার ইজ্জত ঠাকুর রক্ষা করেছেন ?—ইনি তোমার বৌদি' সরযূ,"—

সতীশের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিতেছিল, উৎপলের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "দেখেছ ব্যবস্থা ? কোথায়ও এতটুকু ভুলচুক্ নেই ! প্রয়োজন মত সব এসে জুটে যায় ; এবং সে যে কত বড় অতর্কিত পথ দিয়ে তা' তো নিজ চোখেই দেখ্‌লে ! তবু মানুষ শক্তিমান্ বলে গর্ব্ব কর্‌তে তো ছাড়্‌বে না।"

নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে অমল তাহার প্রকাণ্ড দুটা চোখ মেলিয়া ধরিয়া সরযূর তপঃ-কৃশ মুর্ত্তিটীর দিকে চাহিয়া রহিল !

সরযূ শিহরিয়া উঠিয়া মনে মনে কহিল, "ওগো লজ্জাহরণ, আজ তুমি আমাকে বাঁচালে,—আমার মুখ রক্ষা কর্‌লে,"—

তাহার ভূষণহীন দুইখানি হাত, সাদা কাপড়ের গড়াখানি, কুন্তলহীন মাথাটা আজ তাহার কাছে সব চেয়ে বড় পরিচয়-পত্র হইয়া উঠিল ! আজ নির্ম্মলের বিধবা নির্ম্মলের কনিষ্ঠের কাছে নিঃসঙ্কোচে দাঁড়াইয়াছে ; সে যে অমলেরই আপনার জন ইহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না ; এই সর্ব্ব-রিক্তার বেশ, ভূষা ইহা নিঃসংশয়ে জানাইয়া দিল।

"বৌদি" বলিয়াই অমল প্রণাম করিয়া দুই হাতে সরযুর পায়ের ধূলা লইল।

এই 'বৌদি' কথাটা সরযূ দুই কান ভরিয়া গ্রহণ করিল !

এতটুকু একটা ক্ষুদ্র কথার মধ্যে এত ছন্দ, এত মধুও সঞ্চিত থাকিতে পারে !

আজ সে তাহার শ্বশুরের ভিটার সঙ্গে যোগসূত্র খুঁজিয়া পাইয়াছে ! আজ সে সার্থক, পাঁচজনের মত সংসারে তাহারও প্রয়োজন আছে !

সরযূর দুই চোখ জলে ভিজিয়া উঠিল। সতীশের দিকে ফিরিয়া অমল কহিল, "বৌদি'কে আমার কত বড় প্রয়োজন তা' শুন্‌লে আপনি অবাক্ হ'য়ে যাবেন, সতীশবাবু! পিতৃকুলে আপনার বল্‌তে কেউ নেই, মামার বাড়ীতে প্রতিপালিত হচ্ছিলাম, একমাত্র মামা ছিলেন, তিনিও দু'দিন হ'ল মারা গেছেন। কাল বিকালে উকীলের টেলিগ্রাম পেলাম, উইলকরে অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক তিনি আমাকেই করে গেছেন! প্রথমটাই মনে হ'ল পিতৃ-পিতামহের ভিটায় প্রদীপ জ্বাল্‌ব; কিন্তু কে আপনার জন, যে বুক দিয়ে পড়ে আমার কল্পনা সার্থক করে তুল্‌বে, শুধু এই কথাটা মনে করে এতটুকু স্বস্তি এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এক মুহূর্ত্তও পাইনি।

আজ সকালে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়্‌লাম, সুকিয়া ষ্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম যাচ্ছিল, চাপ্‌লাম; কোথায় যাব জান্‌তাম না, তবু মনে হ'ল কে যেন মায়ের বাড়ীর দিকে টেনে নিয়ে চলেছে; 'দর্শন' করে ফিরে আস্‌তে আস্‌তেই মা যে এম্‌নি করে তাঁর আশীষ নির্ম্মাল্য আমার মাথায় তুলে দেবেন তা' তো মনেই করিনি, সতীশবাবু!"

অমল তাহার অশ্রুপূর্ণ দুই চোখ সরযূর মুখের দিকে তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "তোমাকে আশ্রয় পেয়ে বেঁচে গেছি, বৌদি'! এ যে কত বড় পাওয়া তা' আমি ছাড়া আর কেউ বুঝবে না! তুমি চল বৌদি,' তোমাকে প্রতিষ্ঠা করে আমাদের ছোট সংসারটী গড়ে তুল্‌ব! মায়ের স্নেহ জান্‌বার সুযোগও জীবনে হয়নি বৌদি', তোমার কাছে সব দাবীই জমা রইল! সব দিক্ থেকে আশ্রয় দিয়ে এই ছন্নছাড়া হতভাগ্যকে মানুষ করে দেবার ভারও তোমার উপর রইল, বৌদি'!"—

এই নিতান্ত আপনার জন আজ সরযূর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার

জীবনের কাহিনীটি এমন করিয়া বলিয়া গেল, যে, সকলের চোখই অশ্রু-প্লাবিত হইয়া উঠিল।

সরযূ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিল; তাহার ঠিক সম্মুখে দাঁড়াইয়া, তাহার স্বামীর ভিটার সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্র, অমল!

সে এইমাত্র সরযূরই ইজ্জৎ রক্ষা করিবার জন্য বীরের মতই যুঝিয়া আসিয়াছে! ছিন্নভিন্ন, কাদা মাটীতে মাখামাখি, জামাটা এখনও তাহার গায়ে রহিয়াছে; প্রাপ্ত আঘাতের কালশিরা পড়া দাগটা এখনও উন্নত ললাট জুড়িয়া রহিয়াছে!

সরযূ স্নেহ-কোমল দৃষ্টিতে অমলের মুখের দিকে চাহিল; তারপর মনে মনে কাহাকে প্রণাম করিয়া দুই চক্ষু মুদ্রিত করিল!

কলিকাতার একটা প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়ীতে অত্যুজ্জ্বল আলোক-মণ্ডিত বিবাহ-সভা।

নরেশ কোনও দিকে না চাহিয়া যখন নতমুখে আসনের উপরে দাঁড়াইল, তখন তাহার মুখ মৃতের মুখের মতই বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। চারিদিক্‌কার আনন্দ কোলাহলের সঙ্গে তাহার যোগ তো ছিলই না, কাহারা যে তাহার চারিপাশে কর্ম্মব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, তাহাও সে একবারটী চোখ তুলিয়া দেখিল না।

একটা বিরাট মিথ্যার ছায়াবাজির খেলাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার জন্য যেন তাহার চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরা হইয়াছে! এই মঙ্গল রচনা, এই আলোক-মালা, এই কর্ম্ম-কোলাহল ইহার কিছুই সত্য নহে—এই কথাটাই তাহার বার বার মনে হইতে লাগিল।

ফাঁসির আদেশ পাইলে, যেমন এক মুহূর্ত্তের মধ্যে অপরাধীর চোখে সমস্ত দুনিয়াটা একেবারে ফিকে হইয়া যায়, এবং ইহার সমস্ত যাদু পলকের মধ্যে খসিয়া পড়ে, পুরোহিতের উচ্চারিত মন্ত্রগুলি দুই কানের মধ্যে বিচারকের নির্ম্মম আদেশের মতই প্রবেশ করিয়া নরেশের অবস্থাটাও ঠিক্ তেমনি করিয়া তুলিল। কোনও মন্ত্রের অর্থ গ্রহণ তো সে করিতেই পারিল না, বেশীর ভাগে মঙ্গল ঘটের উপর স্থাপিত হাতটার মধ্যে যাহার সুগৌর হাতখানি পৌঁছিয়া গেল, তাহার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহিল না!

সেই পাণিপদ্মের রংএর সঙ্গে স্বর্ণচুড়ি কয়টা মিশিয়া রহিয়াছে; বলয়ের পার্শ্বে মঙ্গল শঙ্খ বিজলীর উজ্জ্বল দ্যুতিতে শুভ-সূচনা করিতেছিল; এবং সেই স্বেদসিক্ত হাতখানি অল্প অল্প কাঁপিতেছিল!

বিবাহ-সভায় লোকজনের আসা যাওয়া সমভাবেই চলিতেছে; মাঝে মাঝে গৌরীশঙ্করের কণ্ঠস্বর কানে আসিয়া তাহাকে সচকিত করিয়া তুলিতেছিল। নরেশ একবার চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল,

সেই সৌম্যমূর্ত্তি বিরাট পুরুষ হাসিমুখে কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছেন, কিন্তু তাঁহার দুই চোখের দৃষ্টি নরেশের মুখের উপর পড়িয়া রহিয়াছে। নরেশ মনে মনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মাথা নীচু করিল।

সম্প্রদান শেষ হইয়া গেল! হোমধূমের পবিত্র গন্ধে যখন চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, তখন নরেশ ও নূতন বধূকে একটা সুসজ্জিত কক্ষে লইয়া যাওয়া হইল!

এ ঘরে আসিয়া হঠাৎ মাথা তুলিতেই যে মানুষটীর অত্যন্ত পরিচিত মুখ নরেশের চোখে পড়িল, তিনি কাছে আসিয়া হাসিমুখে কথা না বলিলে, সে কোনও মতেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করিতে পারিত না।

কিন্তু চক্ষু ও কর্ণ এই দুয়েরই সাক্ষ্যকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া কঠিন। নরেশ প্রথমটা স্তম্ভিতের মত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল; তারপর তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া প্রণাম করিতে গিয়া—

"কাকীমা, তুমি এখানে?"—

বলিয়াই দুই চোখের জলে তাঁহার পা' দু'খানি ভিজাইয়া দিল।

দুই হাতে নরেশকে টানিয়া তুলিয়া "কেন নরু, তোর বিয়েয় কি আমার যোগ দিতে নেই রে?"

বলিয়াই হাসিমুখে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে গিয়া মানদা সুন্দরীর দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল।

কিন্তু এই চোখের জলের মধ্যেও, বৃষ্টির জল ধোওয়া প্রভাত সূর্য্যের কোমল দীপ্তির মতই, মুখের আনন্দদীপ্তিটুকু অটুট্ রহিয়া গেল!

দারুণ বিস্ময়ে মুখ তুলিয়া নরেশ কহিল,"সব জেনে শুনে আমার এত বড় দুর্ভোগ তুমি নিজের চোখেই দেখে কেমন করে বাঁচ্‌লে, কাকীমা?"

মানদাসুন্দরী কহিলেন, "দুর্ভোগ নয়, বাবা, তুমি নিজের ইচ্ছায়

দুঃখকে বরণ করে আমাদের সবারি মুখ উজ্জ্বল করেছ, নরু! এ যে আমার কত বড় গর্ব্বের কথা, তা' শুধু আমিই জানি।"

হঠাৎ কি ভাবিয়া উঠিয়া পড়িয়া "কিন্তু আজ আর কোনো কথা নয়, শরীরটাকে অনর্থক যথেষ্ট কষ্ট দিয়েছ, রাতও বড় একটা নেই, একটু বিশ্রাম চাই ত,"—

বলিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার সময়ে নরেশের অপরিচিত অন্য দু' একজন যাহারা সেখানে ছিল তাহাদেরও চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া গেলেন!

শ্রান্তিতে অবসাদে সত্যই নরেশের দেহ মন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। পাশে যে প্রাণীটি নূতন চেলীতে সর্ব্বাঙ্গ মুড়িয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিল, তাহার দিকে একবারটী না চাহিয়াই, সে শুভ্রশয্যার উপর শুইয়া পড়িয়া দুই চোখ বুজিল।

নরেশ ভাবিল, এমন হেঁয়ালি কয়জনের অদৃষ্টে জুটে? সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়াই তাহার কাছে একটা কল্পিত উপন্যাসের পরিচ্ছেদের মতই মনে হইল, কিন্তু সেটা এমনি অদ্ভুত ও বিস্ময়কর যে কেহ বিশ্বাসও করিবে না।

এইমাত্র কাকীমা যে তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া গিয়াছেন, ইহা কি সত্য, না, সে স্বপ্ন দেখিল?

এই বিবাহ সভা, এই উৎসবায়োজন, এই আলোক-দীপ্তি মন্ত্রোচ্চারণ, হোমধূম, এই লোকজনের কোলাহল, আনাগোনা, সর্ব্বোপরি পার্শ্ববর্ত্তিনী ঐ সর্ব্বভূষণালঙ্কৃতা অবগুণ্ঠনময়ী নারী,—এ কি সকলই মিথ্যা স্বপ্ন;—মায়াজাল?

কিন্তু হাতের মধ্যে সেই বেপথুমতীর পাণিপদ্মের উষ্ণ স্পর্শটুকু যে এখনও লাগিয়া রহিয়াছে,—ইহাও কি মিথ্যা?

এখনও যে ঘরের মধ্যে সেই প্রাণীটি অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিয়াছে, তাহাকেও কি মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবে ?

একবার ইচ্ছা হইল, চাহিয়া দেখে, সেও ভোজবাজির ছায়ার মত সত্যই মিলাইয়া গিয়াছে কিনা ;—কিন্তু সে তাহার আকাশ-পাতাল ভাবনা নিয়া চোখ্ বুজিয়া পড়িয়াই রহিল,—একবার চাহিয়াও দেখিল না।

ইতোমধ্যে নববধূ উঠিয়া গিয়া সন্তর্পণে দুয়ার বন্ধ করিল, এবং ফিরিয়া আসিয়া নরেশের পায়ের কাছে একটুকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তারপর মাথার অনভ্যস্ত অবগুণ্ঠনটা সরাইয়া দিয়া নরেশের পায়ের উপর হাত রাখিয়া মৃদুস্বরে "নরেশদা" বলিয়াই অত্যন্ত লজ্জা পাইল। মাথার কাপড়টা আবার টানিয়া দিয়া, ঠোঁট চাপিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

বিদ্যুতের স্পর্শ মানুষকে কত বড় ঝাকানি দিতে পারে নরেশের তাহা জানা ছিল না, কিন্তু এই "নরেশদা" কথাটা একটা প্রবল ধাক্কা মারিয়া তাহাকে একেবারে সোজা বিছানার উপর বসাইয়া দিল।

উন্মুখদৃষ্টিতে ঘরটার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল ; কক্ষের কোথায়ও কেহ নাই, শুধু পায়ের কাছে নববধূ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

তাহার চিবুক ও নিম্নোষ্ঠের খানিকটা চোখে পড়িতেই নরেশ উন্মাদের মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়া চেঁচাইয়া কহিল, "এর আগা-গোড়াই যদি স্বপ্ন হয়, তবুও এ মুখ আর কারু হ'তে পারে না,"—

বলিয়াই নববধূর মাথার কাপড় ফেলিয়া দিয়া তাহাকে বুকের উপর টানিয়া আনিয়া চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া দিল।

কল্যাণী কোনও মতে মুখ সরাইয়া লইয়া হাসিয়া কহিল, "তবু তো বিয়ের মন্ত্রগুলি একটাও মুখে আন্‌লে না, কি হয়েছিল তোমার ?"

"জানি নে! কিন্তু তুমি যে স্বপ্ন নও, শুধু এইটুকু নিজের মুখে বলে আমায় নিঃসশয় কর।"

কল্যাণী কোনও কথা না বলিয়া তাহার মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া নরেশের মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল!

দুই দিন পরে এবাড়ীর বিস্তৃত প্রাঙ্গণের বিচিত্র আলিপনার উপর নরেশের চতুর্দ্দোল আসিয়া নামিল!

বধূ বরণ করিতে আসিয়া সুস্নাতা নববধূর মুখের কাপড় তুলিয়া ধরিয়া হাসি চাপিয়া কহিল, "ওমা, এ কা'কে নিয়ে এলে ঠাকুরপো! এ যে কল্যাণী ঠাকুরঝি!"

নরেশ হাসিয়া কহিল, "এ ষড়যন্ত্রের মধ্যে তুমি তো ছিলে না, বৌদি', অন্ততঃ যাত্রা কর্‌বার দিন তো আমি তাইই জান্‌তুম্।"

সুস্নাতা গম্ভীর মুখে কহিল, "না বাবু, ছোট বোন্ বিয়ে করে নিয়ে আস্‌বার ষড়যন্ত্রের মধ্যে আমি নেই!"

বলিয়াই একটা রেকাবী হইতে একটু চিনি তুলিয়া কল্যাণীর কানে ছোঁয়াইয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, "ওলো ঠাকুরঝি, আমার কথা এই চিনির মত মিষ্টি শুনিস্ লা,—ক্ষুদে ননদগিরি করিস্ নে যেন! ঝগড়া ঝাঁটী কর্ত্তে হয় তো তোর দাদার সঙ্গেই করিস্, বুঝ্‌লি?"

বলিয়া চক্ষু টিপিয়া, একটু হাসিয়া বরণ কুলাটা তুলিয়া একবার নরেশের ও আর একবার কল্যাণীর কপালে জোরে জোরেই ঠেকাইয়া দিল!

নরেশ হাসিয়া "উঃ" করিয়া কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "এই বুঝি নিজের মূর্ত্তি ধর্‌লে বৌদি',—কিন্তু আমার কথার তো উত্তর দিলে না, এসব কি করে কি হ'ল?"

"ঘরে চল, নিরিবিলি সব জান্‌বে। এইটুকু জেনে রাখ, অন্ত

মেয়ের উপর যার প্রাণ পড়ে রয়েছে, জেনে শুনে তার হাতে নিজের মেয়েটীকে কোনো মা বাপই তুলে দেয় না। ঠাকুর তো দেহাতে যান্ নি, গিয়েছিলেন তাদের বুঝিয়ে মুক্তি পেতে! তারপর বাকীটা গিন্নীর কাছেই জেনো গো!"

"কিন্তু তুমি কখন জান্‌লে, বৌদি?"—

"আজই জেনেছি! কিন্তু ঠাকুর যেদিন দেহাতে চলে গেলেন, সেদিন আমার মন বলেছিল, এ আর কিছু নয়, তোমার জন্যই ঐ শরীর নিয়েও বাড়ী হ'তে নিজেই বেরুলেন!"

নরেশের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেই সে মুখ ফিরাইয়া লইয়া কহিল, "তা' হলে তুমি বাবাকে সব বলেছিলে বৌদি?"—

"না বলে আর কি করি বল! দেওর ননদের জন্য মানুষ কতই তো করে, এ আর বেশী কি? কি বলিস্ ভাই, ঠাকুরঝি?"—বলিয়াই হাসিয়া ফেলিল।

"আচ্ছা থাক,—এর মজা তুমি টের পাবে!"

"এর আর টের পাওয়া কি, দলে যখন ভারি হয়ে পড়েছ, তখন আমাকে যে হার্‌তে হবে এতো জানা কথাই"—বলিয়া সুস্নাতা মুখ ফিরাতেই দেখিল, হাসিমুখে গৌরীশঙ্কর এদিকেই আসিতেছেন।

নরেশ, কল্যাণী, সুস্নাতা, তিনজনেই তাঁহাকে একযোগে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই তিনি নিঃশব্দে জলভরা চোখে মুহূর্ত্তকাল উপরের দিকে চাহিয়া, ইহাদের কোলের মধ্যে টানিয়া লইলেন এবং কম্পিত হাতখানি তিনজনেরই মাথার উপর বুলাইয়া বুলাইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

নরেশ মনে করিল, তাহার জীবন সার্থক হইয়াছে, চরম কৃতার্থতা লাভ করিয়া সে ধন্য হইয়াছে!

পবিত্র-সলিলা জাহ্নবী-তটে সংসারতাপদগ্ধের আশ্রয়, শোকার্ত্তের সান্ত্বনা, মুক্তিকামীর কামনার ধন, পুণ্য বারাণসী ধাম !

এই সেই পবিত্র কাশীধাম যেখানে বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা নিত্য বিরাজ করেন ! যেখানে স্বয়ং কাশীনাথ মরণাহতের কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম শুনাইয়া থাকেন !

এই সেই ভূস্বর্গ বারাণসী, যেখানে শত শত সন্ন্যাসী যতি, তাপস তাপসী, পূজারী পূজারিণী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, মুক্তি কামনায় বিশ্বনাথের আরাধনায় নিযুক্ত রহিয়াছেন ; নিত্য বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন।

এই সেই অন্নপূর্ণার চিরানন্দ ধাম, যাহার প্রতি অণুকণা ব্যাস বশিষ্ঠ নারদ বিশ্বামিত্রের স্মৃতিপূত ; যাহার আকাশ বাতাস হরিশ্চন্দ্র শৈব্যার কাহিনী-মুখরিত ; যাহার জাহ্নবী-সলিল-বিধৌত শিলা-সোপান যুগ যুগান্তরের লক্ষ কোটী মুক্তিস্নানার্থী নরনারীর পদরেণু-পবিত্র ! যাহার সহস্র মন্দির দেউল, বৃক্ষতল পথিপার্শ্ব দেবতার মূর্ত্তিতে মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ ! যাহার আকাশ হোম ধূমাচ্ছন্ন, বাতাস আরতির শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনি মুখরিত ; পুষ্পচন্দন বিল্বদলের গন্ধে আচ্ছন্ন ; নিত্য বেদ মন্ত্র পাঠে, রামায়ণ গানে যেখানে বিপুল অতীতের সঙ্গে যোগ আজও নিরবচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে !

এই সেই বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার লীলা নিকেতন চির পবিত্র বারাণসী-ধাম !

বাঙ্গালী-টোলায় রাণামহলের বাড়ীগুলি গঙ্গার উপরেই অবস্থিত। চৌষট্টি যোগিনী ঘাটের ঠিক্ উপরেই ত্রিতলে একটা প্রকাণ্ড হলঘর

এবং পাশাপাশি দুইটা ছোটঘর ; সুপ্রশস্ত বারান্দাটা গঙ্গার উপরেই মেলিয়া রহিয়াছে।

• এই বারান্দার রেলিংএর উপর ভর রাখিয়া শৈলেশ গঙ্গার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

হলঘরের মধ্যে একখানি শুভ্রশয্যার কিয়দংশ আধখোলা দুয়ারের পথে দেখা যাইতেছিল। এই শয্যারই পরে মলিনা একখানি আসমানী রংএর শালে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া ওপারের বিরল বিন্যস্ত গাছগুলির দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। তাহার রুক্ষ চুলের রাশি শিয়রের বালিশের উপর ছড়াইয়া রহিয়াছে ; মুখখানি, রৌদ্রতাপে অর্দ্ধ শুষ্ক যুঁই ফুলটির মতই, ম্লান হইয়া উঠিয়াছে! দুই চোখের কোণে কালিমা গাঢ় হইয়াছে। ক্ষুদ্রললাট একখানি দর্পণের মতই স্বচ্ছ পরম সুন্দর দেখা যাইতেছিল!

এক দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া দুই চোখ ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল ; মলিনা চক্ষু মুদ্রিত করিল।

ঝি কাছে বসিয়াছিল, উদ্বিগ্নমুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কষ্ট হচ্ছে ?"—

মলিনা কোনও কথা বলিল না ; মুখে একটু ম্লান হাসির রেখা দেখা গেল।

ঝি উত্তর না পাইয়া নিজের মনেই বকিতে লাগিল, "দেশের মাটী দেখ্‌বে বলে রেঙ্গুন থেকে ছুটে চলে এলে, কই, একবারটীও তো চেয়ে দেখ্‌লে না! কি জ্বরেই ধরেছে মাগো, অষ্ট পহর লেগেই আছে, মুখের হাসিও গেল, মনের সুখ তো কবেই গেছে! কি অদেষ্টই করে এসেচিনু গা, মরণ আমায় ভুলে রইল! এ পুণ্যিস্থান, বিশ্বনাথের রাজ্যি, হেথায় তো এ পাপিষ্ঠির পরে কাল ভৈরবের দয়া হবেই না! কোন্ পথ দিয়ে যাব, আমি কেমন করে যাব ?"

বলিয়া হাতের পিঠ্ দিয়া কপালে তুই তিনটা ঘা মরিয়া পুনরায় মলিনার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, "একটু হাওয়া কর্‌ব ?"—

অল্প মাথা নাড়াইয়া মলিনা জানাইল, 'না'।

"কিছুরই তোমার দরকার নেই গা" বলিয়া একটু তুঃখিত হইয়া উঠিয়া গেল।

ঘরের এটা ওটা গুছাইয়া তু' মিনিট পরেই আবার ফিরিয়া আসিয়া বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া কহিল, "চুলগুলো একটু জড়িয়ে দেব, পাশ ফিরে শোবে দিদিমণি ?"—

মলিনা চোখ খুলিয়া কহিল, "থাক্ না, বেশ্ আছি !"—

এমন সময়ে শৈলেশ বারান্দা হইতে ডাকিল, "ঝি !"—

ঝি উঠিয়া যাইতেই জানাইল যে সে মলিনার সঙ্গে দেখা করিতে চাহে।

খবর না দিয়া শৈলেশ কোনও দিনই মলিনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিত না। কাশীতে আসিয়া এদিক্‌কার ছোট্ট ঘরটা নিজের জন্য রাখিয়া হল ঘরটা পীড়িতা মলিনার জন্য ঠিক্ করিয়া দিয়াছিল। আলো ও বাতাস প্রচুর পরিমাণে এই ঘরে পাওয়া যাইত, চিকিৎসকদের ব্যবস্থাও তাহাই ছিল।

এঘরটী সুসজ্জিত করিবার কোনও ত্রুটীই শৈলেশ রাখে নাই ! মলিনার জীবনের উপর দিয়া যে এত বড় তুর্ভোগগুলি যাইতেছে ইহার একমাত্র কারণই যে সে এ বিষয়ে শৈলেশের কোনও সন্দেহই ছিল না। ছোট খাটো ব্যাপারগুলিতেও এই তুর্ভোগগুলি আরও না বাড়ে এজন্য সে বরাবরই অত্যন্ত সজাগ ও সতর্ক ছিল।

মলিনা খোলা তুয়ারের পথে বাহিরের দিকে চাহিতেই শৈলেশের দৃষ্টি তাহার মুখের উপর পড়িল। চোখের ইশারায় মলিনা শৈলেশকে জানাইল, যে ঘরে আসিবার কোনও বাধা নাই।

শৈলেশ ঘরে ঢুকিয়াই বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, "মলিন্।"

• মলিনা কোনও কথা বলিল না ; দুই চক্ষু বুজিয়া বিছানার উপর পড়িয়া রহিল।

তাহার রক্তহীন মুখখানির উপর শোণিত সঞ্চারের একটা ক্ষণিক উচ্ছ্বাস দেখা গেল মাত্র। ঠোঁটখানি একটু একটু স্ফুরিত হইতেছিল ; যেন বুকের ভিতরকার রুদ্ধ অভিমান, আগ্নেয়গিরির চূড়ার কাছটার দুর্লক্ষ্য অল্প ধূমোদ্গারের মতই এই অধর স্ফুরণের মধ্যে সাড়া দিয়া যাইতেছিল।

প্রায় পনের মিনিট পর্য্যন্ত পাশের একটা চেয়ারের উপর বসিয়া শৈলেশ নিঃশব্দে মলিনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

চাহিয়া চাহিয়া কত কথাই মনে হইতে লাগিল, এই শৈশবে মাতৃহীনা, ধনীর একমাত্র দুলালী, পিতার বুকে কি আদরেই লালিতা হইতেছিল ; দুঃখ কি কোনো দিন জানে নাই ; অভাবের তাড়না ইহাকে কখনও স্পর্শ করে নাই ! পাতার আড়ালে পরিপুষ্ট ক্ষুদ্র কুন্দকোরকটীর মতই এই আদরিণী পিতার বুকের কাছে বাড়িয়া উঠিয়াছে !

অসুন্দর ইহার চোখে কিছুই ছিল না ; বাহিরে দিনরাত সমভাবে বিশ্বের যে নিষ্ঠুর গর্জ্জন চলিতেছে, ইহার কানে তাহা কোনও দিনই পৌঁছায় নাই ! এ যখন নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে, পত্রান্তরালের কুন্দকোরকটীর মতই ইহার সকৌতুক দৃষ্টি বাহিরের দুনিয়ার উপর ফেলিতেছিল এবং যখন বিশ্ব সংসার ইহার চোখে রঙ্গিন হইয়া উঠিতেছিল, ঠিক্ তখনই কোথা হতে সে ঝঞ্ঝার বেগে নিষ্ঠুর মমতাহীনের মতই আসিয়া পড়িয়া ইহাকে ছিন্ন ভিন্ন, বিদলিত করিয়া দিল ?

মলিনার অদৃষ্টাকাশে উন্মাদগতি ধূমকেতুর মতই কোথা হতে সে

আসিয়া জুটিয়া, তাহার সমস্ত জীবনটা এমন করিয়া ব্যর্থ করিয়া দিল?—

কে সে? কি তাহার অধিকার?

এই কুসুমপেলবা নারীর বুকের অন্তহীন বিচিত্রতার মাঝখানে সে কেনই বা ছায়া ফেলিয়া দাঁড়াইল, আর কেনই বা তাহাকে দিনের পর দিন তিল তিল করিয়া অমোঘ মৃত্যুর দিকে টানিয়া লইয়া চলিল?

এ যেন একটা প্রকাণ্ড বিয়োগান্ত নাটক শেষ অঙ্কে পৌঁছিয়া গিয়াছে!

জীবনের প্রত্যেকটা ঘটনা আজ সে মনের মধ্যে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল; কি মর্ম্মান্তিক বেদনাই সে চারিদিক্‌কার আপনার জনদের দিয়া আসিয়াছে!

এই পুঞ্জীভূত বেদনার নিঃশ্বাসের প্রায়শ্চিত্ত কি এই নারীই তাহার জন্য করিবে—যাহার সঙ্গে জীবনে কোনও যোগই তাহার ছিল না!

কেন? কাহার এই নিষ্ঠুর বিধান?—যে বিধান বলিয়া দেয় অন্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দোষ যে সেই করিবে?

বিশ্ব মানবের পাপের বোঝা মাথায় লইয়া যিনি হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, তিনি কি এইটুকু জানিতেন না, যে, তাঁহারও মৃত্যু আলিঙ্গনে পাপীর বোঝা বাড়িয়াছেই মাত্র।

হঠাৎ চোখ খুলিতেই শৈলেশের চোখে জল দেখিয়া উদ্বিগ্নমুখে মলিনা কহিল, "ওকি চোখে জল—মুছে ফেল, ছিঃ!"

শৈলেশ জামার আস্তিনে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ফেলিয়া হাসিয়া কহিল, "জানতে পাইনি মলিন্! পাষাণ নিংড়িয়েও নাকি মাঝে মাঝে জল পাওয়া যায়, কিন্তু এই দু'চোখের জল সত্যিই বিস্ময়ের কথা।"

বলিতেই তাহার মুখের হাসি নিভিয়া গেল।

কহিল, "ঠিক্ এখুনি, কতদিক দিয়েই যে অপরাধ করেছি, মনে মনে তার একটা হিসাব নিচ্ছিলাম। তুমি শুন্‌লে অবাক্ হয়ে যাবে মলিন্, এ বোঝা টান্‌বার মত শক্তি আর আমার নাই। এই ছন্নছাড়া জীবনটার সব কথাই তোমাকে জানিয়েছি, আশে পাশে যারা আমার আপনার বল্‌তে ছিল, তাদের সবাইকেই নির্ম্মমের মত আঘাত করেছি; সে সবই আমার জমানো ছিল, যে দিন হ'ক্, একদিন তার হিসাব নিকাশ হ'ত! কিন্তু একি করলুম্ মলিন? মাঝ থেকে তোমার জীবনের উপর দুষ্ট ধূমকেতুর মতই এসে পড়ে দাবদাহ জ্বেলেছিলুম্! শুধু তাহাই নয়, তোমাকে যে একেবারেই শেষ করে নিয়ে এসেছি!

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ মলিনার কপালের উপর হাতখানা রাখিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার রাতদিনের সেবা দিয়ে যেদিন তুমি আমায় বাঁচিয়ে তুলেছিলে, সেদিন কি তুমি জান্‌তে না, মলিনা, মৃত্যু আমার কাছে কতবড় কাম্য ছিল? সেদিন কাশীর মাটীতে পা' দিয়েই, তুমি আমাকে জানিয়ে দিলে "এবার তোমার ছুটি,"—কিন্তু নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর, তুমি কি বোঝনি, তুমি ছুটি দিলেই আর আমি ছুটি পেতে পারিনে? অপরাধের বোঝা আমার যথেষ্ট ভারি হয়েছে; তুমি সেরে ওঠ,—তুমি বেঁচে ওঠ, মলিন্, তারপর আমাকে ছুটি দিতে হয় দিয়ো"—

মলিনা কোনও কথা না বলিয়া গঙ্গার দিকে চাহিয়া রহিল। সেখানে একখানি ছোট ডিঙ্গির উপর একটী তরুণীর ঠিক্ পাশেই একটী যুবক হাসিমুখে বসিয়াছিল। মলিনা তরুণীর মুখখানির দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল! নিটোল কপোলের উপর অস্তগামী সূর্য্যের কিরণ লেখা আসিয়া লাগিয়া এই মেয়েটীর সুগৌর মুখখানির শ্রী অপূর্ব্ব করিয়া তুলিয়াছিল।

এই দুইটীকে দেখিয়া দেখিয়া কত কথাই মলিনার মনে হইতে লাগিল!

এ একটা অতৃপ্ত জীবনের প্রকাণ্ড বোঝা যখনই তাহার কাছে নিতান্ত দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক্ তখনই এমনই একটা কিছু চোখে পড়িয়া তাহার বেদনাকে আরও নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে!

সাধ আশা কিছুই কি মিটিল?

এই মুকুল জীবনের সম্মুখে, অশেষ সম্পদে পরিপূর্ণ বিচিত্র বিশ্ব, তাহার যত কিছু আনন্দ, সুখ কেবল এই মাত্র তাহার সম্মুখে মেলিয়া ধরিয়াছে; তাহারি জন্য বাতাসে মধু গন্ধ জাগিয়াছে; আকাশে সৌন্দর্য্যের বিপুল ছন্দ তাহারই দিকে চাহিয়া ফুটিয়াছে; সুধার ভাণ্ডার উজাড় করিয়া পরিপূর্ণ পানপাত্র, তাহার স্ফুরিতাধরের কাছে এইমাত্র অগ্রসর করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু কোথা ছিল করালীর অট্টহাসি লইয়া সেই দুর্দ্দিনের মেঘ,—যাহা মুহূর্ত্তের ফুৎকারে প্রলয়ের ঝঞ্ঝা জাগাইয়া তুলিল; সুন্দরের লাস্যনর্ত্তনের মাঝখানে তাণ্ডবনৃত্য সূচিত করিয়া দিল!

কোথায় গেল, বিশ্বের মুখের উপরকার অফুরন্ত সৌন্দর্য্য; কোথায় গেল সে মধুগন্ধ, আনন্দের অপূর্ব্ব ছন্দ?

ওরে, কোথায় গেল, সেই অস্পৃষ্ট, অনাস্বাদিত পানপাত্র?—কোথায় গেল!

ডিঙ্গিখানি দৃষ্টির বাহিরে চলিয়া যাইতেই একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়াই মলিনা কহিল, "রেঙ্গুণ থেকে চলে এলাম দেশের মাটীর মুখ দেখ্‌ব বলে, কিন্তু কাশীর এই গঙ্গা আমায় জড়িয়ে ধরেছে, এর চেয়ে কিছুই আজ আর আমার কাছে বড় নয়! একে ছেড়ে আমার যাওয়া হবে না! তবু একটা সাধ আছে, তা' তোমায় আজ বল্‌ব। জীবনে কারু কাছে

কোনোদিন কিছু চাইনি, আজ তোমার কাছেই আমার সকল চাওয়ার নিঃশেষ করে দেব,—বল, এ চাওয়া আমার ব্যর্থ হবে না?”—

জীবনে অনেক ভুল শৈলেশ করিয়াছে; কিন্তু এবার সে আর ভুল করিল না। সে নিঃসন্দেহ বুঝিল, মলিনার চাওয়ার শেষ কোথায়! এই একটী আকাঙ্ক্ষাকেই অবলম্বন করিয়া রেঙ্গুণ হইতে মলিনা ছুটিয়া দেশের মাটীর বুকে নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দিতে আসিয়াছে!

আজ সেই মুহূর্ত্ত আসিয়াছে, যখন মলিনা তাহার অতৃপ্ত জীবনের চরম কথাটী বলিয়া ফেলিয়া একেবারেই নীরব হইতে চাহে!

শৈলেশের সর্ব্বাঙ্গের শোণিত প্রবাহ চঞ্চল হইয়া উঠিয়া বুকের মাঝে ফিরিয়া আসিয়া সজোরে উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ করিতেছিল এবং সেই মুহূর্ত্তে তাহার মনের মধ্যে যে দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষাটা, গয়াসুরের মতই, মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিতে চাহিল, শৈলেশ নিজেই তাহার দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিল!

স্বেচ্ছায় দিনের পর দিন সে নিজেকে পরিপূর্ণ সুধাপাত্র হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, আজ হঠাৎ তাহার মনে হইল, ইহার কিছুরই প্রয়োজন ছিল না এবং ক্ষতির পরিমাণটা যে কত বড় বৃহৎ তাহাও আজ সবটা চোখে পড়িয়া গেল!

সে নিজকে তো বঞ্চিত করিয়াছেই, সঙ্গে সঙ্গে একটী অসহায়া নারীর বুকের অনন্ত প্রেমের উৎসকেও বিশুষ্ক করিয়া তুলিয়াছে!

এই মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইল, সূর্য্যতাপক্লিষ্ট স্বর্ণলতার মতই, ঐ রোগক্লিষ্ট দেহলতা, দুই বাহু দিয়া তুলিয়া লইয়া বুকের সঙ্গে চিরদিনের মতই জড়াইয়া রাখে! তাহার বিশীর্ণ পাণ্ডুর কপোল সোহাগের স্পর্শে স্পর্শে সঞ্জীবিত করিয়া তুলে!

মলিনা তাহার দুই চোখের ক্লান্তদৃষ্টি শৈলেশের মুখের উপরেই ফেলিয়া

রাখিয়াছিল। এই মানুষটীকে এই কটা দিনের মধ্যে সে যে কত দিক্ দিয়াই দেখিয়াছে তাহার অন্ত ছিল না। ইহার সংযম, ইহার বুকের অন্তহীন রুদ্ধ ব্যাকুলতা, সর্ব্বোপরি ইহার বিগত জীবনের রক্ত চর্চ্চিত কাহিনীটী, নানাদিক্ দিয়াই মলিনাকে স্পর্শ করিয়াছিল!

এবং ঠিক্ এই কারণেই, শৈলেশ তাহার হৃদয়ে প্রথমটাতেই যে অন্তহীন অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, সব জানিয়া শুনিয়াও, তাহা সঙ্কুচিত করিয়া দিতে পারিল না!

কিন্তু সুদূর বাঙ্গালার এক শান্ত বিচিত্রতা-বিহীন পল্লীতে যে নারী সাধ আশা বিসর্জ্জন দিয়া মুকুলিত যৌবনের সূচনাতেই উপেক্ষার ভার মাথায় লইয়া লুটাইতেছিল, তাহাকে মলিনা এক মুহূর্ত্তও ভুলিতে পারে নাই! সেই অনাদৃতার দুইটী কালো চোখের ধ্রুবদৃষ্টি দুস্তর সাগর প্রান্তর পারেও শৈলেশকে অনুসরণ করিয়া অনিমিখ্ হইয়া রহিয়াছে, ইহা মলিনা যেন চোখেই দেখিত!

সেই দুইটি চোখের অশ্রুর প্লাবন যে তাহারই নিজের বুকের মধ্যে বাসা বাঁধিয়া রহিয়াছে।

কে সে, অনাহূত, ইচ্ছায় হউক্, অনিচ্ছায় হউক্, ঊর্ণনাভের মতই জাল বিস্তার করিয়া করিয়া শৈলেশকে চারিদিক্ হইতে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছে?

ওরে, এমনি অদৃষ্টের উপহাস, এ জাল যিনি বুনিয়া দিয়া গেলেন, তিনিই দুনিয়ায় মলিনার সব চেয়ে আপনার জন ছিলেন!

কিন্তু এই যে হাহাকার, এই যে বুকের ভিতরকার নিঃশব্দ কাকুতি; এই যে দিনের পর দিন মৌন কাঙ্গাল চিত্তের না পাওয়ার চিরন্তন দুঃখ; এই যে নারী হৃদয়ের অনিবেদিত আশ্চর্য্য রহস্য, কোথায় ইহার শেষ? কেমন করিয়া সে ইহাদের অস্বীকার করিবে?

চোখের সম্মুখে এই যে সোণার দেউটী জ্বলিয়া একদিন তাহার জীবন পথের উপর স্নিগ্ধ আলোক ফেলিয়াছিল, আজ তাহার জ্যোতিঃর ম্লানিমায় আঁধার জাগিয়াছে, কোথায় পথ, সে কেমন করিয়া খুঁজিয়া লইবে ?

ওরে আশাহতের আশা, ওরে দুঃখীজনের শরণ ঠাঁই, ওগো সর্ব্ব-তাপহরণ, তুমি তোমার বর্ত্তিকাটী জ্বালাইয়া এই পথের উপরেই আগাইয়া ধর ! মলিনা তাহার পথ দেখিয়া লইবে !

মলিনা তাহার দুই চোখ মুদ্রিত করিল ; সম্মুখে পশ্চাতে বিপুল অন্ধকার ঘিরিয়া আসিয়াছে ; সেই অন্ধকারের মধ্যে সে একা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে !

কিন্তু দূরে, অতি দূরে ও কে ও ? ও কাহার ক্লান্তিহীন স্নিগ্ধদৃষ্টি, দেবতার ধ্রুবদৃষ্টির মতই তাহার মুখের উপর স্থির হইয়া রহিয়াছে ?

একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া চোখ্ খুলিতেই মলিনা দেখিল, শৈলেশ নিঃশব্দে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ! তাহার বুকের অনন্ত প্রেম দুই চোখের দৃষ্টিতে ক্ষরিত হইয়া, বিদলিত পুষ্প-মালিকার উপর প্রভাতের স্নিগ্ধ অরুণালোকপাতের মতই, তাহাকে প্লাবিত করিয়া দিতেছে !

মলিনা একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার চক্ষু বুজিল !

খোলা দুয়ারের পথে গঙ্গার জল ছুঁইয়া শীতল বায়ু প্রবাহ ছুটিয়া এই ঘরটার মধ্যে আসিতেছিল, এবং মলিনার চুলের রাশি লইয়া খেলা করিতেছিল। গঙ্গার তীরে ঘাট্‌লার উপরে যাহারা সান্ধ্যবায়ু সেবনের জন্য আসিয়াছে, তাহাদের আনন্দগুঞ্জন এ ঘরের মধ্যেও শুনা যাইতেছিল।

মলিনা হঠাৎ দুই হাতে খাটের বাজু চাপিয়া ধরিয়া উঠিয়া বসিয়া

কহিল, "তুমি যাহাকে সব চেয়ে বেশী আঘাত দিয়ে এসেছ, তাকেই আমি একবারটী চাই ; তার কোলেই মাথা রেখে শেষ কটা দিনের সাধ মিটিয়ে নেব, এইই তোমার কাছে আমার প্রথম এবং শেষ চাওয়া !"

বলিয়াই শুইয়া পড়িয়া গায়ের শালটা টানিয়া দিয়া বালিশের উপর মুখ গুঁজিয়া রহিল। অনেকক্ষণ এই ঘরটার মধ্যে কোনও শব্দ শুনা গেল না, শুধু মলিনার গুরু নিঃশ্বাসের শব্দ শৈলেশের কানে আসিতেছিল।

শৈলেশ ইহা পূর্ব্বেই অনুমান করিয়া রাখিয়াছিল এবং ইহা ছাড়া তাহার প্রায়শ্চিত্তের আর কোনও পথ ছিল না, তাহাও সে ঠিকই জানিয়া রাখিয়াছিল।

এতদিনকার দুর্ভোগের পর আজই প্রথম শৈলেশ তাহার চিত্তের সংযম হারাইয়া ফেলিল। সমস্ত বিচার বিতর্ক, দ্বিধা সংশয় এক মুহূর্ত্তে সবলে দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার ব্যবস্থাই আমার সকল অপরাধের চরম প্রায়শ্চিত্ত, তা' আমি জান্‌তুম ; এ আমাকে মাথা পেতে নিতেই হবে ! গর্ব্ব আমার চূর্ণ হয়ে গেছে মলিন্, সেই সঙ্গে এতদিন পরে আমার সমস্ত সংশয়েরও অবসান হয়ে গেছে ! তুমি আমারি বাক্‌দত্তা, এ তুমিও জান, আমিও জানি ! আজ আমার দাবী তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি !—ঐ গঙ্গা সাক্ষী রইলেন এবং যিনি তোমাকে আমার হাতে হাতে ধরে দিয়েছিলেন, তিনিও জান্‌চেন ! আমাদের কারু অস্বীকারের দ্বারাই এ কথাটাকেও মুছে দেওয়া আজ আর চল্‌বে না, মলিন ! তুমি আজ যাকে ডাক্‌চ, সে আসুক্, তার হাতেই এর চরম মীমাংসা হয়ে যাবে।"

বলিয়াই কম্পিতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দার উপর আসিয়া দাঁড়াইল।

তখন মন্দিরে মন্দিরে আরতির শঙ্খঘণ্টা বাজিয়া উঠিয়া আকাশ

বাতাস মুখরিত করিতেছিল এবং পূর্ব্বের আকাশে চক্রবাল রেখার কাছ হইতে সেইমাত্র পূর্ণিমার চাঁদ উদিত হইয়া গঙ্গার জলের উপর রশ্মিপাত করিতেছিল; খানিকটা জ্যোৎস্না হলঘরের বারান্দার উপরও আসিয়া পড়িয়া হাসিতেছিল!

মলিনা দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া, আহতা বিহগীর মতই, শয্যার উপর লুটাইতে লাগিল।

মনে মনে কহিল, "ওরে নিষ্ঠুর, তোমার দ্বিধা সংশয় মিট্‌ল, যখন আমি যাত্রা ক'রে বেরুবার জন্যে পা' বাড়িয়েছি!"

কল্যাণীর শুভবিবাহের সপ্তাহ পরেই বাদুড়বাগানের বাসায় ফিরিয়া আসিয়া অশ্রুময় কহিল, "মা, এইবার তো সবই একরকম মিটে গেল, চল, দেশের বাড়ীতে ফিরে যাই, সেখানে কলি' আছে, তাকে সব সময়ে দেখ্‌বার সুবিধাও হবে !"—

মানদাসুন্দরী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "না, অশ্রু, দেশের বাড়ী থেকে রোজ আফিসে যাওয়া আসা ভারি কষ্ট হবে ; তোর শরীরটা মোটেই ভাল যাচ্ছে না !"—

অশ্রুময়' একটু হাসিয়া কহিল, "জীবনে যেটা সব চেয়ে বড় কাম্য ছিল, তা' ভগবান এমন আশ্চর্য্যরূপেই পূর্ণ করে দিলেন, মা ! নরেশের বাবাকে আমি কূট বিষয়ী বলেই জেনে রেখেছিলাম, কিন্তু এত বড় স্নেহের উৎস যে বুকের মধ্যে এমন করে লুকিয়ে রেখেছিলেন; তা' মনে করিনি তো !"

বলিয়াই একটু মৃদু হাসিয়া কহিল, "আর মা, বুড়ার রঙ্গও তো কম নয় ; শেষ পর্য্যন্ত নরেশটাকে কিছুই কি জান্‌তে দিলেন ? আমাকে তো ভাঁড়ার ঘরেই আট্‌কে রেখে দিলেন। এ লিখ্‌লে একটা উপন্যাসের পরিচ্ছেদ হ'তে পার্‌ত," বলিয়াই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল !

মানদাসুন্দরীর মুখেও হাসি দেখা গেল, "কিন্তু বাহাদুর ছেলে তোর এই নরেশ। বাপের কথা রাখ্‌বার জন্য ও যে নিজেকে শেষ পর্য্যন্ত অমন করে দুঃখ দিল, কই, এখনকার ছেলেদের মধ্যে এমন তো দেখিনা।"—

অশ্রুময় কহিল "বাপের কথা শুনেছে এ আর বেশী কি মা, না শুন্‌লে ওকে আমি কল্যাণীর উপযুক্তই মনে কর্‌তাম না ; কিন্তু মা, পুরস্কারটা

যা' পেল, তা'তে ওর সব দুঃখই পুষিয়ে গেছে," বলিয়াই আবার হাসিতে লাগিল।

মানদাসুন্দরীর চোখে জল আসিতেছিল, অনেক কারণেই; তিনি অশ্রুর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "আহা, ওরা দুটী বেঁচে থাক্, চির জীবন সুখে কাটা'ক্।"

হঠাৎ ওবাড়ীটার দিকে চোখ পড়িতেই অশ্রুময় মুখ ফিরাইয়া লইল।

সদর দরজায় কুলুপ আঁটা ছিল; ঘরগুলির দরজা জানালা বন্ধ,—নির্জ্জন বাড়ীটা হা হা করিতেছিল।

অশ্রুময় কহিল, "কল্‌কাতায়ই যদি থাক্‌তে হয়, তা'হ'লে ছোট একটা বাড়ী দেখি। এত বড় বাড়ীতে প্রয়োজন কিছু নেই তো, মা।"

বলিয়াই হাতের কাছের একটা বইয়ের পাতা উল্‌টাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

কোথায় অশ্রুর ব্যথা মানদাসুন্দরী তাহা ভালরূপেই জানিতেন; সন্তর্পণে বুকের ভিতরকার নিঃশ্বাসটা বাহির করিয়া দিয়া কহিলেন, "যা' ভাল হয় কর্; কিন্তু আমি একটা কথা বলি, তোর শরীর ভাল নেই, অশ্রু, কিছুদিনের ছুটি নিয়ে চল্‌না, একবার বাইরে ঘুরে আসি।"

একটুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া পুনরায় কহিলেন, "আমারও তো দিন ফুরিয়ে এল, অশ্রু, একটু পশ্চিমে নিয়ে যাবি বলেছিলি, তা' তোর যদি অসুবিধা না হয়, এবারই চল্‌না কেন! জীবনে কিছুই তো কর্‌লাম না রে।" বলিয়া দুই চোখের জল গোপন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইলেন।

এই তীর্থে যাইবার কথা উঠিলে কোনও দিনই তিনি আগ্রহ দেখান নাই; বরাবরই বলিয়াছেন, "কি হবে তীর্থ দিয়ে, তুই আর কলি',

আমার সকল তীর্থের পুণ্যফল, তোদের মুখ দেখেই যেন এ বাড়ীতে শেষ নিঃশ্বাস ফেল্‌তে পাই !”

সেই মা কেন যে আজ তীর্থে যাইতে চাহিতেছেন, তাহা অশ্রুময়ের বুঝিতে বাকী রহিল না !

“আচ্ছা, তাই হবে মা ! কলি’কে নিয়ে নরেশ তো আজই আস্‌বে ; নরেশকে বল্‌ব সে যদি যেতে চায় তো সব এক সঙ্গেই বেরুব !”

বলিয়াই উঠিয়া গিয়া টেবিলের উপরকার খবরের কাগজটার পাতা উল্‌টাইয়া একটা ঔষধের বিজ্ঞাপনের দিকে অর্থশূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

এ একটা তীক্ষ্ণ বেদনা, কাঁটার মতই, সকলের বুকের মধ্যে খচ্‌ খচ্‌ করিয়া বিঁধিতেছিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিয়া কাহারও কিছু জানাইবারও উপায় ছিলনা !

সংসারে এমন এক একটা মানুষ দেখা যায়, যাহারা আমাদের এই পায়ের নীচেকার সর্ব্বংসহা মা বসুমতীর মতই মুখ বুজিয়া সকল দুঃখই সহ্য করিবার শক্তি রাখে। ইহাদের আশে পাশে যাহারা চিরদিন কাটাইয়া যায়, তাহারা পর্য্যন্ত জানিতে পায় না, ছোট ও বড় কত ব্যাপারে ইহারা চারিদিক্‌ দিয়া কত রকমেই নিজেদের বঞ্চিত করিয়াছে। কোনও দিন মুখ ফুটিয়া ইহারা কিছু বলে না।

ইহাদের ধৈর্য্যও যেমন অসীম, ত্যাগ করিবার ক্ষমতাও তেমনি অসাধারণ !

অশ্রুময় ঠিক্‌ এই প্রকৃতির লোকই ছিল, তাহার দুঃখ একেবারেই তাহার নিজস্ব ; ইহার পরিচয় চোখের জলেও সে দিতে রাজি ছিল না।

মানদাসুন্দরী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া অশ্রুর জন্য খাবার আনিতে উঠিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার গাড়ীতে নরেশ ও কল্যাণী আসিল, আহারাদির পর নীচের ঘরে নরেশ ও অশ্রু গল্প জুড়িয়া দিল। কল্যাণী মার কোলের মধ্যে শুইয়া পড়িয়া অশ্রুর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিল !

অনেক কথার পর কল্যাণী কহিল, "তোমার কথা দাদা ফেল্‌তে পার্‌বেনা, মা, তুমি মুখ ফুটে ওকে বল, তা' হ'লেই ওকে বিয়ে কর্‌তে হবে !—কাউকে না আন্‌লে এ ঘরে কেমন করে থাক্‌বে, মা ?"

মানদাসুন্দরী কাঁদিয়া কহিলেন, "কি আমি ওকে বল্‌ব ? ওর ব্যথা যে কত বড় গভীর, তা' শুধু আমিই জানি, কলি' ! ও কি সাধারণ ছেলেদের মত, যে হৈ চৈ হা হুতাশ কর্‌বে ? ওর এতটুকু বয়েস থেকেই দেখ্‌ছি, কোনো কিছুই ওকে সহজে টলা'তে পারেনা ; কিন্তু যা' ওর মনের উপর একবার দাগ কাটে, তা' ও কোনো দিনই ভোলে না ! একথা আমি জানি বলেই, আজন্মের সংস্কার ভুলে, সরযূকে ঘরে আন্‌তে চেয়েছিলাম ! কিন্তু উপরওয়ালার ব্যবস্থার উপর কারু হাত নেই তো কলি' !

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া গাঢ়স্বরে কহিলেন, "তোরা দুটীতে আমার দুই পাশে বেড়েছিস্‌, অকূল পাথারে পড়েছিলাম, কত দুঃখের দিন দুই হাতে ঠেলে, দিন গণেছি ; মনে মনে আকাঙ্ক্ষার অন্ত ছিলনা ! তোকে নরুর হাতে দেব, অশ্রুকে বিয়ে দিয়ে তোর মতই আর একটী ঘরে আন্‌ব। বিশ্বনাথের কাছে দিনরাত কত মাথা খুঁড়েছি, মা, আশার অর্দ্ধেক পূর্ণ হ'ল ! তোর মতই যেটিকে পেলাম, সহস্র বাধা বিপত্তি তুচ্ছ করেও তো তোকে আন্‌তে চেয়েছিলাম, কিন্তু তা' হ'লনা, কলি' !"

দুইহাতে মার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কল্যাণী কহিল, "মা চুপ কর", মানদাসুন্দরী আঁচলে চোখ মুছিয়া কহিলেন, "ওর দুঃখের

গভীরতা বাইরে দেখে কিছুই বোঝা যায়না ; কিন্তু আমি তো ওর মা, আমি তো জানি ; কেমন করে আজ ওকে এসব কথা পাষাণীর মত বল্‌ব ?”

গভীর দুঃখে মানদাসুন্দরী যখন চুপ করিলেন, তখনও নীচের ঘরে নরেশ ও অশ্রুময়ের তর্কের ঝড় সমানভাবে বহিতেছিল !

তিন দিন পরে সন্ধ্যার দিকে জিনিষপত্র বাঁধিয়া এই ক্ষুদ্র দলটি তীর্থ যাত্রার মনন করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

গাড়ীতে উঠিতে গিয়া অশ্রুময় কহিল, “নরু, তুই ভিতরে যা’, আমি কোচ্‌বাক্‌সে উঠলাম্‌।”

নরেশের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও অশ্রু কোচ্‌বাক্‌সে উঠিয়া বসিল। গাড়ী খোলা মাঠটার পাশ ঘুরিয়া সুকিয়া ষ্ট্রীটে পড়িবার জন্য একটা সরু গলির মুখে আসিয়া একটু থামিয়া গেল !

তখন অশ্রুময় একবার সতীশের বাড়ীটার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিল !

আলোকবিরল রাস্তার পাশে জনহীন বাড়ীটা অন্ধকার গাঢ় করিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ! পথের আলোটা জ্বলিয়া জ্বলিয়া লুব্ধ পতঙ্গের দলকে আকর্ষণ করিতেছিল !

দুই চোখ্‌, বোধ হয় এইই প্রথম, ভিজিয়া উঠিতেই, একটা নিঃশ্বাস সন্তর্পণে ফেলিয়া অশ্রুময় দুইহাতে পাশের হাতল্‌টা চাপিয়া ধরিল।

গাড়ী, সরু গলিটা পার হইয়া, বড় রাস্তার উপর পড়িয়াই, বিপুল বেগে হাওড়া ষ্টেশনের দিকে ছুটিয়া চলিল।

প্রশস্ত আলোকোজ্জ্বল রাজপথগুলির দুই পাশের অজস্র কৌতুক ও বিচিত্রতার মধ্যে আজি আর কোনো আনন্দই অশ্রুময়ের জন্য অবশিষ্ট ছিলনা !

সে পাষাণ মূর্ত্তির মতই, তাহার লক্ষ্যহীন, বিস্ফারিত দুই চোখের জ্বালাময় দৃষ্টি, সম্মুখের দিকে ফেলিয়া রাখিয়া, নিঃশব্দে বসিয়া রহিল !

ঝড়ের মাতামাতি শেষ হইয়া গেলে প্রকৃতি দিগ্‌বিদিকের ধ্বংস রাশির দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকে! কিছুরই যেন প্রয়োজন ছিলনা, নিষ্ঠুর আঘাতে সুন্দরের সৃষ্টি ছিন্নভিন্ন, বিদলিত করিয়া দেওয়াই ইহার একমাত্র কাজ; কোথায় কোন্ ক্ষুদ্র যুথিকাটি বৃন্তচ্যুত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে; কোথায় কোন্ অসহায়া বিহগী, নীল আকাশের আশ্রয় হারাইয়া পৃথিবীর বুকে মুখ গুঁজিয়া লুটাইয়াছে, এ সকলের সংবাদ রাখিবার কোনও প্রয়োজনই যেন আর নাই!

কিন্তু এই যে বেদনার অন্তহীন প্রসার, এই যে আহতের দুই চোখের অশ্রুজল, এই যে ব্যর্থতার নিদারুণ ইতিহাস, ইহার কি কোনও মূল্যই নাই?

সেদিন শৈলেশ কতকগুলি কাজ সারিয়া আসিবার জন্য বাহিরে গিয়াছিল, ফিরিতে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল।

মলিনা বিছানার উপর একলাটি পড়িয়া রহিয়াছে; ঝি ঘরের মধ্যে কাজে ব্যস্ত ছিল। মলিনার মৃদু আহ্বানে ছুটিয়া কাছে আসিয়া কহিল, "কি, দিদিমণি?"

মলিনা বলিল, "কিছু নয়, উঠে বস্‌ব, একটু ধরিস্ ঝি!"—

উদ্বিগ্নমুখে ঝি কহিল, "কাজ নেই, দিদিমণি, দাদাবাবু বাসায় নেই, দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্‌বে।"

মলিনা হাসিয়া কহিল, "বেশী আর কি হবে ঝি, যেটুকু নিঃশ্বাস আছে, এটুকু বন্ধ হ'য়ে যাবে, এই তো?—তুই ধর! মর্‌ব না, মেয়ে মানুষের প্রাণ অত সহজে বেরুবে না!"

ঝি বলিল, "ওমা, কি কথার ছিরি গো! ষাট্, ষাট্,—আমার মাথায় যত চুল, তত তোমার পের্মাই হোক্! এমন কথাও মুখে আনে! এই কাঁচা বয়স, কত সুখ আহ্লাদ কর্‌বে, ওমা, এমন সব ছাই ভস্মও বলে, কোথায় যাব আমি,—মরণও তো নেই আমার!"

"এই বুঝি সুরু হ'ল! পোড়াকপাল আর কি, এমন পাগল নিয়েও পড়া গেছে!" বলিয়াই মলিনা নিজেই জোর করিয়া উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে গেল।

এমন সময়ে উপরে উঠিবার সিঁড়ির দুয়ারে সজোরে কড়া নড়িয়া উঠিল।

মলিনা শুইয়া পড়িয়া গায়ের শালটা টানিয়া দিতে দিতে কহিল, "যা' ত ঝি, দরজা খুলে দিয়ে আয়।"

ঝি চলিয়া গেলে মলিনা চোখ্ বুজিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া ঝি বলিল, "কা'রা এলেন, কাউকে তো চিনিনে দিদিমণি!"

তড়িৎস্পৃষ্টের মতই মলিনার সর্ব্বাঙ্গ একবার কাঁপিয়া উঠিল। ক্লান্তদৃষ্টিতে একবার ঝির দিকে চাহিয়াই দুয়ারের দিকে মুখ ফিরাইল।

সেখানে যাহারা আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহাদের কাহারই মুখ মলিনার পরিচিত নহে। তবুও ইহাদের চিনিতে তাহার এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না।

মলিনার মনে হইল, ঠিক এই মুহূর্ত্তে সে জীবন মরণের সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার অদ্ভুত জীবনের সীমাহীন দুর্ভোগ, এই যে নূতন পথে আসিয়া দাঁড়াইল, পরাজয়েই কি ইহার শেষ, অথবা জয়যুক্ত হইয়াই সে শেষ নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিবে, কিছুই তাহার জানা ছিল না।

অথচ সে যে প্রতিমার প্রতিদ্বন্দিনী মোটেই নহে, এবং আজ সে যে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকেই বুঁকিয়া পড়িয়াছে, ইহা শুধু প্রতিমার উপর শৈলেশ যে অন্যায় করিয়া আসিয়াছে, তাহারই প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, এই কথাটা কেমন করিয়া সে প্রতিমাকে জানাইবে !

ইহা মুখ ফুটিয়া বলিবার ত নহেই, কিন্তু প্রতিমা যদি সাধারণ পাঁচজনের মতই ইহার বিশ্রী দিক্‌টাই দেখে, তাহা হইলেও তো তাহার পক্ষ হইতে বলিবার কিছুই থাকিবে না !

দুঃখের এই সংশয়ের মধ্যে মলিনার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল, মুখের উপরে ম্লানিমা কালো ছায়া ফেলিয়া তাহার গোপন বেদনার কাহিনীটিকে বাহিরেও ফুটাইয়া তুলিল !

প্রতিমাকে একটা টিপ্‌ দিয়া উৎপল কহিল, "দেখিস্‌,—পার্‌বি তো ?"

প্রতিমার চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, "ওর মুখ দেখে আমার বুকের ভিতর মুসড়ে যাচ্ছে, ঠাকুরঝি !—ওর দুঃখের পরিমাণ আমরা কেউই কর্ত্তে পারিনি, আহা, একলাটি পড়ে কত কষ্টেই ওর দিন কেটেছে।" বলিয়াই ঘরের মধ্যে স্থির পদে মলিনার শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল এবং নীচু হইয়া দুই হাতে মলিনার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া "আমি প্রতিমা,—তোর দিদি, বুঝ্‌লি মলিন্‌?—তুই এমন রোগাটী হ'য়ে গেছিস্‌ কেনরে ?"

বলিয়াই উৎপলকে ডাকিয়া কহিল, "ঠাকুরঝি ব্যথা বুঝ্‌বার কেউ কাছে না থাক্‌লে কি হয় দেখেছিস্‌।"

মলিনার কপালে ও চুলের রাশির মধ্যে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে প্রতিমা দেখিল, এ মুখের তুলনা নাই এবং একবার চোখে পড়িলে এই মুখের অধিকারিণীকে ভাল না বাসিয়া পারা যায় না !

মলিনা কোনও কথা বলিল না ; প্রতিমার কোলের উপর মাথাটা রাখিয়া পড়িয়া রহিল, তাহার দুই চোখের জল বিশীর্ণ কপোল বাহিয়া নামিতে লাগিল। কতকাল পরে স্নেহস্পর্শ পাইয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল।

উৎপল কাছে আসিয়া মলিনার মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; তাহার স্নেহস্রাবী দৃষ্টি এই রোগক্লিষ্টার মুখের উপরে আশীষ-ধারার মতই বর্ষিত হইতেছিল !

দুই দিন পরে ভোরের দিকে স্নানান্তে বিশ্বেশ্বর দর্শন করিবার জন্য বাসার সকলেই বাহির হইয়া গেল।

প্রতিমা মলিনার কাছে বসিয়া হাওয়া দিতেছিল, ঝিকে দরজা-জানালাগুলি খুলিয়া দিতে বলিল।

একবার ঘরটার চারিদিকে চাহিয়া মলিনা কহিল, "তুমি দর্শন কর্ত্তে গেলেনা দিদি ?—একদিনও তো যাওনি !"—

"আমি তো বিশ্বেশ্বর দর্শন কর্‌তে আসিনি, তোকেই দেখ্‌তে এসেছি, মলিন্ ! তুই ভাল হ'য়ে উঠ্‌লে একসঙ্গে যাব।"

মলিনা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে কহিল, "একটা কথা এ কয়দিন আমার মনে হচ্ছে, দিদি !—"

প্রতিমা মলিনার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, "কি রে ?"

"এমন তুমি, তবু সারাটা জীবন কেন এত দুঃখ পেলে, দিদি ?"

"দুঃখ তুইও তো কম কিছু পাস্‌নি ! তোর দুঃখের কাছে আমার দুঃখই যে আজ ম্লান হয়ে গেছে মলিন্ !" চুলগুলি গুছাইয়া দিতে দিতে কহিল, "মেয়েমানুষ হ'য়ে জন্মেছি, দুঃখের আঘাতে ভেঙ্গে পড়লে তো আমাদের চল্‌বেনা, অদৃষ্টে যা' আছে হবেই ;—এখন তুই সেরে উঠ্‌লেই আমি বাঁচি !"

কিছুকাল আর কোনও কথাই হইল না। উভয়ের বুকের মধ্যে যে ঝড় বহিতেছিল, তাহার সংবাদ কাহারই অপরিজ্ঞাত ছিল না।

হঠাৎ মলিনা বলিল "আমি কি বাঁচ্‌ব, দিদি?"—

প্রতিমা মলিনার মুখের উপর হাত চাপা দিয়া বলিয়া উঠিল, "ও কি কথা,—ছিঃ! মানুষের শরীরে অসুখ বিসুখ হয়ই, অসুখ হ'লেই কি মরে! শরীরের উপর এতদিন যত্ন নিস্‌নি, তাই কাহিল হয়েছিস্‌ বইত নয়, এখন সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌বি।"

বলিতে গিয়া প্রতিমার গলার স্বর বাষ্পরুদ্ধ হইয়া উঠিল।

মলিনা একটু হাসিয়া কহিল, "তোমার গলার স্বরের মধ্যে কান্না লুকুনো আছে, যেটা সত্যি কথা তা' তুমিও জান, আমিও জানি! কাল রাত্রে আমি মাকে স্বপ্নে দেখেছি; কত স্নেহে তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন, আমায় এতটুকু রেখে তিনি চলে গেছেন; কত কাল পরে তাঁকে দেখ্‌লাম। কখন বাবা যে পাশে এসে দাঁড়ালেন জান্‌তে পাইনি! তাঁর দৃষ্টিতে দিদি, সেই স্নেহ, যা' জীবনে ভুলব না! এই ঘরে তাঁরা কাল এসেছিলেন, কেন এসেছিলেন, দিদি?—"

প্রতিমা কাঁদিয়া কহিল, "ওরে, চুপ্‌ কর্‌ চুপ কর্‌, তোর মায়ামমতা কি একটুও নেই রে?"—

মলিনা একটু শিহরিয়া উঠিয়া কহিল, "বিশ্বনাথের কাছে মনে মনে প্রার্থনা করেছিলাম, যেন তোমার কোলে শেষ কটা দিন কাটিয়ে দিতে পারি। তিনি সে প্রার্থনা আমার কানে শুনেছেন, কিন্তু তিনি তো সবই জানেন, এটুকু কি জান্‌তেন না, দিদি, যে, তোমাকে একবার দেখ্‌লে আর আমার মর্‌বার সাধ থাক্‌বে না?"

"তুই যদি আর এসব কথা বলিস্‌, তা' হ'লে সত্যিই আমি মাথা

খুঁড়ে মর্‌ব মলিনা,”—বলিয়া প্রতিমা আঁচলে একবার চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া মলিনার সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল !

সতীশ মন্দির হইতে মেয়েদের সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল ; ঘরের মধ্যে মলিনার বিছানার কাছে দাঁড়াইয়া ক্ষমাসুন্দরী মলিনার মাথায় আশীষ্ নির্ম্মাল্য গুঁজিয়া দিতে দিতে কহিলেন, “এই চরণামৃত-টুকু মাঝে মাঝে ওর কপালে ছোঁয়া’স্। বাবার কাছে পূজা মানত করে এসেছি, মা লক্ষ্মী আমার ভাল হ’য়ে উঠ্‌লেই পূজো দেব।”

হাত বাড়াইয়া দিয়া মলিনা কহিল, “মার পায়ের ধূলা আমার মাথায় দিয়ে দাও, দিদি, উঠে নেব সে শক্তি তো আর নেই,” বলিতেই তাহার দুই চোখ্ জলে ভরিয়া উঠিল !

সিঁড়ির কাছে দ্বিতলে কয়েকটা খালি ঘর ছিল ; ঘরগুলি শৈলেশ ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিল। ইহারই এক প্রান্তের ঘরটায় সে আশ্রয় লইয়াছিল এবং অন্য ঘরগুলি সতীশ ও ক্ষমাসুন্দরীর ব্যবহারের জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। উপরের হল ঘরে মলিনার কাছে উৎপল ও প্রতিমা থাকিত।

মলিনার জীবনের প্রত্যেকটা খুটিনাটী এবং তাহার নিজের সঙ্গে কোথায় কতটুকু মলিনার যোগ ছিল, শৈলেশ সতীশের কাছে এতটুকুও গোপন না করিয়া লিখিয়া জানাইয়াছিল।

শৈলেশ লিখিয়াছিল “ফাঁকি নিজেকে অনেক দিয়াছি, ভুলও জীবনে যথেষ্টই করেছি। কিন্তু এই একটা যায়গায় ঠেকে গেছি ! এ একটী আশ্চর্য্য প্রকৃতির মেয়ে, যার কাছে কোনো স্বার্থত্যাগই যথেষ্ট নয় ; একে এতদিন দেখে দেখে আমার মনে হয়েছে, এই একজনই নয়, ও জাতটার ভিতরে এই প্রকৃতির মেয়ে অনেকই আছে ! আজ সত্য কথাই বল্‌ব, মেয়ে মানুষদের উপরে শ্রদ্ধা আমার কোনো কালেই

ছিল না, কিন্তু একে দেখে সে ভুল আমার ভেঙ্গে গেছে। মলিনার বাবা যে মর্‌বার সময় হাতে ধরে মনিলাকে আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন, এটা ওর স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এতদিন ধরে এই কথাটা বোঝাতে গিয়ে ওকে শুধু মৃত্যুর দিকেই টেনে নিয়ে এসেছি, এখন আর ফিরবার পথ নেই!

আমি বিশ্বাসঘাতক নই, এ আর কেহ না জানুক, তুমি তো জান, তাই আজ বিচারের ভার তোমাদের উপর ফেলে দিলুম! তোমরা এস, ওকে বাঁচাতে কেহই পার্‌বে মনে হয়না, তবে শেষ ক'টা দিন ওকে একটু আরাম দেওয়ার ভার তার উপরই রইল, যাকে দুই পায়ে দ'লে একদিন চলে এসেছি! কারণ আমরা সবাই মিলে প্রতিমার উপর যে গুরু অত্যাচার করেছি, তার প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বার ভারটা নাকি বিধাতাপুরুষ একমাত্র মলিনার উপরই দিয়ে রেখেছেন, এইই ওর বিশ্বাস।"

শৈলেশের সঙ্গে প্রতিমার এ কয়দিনের মধ্যে একবারও দেখা হয় নাই। ইহাঁরা আসিবার পর হইতে এ পর্য্যন্ত সে একবারও উপরের ঘরে আইসে নাই!

প্রতিমা বুঝিয়াছিল, এই চোখে চোখে হওয়ার লজ্জাটা ভাঙ্গিবার ভারও তাহার উপরেই বিধাতাপুরুষটী দিয়া রাখিলেন!

কিন্তু দুর্ভোগ তাহার একটাই নহে! এই যে চোখের সম্মুখে মেয়েটা মরিতে বসিয়াছে, ইহার অপরাধ কিছুই ছিল না; অথচ যে মানুষটী এসব ঘটাইয়া বসিয়াছে, তাহার সঙ্গেই বোঝাপড়া করিয়া প্রতিমাকে বাকী জীবনটা কাটাইতে হইবে!

ইহার দুঃখ এবং গ্লানি কোনওটাই তো কম নহে।

মানুষকে হত্যা করার অপরাধ যে কত বড় গুরুতর, সে বিষয়ে

প্রতিমার কোনও পরিষ্কার ধারণা কোনও দিনই ছিল না। এখন মলিনাকে চোখের উপরেই তিল তিল করিয়া মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া কেবলি এই একটা কথা মনে করিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল, যে, ইহার সমস্তটা অপরাধের জবাবদিহি আর কাহারই কাছে না হউক্, নিজের মনের কাছে তো নিশ্চয়ই আছে!

কিন্তু আজ আর তাহার কোনও দিকেই চাহিবার সময় নাই; নিজের সুখ দুঃখের হিসাব সে কোনও দিনই রাখে নাই; এতটুকু অনুগ্রহ পাইবার জন্য কাঙ্গালপণা সে কোনো দিনই দেখায় নাই! তাহার এইটুকু বয়সের মধ্যে আশে পাশে সুখ ও দুঃখের কত ভাঙ্গা গড়াই সে দেখিল; নিজের অদ্ভুত জীবনটাই একটা বিড়ম্বনার ইতিহাস; কত বিস্ময়ের ভিতর দিয়াই ইহার বহু বিচিত্রতা ফুটিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু তাহাতেও দুর্ভোগের চরম সীমায় পৌঁছান গেল না!

এমনই অদৃষ্ট, এসব ভাঙ্গাগড়ার যিনি মালিক, তিনিই আজ তাহার উপরই, মেয়ে মানুষের পক্ষে যে কাজটা সব চেয়ে কঠিন, তাহার ভারও দিয়া রাখিলেন!

মান অভিমান তো তাহার থাকিলই না, সকলের মনের কালি যেমন তাহাকে আজ মুছিয়া দিতে হইবে, তেমনি, কোনও অপরাধ না করিয়াও সকলের অপরাধের শাস্তি মাথায় তুলিয়া লইয়া, যে নিঃসন্দেহ আপনাকে বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছে, উহাকেও শেষ কয়টা দিন একটু স্বস্তি দিতে হইবে!

বুকের মাঝে শুধু এই একটা প্রার্থনাই দিনরাত হাহাকার করিতেছিল, দুর্ব্বল মেয়ে মানুষকে যদি এতই বহন করিতে দিয়াছ, হে বিশ্বেশ্বর, হে মা কালী, তাহা হইলে এসব বইবার শক্তিও দাও!

প্রতিমার মনে হইত, এত যে অনর্থ, ইহার একমাত্র কারণ সে

নিজেই; কুক্ষণে বধূরূপে সে এই ঘরে পা' দিয়াছিল, কুক্ষণে স্বামীর সোহাগ পাইবার আশায়, আপনাকে মেলিয়া ধরিয়াছিল; সকল গর্ব্ব চূর্ণ হইয়াছে; বাঁচিয়া থাকিবার কোনও প্রয়োজনই নাই, তবু সে যুগযুগান্তরের একটা অভিশাপের মতই অক্ষয়, অমর হইয়া রহিল!

প্রতিমা আসার পর প্রথম কয়দিন মলিনার মুখের দিকে চাহিয়া সকলেরই মনে আশা হইয়াছিল, এ বুঝি ভাঙ্গনকূলে পৌঁছিয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইল; উৎপল ও প্রতিমার সেবায় এবারের মত বাঁচিয়া গেল!

কিন্তু এই ভুল ভাঙ্গিল, সপ্তাহ পরে! সেদিন সন্ধ্যার পর দেখা গেল, প্রদীপটী জ্বলিয়া জ্বলিয়া একেবারে নিভিবার মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে!

মলিনার শান্ত, স্থির, ঋজু দেহলতা শুভ্রশয্যার উপর পড়িয়া রহিয়াছে। পৃথিবীর সঙ্গে বোঝাপড়া তাহার যেন শেষ হইয়া গিয়াছে; কাহারও বিরুদ্ধে কোনও নালিশ নাই; কিন্তু বলিবারও নাই; সব মিটিয়া গিয়াছে!

দুইটী চোখের নীচেকার কালিমা রেখা আরও গাঢ় হইয়াছে, সংসর্পিত, রুক্ষ চুলের রাশি প্রতিমা জড়াইয়া রাখিয়াছিল, তাহা খুলিয়া গিয়া বিশৃঙ্খল হইয়া প্রতিমার কোলের উপর লুকাইতেছিল।

প্রতিমা ইহার মাথাটা কোলের উপর রাখিয়া, পাষাণ মূর্ত্তির মতই, বসিয়া ছিল! তাহার অশ্রুশূন্য দুই চোখের দুঃসহ জ্বালা শুধু তখনই স্নিগ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, যখন সে নীচু হইয়া মলিনার মুখের দিকে চাহিতেছিল!

হঠাৎ মলিনা তাহার স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টি প্রতিমার মুখের উপর উৎসারিত করিয়া ডাকিল, "দিদি!" মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রতিমা কহিল "এই যে আমি তোমার কাছেই রয়েছি, মলিন্!"

মলিনা কহিল, "রয়েছ,—বেশ্! শেষ পর্য্যন্ত তোমার কোলের উপর আমার মাথাটা রেখ দিদি!—এই একটা সাধ ছিল, যা পূর্ণ হয়েচে!"

একটুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তুমি ভুলে যেও, দিদি, দু'দিনের জন্য তোমার জীবনপথের উপর এসে পড়ে তোমাকেও জ্বালিয়ে গেলাম! মানুষকে জ্বালানোই বুঝি আমার কাজ ছিল! কিন্তু তুমি এমন তা' যদি জান্তাম, তোমাকে দেখ্তে চাইতাম না। তোমার কষ্ট হবে মনে করে, আমার আবার বাঁচ্তে ইচ্ছা হয়! কিন্তু তা' তো আর হয় না দিদি!"

প্রতিমা মলিনার মুখের উপর পড়িয়া তাহার ললাটে উষ্ণাধর স্পর্শ করিয়া মনে মনে কহিল, "তুই কতটুকু জানিস্, মলিন্, তোর দিদির কষ্টের কথা; এই দুর্ভাগিনীর সংস্পর্শে এসেই না আজ তুই সকল অপরাধের বোঝা মাথায় নিয়ে, এই কাঁচা বয়সেই মরণের দিকে ঝুঁকে পড়্লি! ওরে আমার সোণা, কি ছিল তোর দুঃখ, কেনই বা এমন জ্বলে পুড়ে তুই মর্লি, আর কেনইবা দু'দিনের জন্যে এই নিষ্ঠুর পাষাণীর কোলে মাথা রেখে এমন করে মায়ার ডুরি দিয়ে বাঁধ্লি!"

প্রতিমার মনে হইতেছিল, একবার উঠিয়া গিয়া খোলা বারান্দাটার অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে পারিলে বাঁচিয়া যায়!

কিন্তু এসব কাঁদিবার জন্য সারাজীবনই তাহার সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে;—এই কথাটা মনে করিয়া সে বার বার শিহরিয়া উঠিতে লাগিল!

দেওয়ালের ঘড়িতে কখন দুটা বাজিয়া গিয়াছে; এই ঘরের মধ্যে বিনিদ্র চোখে প্রতিমার পার্শ্বেই উৎপল বসিয়া ছিল।

ঝি নীচে একটা কম্বলের উপর বসিয়া ঘুমের চোখে ঢুলিতেছিল। সতীশ ঘুরিয়া ফিরিয়া বারবার সংবাদ লইয়া যাইতেছিল।

উৎপল প্রতিমার কানের কাছে মুখ লইয়া কহিল, "তুই একবার ওঠ্ বৌদি', এমন ক'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাক্‌তে রক্তমাংসের শরীর নিয়ে কি পারা যায়! বারান্দায় গঙ্গার হাওয়ায় একটু দাঁড়িয়ে থাক্‌গে যা'! আমি তো ওর কাছেই রয়েছি, ডাক্‌লেই আস্‌বি।"

প্রতিমা কোনও কথা না বলিয়া নিঃশব্দে মলিনার মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

তিনটার পর হইতে নীচের ঘাটগুলিতে স্নানার্থীদের যাওয়া আসা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে; তাহাদের পায়ের ধ্বনি, জলের শব্দ ও স্তবপাঠের মৃদুগুঞ্জন এই রাত্রি শেষের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল!

মলিনা হঠাৎ চোখ্ খুলিয়া একবার ঘরের চারিদিকে তাহার লক্ষ্যহীন দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া শ্রান্তস্বরে কহিল, "তোমাদের পায়ের ধূলা আমার মাথায় দাও, দিদি, এই মাত্র আমার বাবা এসেছিলেন, তিনি আমায় ডেকে গেলেন।"

বলিয়াই দেওয়ালে টাঙ্গানো তাহার বাবার প্রকাণ্ড ছবিটার দিকে একদৃষ্টিতে মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া রহিল। তারপর দুই হাত বাড়াইয়া প্রতিমার গলাটা জড়াইয়া ধরিবার জন্য নিষ্ফল চেষ্টা করিতেই প্রতিমা নীচু হইয়া ডাকিল, "মলিন্!"—

মলিনা দুই চক্ষুর তারকা স্থির করিয়া একবার প্রতিমার মুখের দিকে চাহিতেই, সে সভয়ে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "মলিন্ ও মলিনা, লক্ষ্মী দিদি আমার!"

ঠিক্ সেই সময়ে দুয়ার ঠেলিয়া শৈলেশ আসিয়া ঘরের মধ্যে দাঁড়াইল!

প্রতিমা কাঁদিয়া কহিল, "ওগো তুমি কাছে এস,—কাছে এস! ওর চোখের আলো নিভে যাবার আগেই অন্ততঃ একটু দেখা দিয়ে যাও! এই যে কথা বল্‌ছিল, এর মাঝে কি হ'ল ওর, দেখ,—দেখ!"

মলিনার শ্লথবিন্যস্ত দুইখানি হাত হাতের মধ্যে তুলিয়া ধরিয়া মুখের কাছে নীচু হইয়া বিকৃতস্বরে শৈলেশ ডাকিল, "মলিনা,—মলিন!"—

এই অতর্কিত স্পর্শ ও আকুল আহ্বানের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ ছিল যাহা মরণাহতা মলিনাকেও মুহূর্ত্তের জন্য সচকিত করিয়া তুলিল। সে একবার প্রাণপণে দুই চোখ খুলিয়া তাহার আবিলদৃষ্টি শৈলেশের মুখের উপর স্থাপিত করিল!

সেই একদিন, যেদিন তারাপদ এই শৈলেশের হাতের মধ্যে তাঁহার অশেষ স্নেহপাত্রী মলিনার দুই হাত তুলিয়া দিয়াই শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলেন; আর আজ কত দুর্ভোগের পর, যখন জীবনের সমস্ত প্রয়োজনকে উপেক্ষা করিয়া মলিনা কোন্ অজানা দেশের দিকে যাত্রা করিবার জন্য পা' বাড়াইয়া দিয়াছে, ঠিক্ তখনই শৈলেশ মলিনার দুই হাত হাতের মধ্যে টানিয়া লইল!

সেদিন মলিনার চোখে বিশ্বসংসারের সমস্ত সৌন্দর্য্য বিচিত্ররূপ ধরিয়া কত ছন্দেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, আর আজ জীবননাট্যের শেষ অঙ্কের মসীবর্ণ যবনিকাটি দুলিয়া উঠিয়াছে; চোখের সম্মুখের আলো নিভিয়া আসিতেছে; বুকের ভিতরকার সকল চাওয়া, সকল কাকুতির অবসান হইয়া গিয়াছে!

নিস্তব্ধ ঘরটার মধ্যে শুধু মলিনার গুরুশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছিল। বাতির আলোটা জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে!

সতীশ ঘরের দরজা জানালাগুলি খুলিয়া দিতেই ঊষার অস্পষ্ট